BANGLADESH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY

VOLUME 23 NUMBERS I & 2
2006

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান
দারিদ্র হ্রাস কৌশল পত্র – বাংলাদেশের দারিদ্র্যদূরীকরণের আরও একটি ব্যর্থ প্রয়াস

Md Abdul Wadud
In Search of a Self-Reliant Poverty Reduction Policy for Bangladesh

A.N.K.Noman
Implementation of Poverty Reduction Strategies (PRS) in Bangladesh: Some Comments

Md. Farid Uddin Khan
Economic Growth and Income Inequality in Bangladesh

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান
ট্রানজিট ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত দক্ষিণ এশিয়া

Tarequl Hasan, M. Chowdhury
Nitai C. Nag
Floating Exchange Rates in the Developing World: The Bangladesh Context

Abul Kalam Azad
Export of Port Services and Private Port in Chittagong

Ataul Karim Chowdhury
Globalization of Maritime Commerce: The Rise of Hub & Mega Ports The Importance of Chittagong

মু. সিকান্দার খান
হালদার মৎস্যক্ষেত্র ঃ বিপর্যয়েরমধ্যে একটি বৈশ্বিক উত্তরাধিকার

মুহাম্মদ আনোয়ার-ল ইসলাম
সমুদ্র সম্পদে চট্টগ্রামঃ অর্থনৈতিক ব্যবহারে সমস্যা ওসম্ভাবনা

Mohammed A. Rab
Institutional Framework for Halda Fisheries: Drawing Lessons from CBFM Experiences

মনছুর এম. ওয়াই চৌধুরী
মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ঃ "হালদা" সমস্যা ও পরিত্রাণ

Zahirul Alam
Local Resources of Chittagong Hill Tracts Present Status and Prospects

Mohammad Altaf-Ul-Alam
Government Expenditure Composition-Impacts on Growth of the Economy

মামুন আবদুল্লাহ
বাংলাদেশের শিপ ব্রেকিং: সম্ভবনা আছে, নেই সম্প্রসারণের সদিচ্ছা

A S M Anwarul Huq
Shamsul Alam
Integration of Potato Markets in Bangladesh : A Cointegration Analysis

Dhiman K. Chowdhury
Competition and its Diverse Meanings: A Search for a Synthesis

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
Bangladesh Economic Association

Bangladesh Journal of Political Economy

VOLUME 23, NUMBERS 1 & 2, 2006

Qazi Kholiquzzaman Ahmad
Editor

Bangladesh Economic Association
4/C, Eskaton Garden Road, Dhaka-1000
Phone : 9345996, Fax : 880-2-9345996
E-mail : becoa@bdlink.com

বাংলাদেশ জার্নাল অফ পলিটিক্যাল ইকনমি

ত্রয়বিংশ খণ্ড, সংখ্যা ১ ও ২, ২০০৬

সম্পাদক

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

সম্পাদনা উপদেষ্টা কমিটি

প্রফেসর অর্মত্য সেন
প্রফেসর নুরুল ইসলাম
প্রফেসর মুশাররফ হোসেন
প্রফেসর রেহমান সোবহান
প্রফেসর মুজাফফর আহমেদ
প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস
ড. স্বদেশ রঞ্জন বোস
প্রফেসর ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ
প্রফেসর হাফিজ জি এ সিদ্দিক

সম্পাদনা পরিষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	কার্যকরী সম্পাদক
প্রফেসর এম.এ. সাত্তার মন্ডল	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর সৈয়দ আব্‌দুল হাই	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর আবুল বারকাত	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর আইয়ুবুর রহমান ভূঁঞা	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ
ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী	সদস্য, সম্পাদনা পরিষদ

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০
টেলিফোন ঃ ৯৩৪৫৯৯৬, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৩৪৫৯৯৬
ই-মেইল : becoa@bdlink.com

Bangladesh Journal of Political Economy

VOLUME 23, NUMBERS 1 & 2, 2006

Editor
Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad

Editorial Advisory Board
Professor Amartya Sen
Professor Nurul Islam
Professor Mosharaff Hossain
Professor Rehman Sobhan
Professor Muzaffer Ahmad
Professor Muhammad Yunus
Dr. S. R. Bose
Professor Wahiduddin Mahmud
Professor Hafiz G A Sadique

Editorial Board

Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad	Editor
Professor M. A. Sattar Mandal	Member
Professor Sayed Abdul Hye	Member
Professor Abul Barkat	Member
Professor Ashraf Uddin Chowdhury	Member
Professor Ayubur Rahman Bhuiyan	Member
Dr. Toufic Ahmad Choudhury	Member

Bangladesh Economic Association

- Bangladesh Journal of Political Economy is published by the Bangladesh Economic Association.
- No responsibility for the views expressed by the authors of articles published in the Bangladesh Journal of Political Economy is assumed by the Editors or the Publisher.
- Bangladesh Economic Association gratefully acknowledges the financial assistance provided by the Goverment of the People's Republic of Bangladesh towards publication of this volume.
- The price of this volume is Tk. 200, US $ 15 (foreign). Subscription may be sent to the Bangladesh Journal of Political Economy, c/o, Bangladesh Economic Association, 4/C, Eskaton Garden Road, Dhaka-1000. Telephone: 9345996. E-mail : becoa@bdlink.com Members and students certified by their concerned respective institutions (college, university departments) may obtain the Journal at 50% discount.

Cover design by:
Syed Asrarul Haque (Shopen)

Printed by:
Agami Printing & Publishing Co.
25/3 Green Road, Dhanmondi
Dhaka-1205, Phone: 8612819

BEA Executive Committee 2004-2006

President
Qazi Kholiquzzaman Ahmad

Vice- Presidents
M.A. Sattar Bhuyan
M. A. Sattar Mandal
Sayed Abdul Hye
Md. Zahirul Islam Sikder
Jyoti Prakash Dutta

General Secretary
Abul Barkat

Treasurer
Jamaluddin Ahmed

Joint Secretary
Md. Mostafizur Rahman Sarder

Assistant Secretary
Md. Sadiqur Rahman Bhuiyan
A. Z. M. Saleh
Md. Main Uddin

Members
A.K.M. Shameem
Ashraf Uddin Chowdhury
Toufic Ahmad Choudhury
Kaniz Nazma Siddique
Shamima Akhtar
Masih Malik Chowdhury
Badrul Munir
M. Moazzem Hossain Khan
Md. Nurul Haque
Narayan Chandra Nath
Shafiqur Rahaman Khan
Mahtab Ali Rashidi

Preface

This volume (volume 23) includes papers presented at the regional conferences held in Chittagong and Rajshahi in April and July 2006 respectively. The usual review and modification processes were followed for the articles included in this volume. In addition, four articles submitted for publication in the journal have also been accepted by the Editorial Board after review and modifications made as required. The articles cover different aspects of the conference themes and other issues and together should make the volume very interesting.

Let me sincerely thank the authors, the reviewers and the members of the Editorial Board. Their efforts and cooperation are deeply appreciated.

(Qazi Kholiquzzaman Ahmad)
President, Bangladesh Economic Association
Editor, Bangladesh Journal of Political Economy

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ষান্মাসিক জার্নাল Bangladesh Journal of Political Economy *প্রকাশনার নীতিমালা*

১। অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক বিষয়ে প্রবন্ধ প্রণয়ন করার জন্য প্রবন্ধকারদেরকে অনুরোধ জানানো হবে। ইংরেজী এবং বাংলা উভয় ভাষায় রচিত প্রবন্ধ জার্নালের জন্য গ্রহণ করা হবে।

২। Initial screening নির্বাহী সম্পাদকের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে, তবে প্রয়োজনবোধে সম্পাদনা পরিষদের অন্য সদস্যদের সহায়তা তিনি নেবেন। নির্ধারিত format মোতাবেক সংশোধনের জন্য এই পর্যায়ে প্রাথমিক ভাবে short-listed প্রবন্ধসমূহ প্রবন্ধকারের কাছে প্রেরণ করা হবে।

৩। অভ্যন্তরীণ reviewer সাধারণতঃ সম্পাদনা পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকেই মনোনীত হবেন। বহিঃস্থ reviewer সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে প্রবন্ধের বিষয়ের ভিত্তিতে সম্পাদনা পরিষদের বাইরে থেকে মনোনীত হবেন, তবে তিনি দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে অবস্থান করতে পারেন। সম্পাদনা উপদেষ্টা কমিটির সকল সদস্য reviewer হতে পারবেন। তৃতীয় reviewer প্রয়োজন হলে সম্পাদনা পরিষদের বাইরে থেকে মনোনীত করা হবে।

৪। ক) সমিতির দ্বিবার্ষিক কনফারেন্সে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলো referral প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জার্নালের জন্য বিবেচিত হবে।

খ) বিভিন্ন সময়ে সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে পঠিত আমন্ত্রিত প্রবন্ধসমূহ জার্নালের সম্পাদনা পরিষদের অনুমোদনক্রমে জার্নালে প্রকাশ করা যেতে পারে।

৫। অর্থনীতি সমিতির সদস্য এবং সদস্য-বহির্ভূত যে কোন আগ্রহী প্রার্থী জার্নালের গ্রাহক হতে পারবেন। তবে সদস্যদের ক্ষেত্রে গ্রাহক ফি (subscription fee) পঞ্চাশ শতাংশ রেয়াত দেয়া হবে।

৬। জার্নালের footnoting এবং writing style এতদ্‌সঙ্গে সংযোজিত হলো (জার্নালের শেষাংশ)।

৭। দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদেরকে বছরে দু'বার সম্পাদনা পরিষদের সভায় আমন্ত্রণ জানানো হবে।

৮। ক) তিনটি কোটেশন সংগ্রহ করে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে মুদ্রক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হবে।

খ) প্রথম proof প্রেস দেখবে, পরবর্তীতে floppy তে প্রবন্ধকার ফাইনাল proof দেখে দেবেন।

Bangladesh Journal of Political Economy
VOLUME 23, NUMBERS 1 & 2, 2006

Contents

1. দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র – বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের আরও একটি ব্যর্থ প্রয়াস — 1
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান

2. In Search of a Self-Reliant Poverty Reduction Policy for Bangladesh — 31
Md Abdul Wadud

3. Implementation of Poverty Reduction Strategies (PRS) in Bangladesh: Some Comments — 41
A.N.K.Noman

4. Economic Growth and Income Inequality in Bangladesh — 51
Md. Farid Uddin Khan

5. ট্রানজিট ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত দক্ষিণ এশিয়া — 65
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান

6. Floating Exchange Rates in the Developing World: The Bangladesh Context — 77
Tarequl Hasan, M. Chowdhury
Nitai C. Nag

7. Export of Port Services and Private Port in Chittagong — 95
Abul Kalam Azad

8. Globalization of Maritime Commerce: The Rise of Hub & Mega Ports and The Importance of Chittagong — 105
Ataul Karim Chowdhury

9. হালদার মৎস্যক্ষেত্র ঃ বিপর্যয়ের মুখে একটি বৈশ্বিক উত্তরাধিকার — 113
মু. সিকান্দার খান

10. সমুদ্র সম্পদে চট্টগ্রামঃ অর্থনৈতিক ব্যবহারে সমস্যা ও সম্ভাবনা 125
মুহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম

11. Institutional Framework for Halda Fisheries: Drawing Lessons from CBFM Experiences 133
Mohammed A. Rab

12. মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ঃ "হালদা" সমস্যা ও পরিত্রাণ 149
মনছুর এম. ওয়াই চৌধুরী

13. Local Resources of Chittagong Hill Tracts Present Status and Prospects 153
Zahirul Alam

14. Government Expenditure Composition-Impacts on Growth of the Economy 165
Mohammad Altaf-Ul-Alam

15. বাংলাদেশের শিপ ব্রেকিং: সম্ভাবনা আছে, নেই সম্প্রসারণের সদিচ্ছা 179
মামুন আবদুললাহ

16. Integration of Potato Markets in Bangladesh : A Cointegration Analysis 185
A S M Anwarul Huq
Shamsul Alam

17. Competition and its Diverse Meanings: A Search for a Synthesis 197
Dhiman K. Chowdhury

দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র – বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের আরও একটি ব্যর্থ প্রয়াস

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান*

সারসংক্ষেপ

আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র (Poverty Reduction Strategy Paper বা পিআরএসপি) ও আমাদের দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে এর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর তা করতে গিয়ে প্রবন্ধের প্রথমাংশে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের ধারণা এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান দারিদ্র্য পরিস্থিতির একটি বিশে-ষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে দারিদ্র্য নির্মূলে পরিকল্পিত অর্থনীতির গুর"ত্ব এবং এক্ষেত্রে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র যে পরিকল্পিত অর্থনীতির বিকল্প হতে পারে না সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আর অবশেষে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের অসারতা ও করণীয় সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য উপস্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

ভূমিকা

বিগত শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সংকট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ভাঙ্গনকে (যার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ষড়যন্ত্র ও বৈরীতাই মূলতঃ দায়ী) পুঁজি করে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মত সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলো আবারও নব্য-উদারবাদী অর্থনীতির মোড়কে যুগ যুগ আগের বস্তা পঁচা মুক্ত বাজার অর্থনীতির মৌলবাদী দর্শন নিয়ে সরব হয়ে ওঠে। তাদের এ দর্শন তারা গিল্‌তে বাধ্য করে সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার সরকারগুলোকে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকেও তারা ঋণের টোপ দিয়ে এ দর্শন গিলাতে সমর্থ হয়, যদিও এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতীক্রমী দেশ ছিল বেলারুশ প্রজাতন্ত্র। ওদিকে চীন ও ভিয়েতনামও এ দর্শনকে পুরোপুরি গ্রহণ করে নি। মালয়েশিয়াও বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করেছে। আর সম্ভবতঃ সেকারনেই ১৯৯৭ এর পূর্ব এশীয় সংকট থেকে চীন, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়া নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপে বেলারুশও অনেকটা সংকটমুক্ত রাখতে পেড়েছে নিজেকে। ভারত অনেক দেরীতে অর্থ্যাৎ নব্বই এর দশকের শুরুতে উদারবাদী দর্শন গ্রহণ করলেও বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শ মানে নি। যেকারণে অব্যাহতভাবে এগিয়েছে, উন্নতি করেছে। স্বল্পোন্নত অন্যান্য দেশসমূহকে বিশ্ব ব্যাংক ঋণের শর্ত হিসেবে এ দর্শনকে (নব্য-উদারবাদী) গিল্‌তে দস্তুরমত বাধ্য করেছে। ফল যা হবার তা-

* অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

ই হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের প্রাক্তণ উপনিবেশ এ সকল স্বল্পোন্নত দেশ বর্তমানে তাদের নব্য উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। নব্য-উদারবাদী এ দর্শন সবচেয়ে বেশী ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সম্ভবতঃ লেটিন আমেরিকার দেশগুলোতে। যে কারণে সেখানে নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে বামপন্থীরা (সমাজতন্ত্রীরা) একের পর এক দেশে ক্ষমতাসীন হচ্ছে। ইতোমধ্যেই ভেনিজুয়েলা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, বলিভিয়া, চিলি ও আর্জেন্টিনায় তাঁরা ক্ষমতায় এসেছে। ১৯৭৫ এর ১৫-ই আগষ্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করে সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশেও তাদের নব্য-উদারবাদী দর্শন বাস্তবায়নে হাত দেয়। বিরাষ্ট্রীয়করণ, মৌলিক চাহিদা পূরণ, কাঠামোগত সংস্কার, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সবশেষে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র ইত্যাদি নানান অভিধায় ও নামে তারা তাদের এ দর্শন বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা বিশ্ব ব্যাংকের সকল শর্ত ও পরামর্শ প্রতিপালন করতে গিয়ে বর্তমান জোট সরকার ইতোমধ্যেই আমাদের দেশকে এক ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করে ফেলেছে। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ আজ সম্পূর্ণরূপে দুর্বৃত্তায়ীত। গরীব মানুষের আয় বাড়ে নি অথচ ব্যয় বেড়েছে কয়েক গুণ। এমতাবস্থায়, দারিদ্র্য দূরীকরণ স্বপ্নই থেকে গেছে। বেড়েছে ধন বৈষম্য। এমনতো হবার কথা ছিল না। আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্যমুক্ত এবং সমতাধর্মী এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। কেন এমন হল? কেনই বা আমরা পারলাম না? আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহে বিশেষ করে বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদের মুখপাত্র বিশ্ব ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত দারিদ্র্য হ্রাসের নামে প্রবর্তিত দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের মুখোশ উন্মোচন করা। আর এ লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে আমরা নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করেছি ঃ

১। বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যা ও তার নিরসনে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের অসারতা প্রমাণ করা;
২। পরিকল্পিত অর্থনীতির বিকল্প হিসেবে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের অকার্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের যুক্তি তুলে ধরা ;
৩। সবশেষে আমাদের দেশের দারিদ্র্য নির্মূলে কি করা উচিত সেসম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা উপস্থাপন করা।

পদ্ধতি ও তথ্য

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ মূলতঃ প্রকাশিত উৎস থেকে নেয়া হয়েছে যার মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা গ্রন্থের বিভিন্ন সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। তা'ছাড়া বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র গ্রন্থ এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকীসহ বিভিন্ন সাময়িকী ও দৈনিকে প্রকাশিত এ সম্পর্কিত নিবন্ধ ও প্রবন্ধেরও সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র ও বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি

সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এবার সাহায্য প্রাপ্তির প্রধান শর্ত হিসেবে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র প্রণয়ন করতে বলেছে (১২, পৃঃ

১১১; ১৫, ০৫ ঃ ০৩ ঃ ০৬)। তবে গোড়ার দিকে তারা কাজটি শুরু করে চরম দরিদ্র ও ঋণগ্রস্থ দেশগুলোকে দিয়ে। বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে বিশেষ করে নব্বইয়ের দশকে তারা এ দেশগুলোর সম্মুখে ঋণ মওকুফের মূলো ঝুলিয়ে দেয়। কিন্তু এমনি এমনি তারা ঋণ মওকুফ করতে রাজি হয় নি। এর সাথে তথাকথিত দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র তৈরীর শর্ত জুরে দেয়। প্রথম দিকে তারা আমাদের দেশকে ঋণ মওকুফের সুবিধা দিতে রাজি হয় নি। কারণ তাদের মতে, বাংলাদেশ চরম ঋণগ্রস্ত দেশ নয়। বাংলাদেশও এ ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। ১৯৯৯ সালে এসে দেখা গেল যে, স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল নির্বিশেষে সকল দেশের ক্ষেত্রেই সাহায্য বা ঋণ প্রাপ্তির শর্ত হিসেবে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়। ওদিকে ২০০০ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এর ৫৫-তম অধিবেশনে বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্যে সহাস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল স্থির করে যার মূল কথা হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচন। ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে দারিদ্র্যের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণায়। এ রকম এক পেক্ষাপটে বাংলাদেশ ২০০০ সালের ডিসেম্বরেই অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র প্রণয়নে উদ্যোগী হয়। ২০০২ সালের এপ্রিল নাগাদ খসড়া দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র রচনা এবং ঐ বছরের ডিসেম্বরে তা চূড়ান্ত করা হয়। আর ২০০৩ সালের জুলাই থেকে এর আওতায় একটি তিন বছর মেয়াদী দারিদ্র্য হ্রাস কর্মসূচী বাস্তবায়ন শুরু করে। একই সময়ে পূর্ণাঙ্গ দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে এবং ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে তা শেষ হয়। ২০০৫ সালের অক্টোবর নাগাদ পূর্ণাঙ্গ দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র চূড়ান্ত করা হয় এবং ২০০৬ সালের জানুয়ারীতে বিশ্ব ব্যাংক তা অনুমোদন করে। পূর্ণাঙ্গ এ কর্মসূচীর নাম দেয়া হয়েছে Unlocking the Potential: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction, অর্থ্যাৎ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন ঃ দারিদ্র্য হ্রাসের গতি সঞ্চারি জাতীয় কৌশল।

জাতিসংঘ ঘোষিত সহাস্রাব্দের লক্ষ্যসমূহের আলোকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রে আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জনের জন্যে নিম্নে উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

১। *ক্ষুধা, দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও চরম দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন করে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করা ;*
২। *দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের অনুপাত অর্ধেকে (৫০%) নামিয়ে আনা ;*
৩। *সকল বালক-বালিকার জন্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করা ;*
৪। *প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা ;*
৫। *শিশু ও পাঁচ বছরের নীচের বাঁচ্চাদের মৃত্যু হার ৬৫% হ্রাস করা এবং শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা ;*
৬। *অপুষ্টিতে আক্রান্ড় শিশুদের অনুপাত অর্ধেকে (৫০%) নামিয়ে আনা এবং এক্ষেত্রে বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা ;*
৭। *মাতৃ মৃত্যুর হার ৭৫% হ্রাস করা ;*
৮। *পুনর"ৎপাদনজনিত স্বাস্থ্য সেবা সবার জন্য প্রাপ্তিযোগ্য করা ;*
৯। *দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিতদের বিশেষ করে নারী ও শিশুদের বির"দ্ধে সহিংসতা পুরোপুরি বন্ধ করতে না পারলেও উলে-খযোগ্যভাবে হ্রাস করা ;*
১০। *সুসমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিত করা এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এগুলোকে অন্ড়র্ভুক্ত করা।*

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে যেসকল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় তা সারণী-১ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো। সারণীর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আয় দারিদ্র্য ১৯৯০ এর ৫৯% (৫০%) এবং ভিত্তি বছর ২০০২ এর ৫০% (৪০%) থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে ২৫% (২০%) এ গিয়ে দাঁড়াবে। আর ১৯৯০ – ২০০২ এবং ২০০২ – ২০১৫ সময়কালে বার্ষিক আয় দারিদ্র্য হ্রাসের হার হচ্ছে যথাক্রমে – ১.৫(–১.৯%) ও –৩.৩% (–৩.৩%)। অন্যদিকে চরম দারিদ্র্যের হার ১৯৯০ ও ২০০০ এর যথাক্রমে ২৮% ও ১৯% থেকে হ্রাস পেয়ে ৯.৫% এ গিয়ে ঠেকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ বার্ষিক – ৩.৩% হারে চরম দারিদ্র্য হ্রাস পাবে বলে ধরা হয়েছে। বয়স্ক সাক্ষরতার হার ২০০২ এর ৪৯.৬% থেকে বার্ষিক ৬.৩% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে গিয়ে ৯০% এ ঠেকবে। প্রাথমিক শিক্ষায় নিবন্ধীকরণের হার ২০১৫ সালে ১০০% হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তা ২০০২ এর ৫২.৮% থেকে বার্ষিক ৬.১% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে গিয়ে ৯৫% এ দাঁড়াবে। শিশু মৃত্যুর হার ১৯৯০ এর প্রতি হাজারে ৯৪ এর স্থলে ২০১৫ সালে মাত্র ১৮ এ গিয়ে ঠেকবে। আর পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো হবে যথাক্রমে ১০৮ ও ২৫। অপরদিকে মাতৃ মৃত্যুর হার ১৯৯০ এর প্রতি লাখে ৫৫৪ থেকে বার্ষিক – ৫.৮% হারে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ সালে মাত্র ৯৮ জনে গিয়ে ঠেকবে। গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ এর ৫৬ বছর থেকে ২০১৫ সালে ৭৩ বছর হবে বলে ধরা হয়েছে। সবশেষে কম ওজনের শিশুর হার ১৯৯০ এর ৬৭% থেকে কমে ২০১৫ সালে ২৬% হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণী ১ : বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের প্রধান লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ, ১৯৯০ – ২০১৫ সময়ে

সূচকসমূহ	১৯৯০	২০০২ ভিত্তি বছর	১৯৯০–২০০২ সময়ে বার্ষিক	২০১৫	২০০২–২০১৫ সময়ে বার্ষিক অগ্রগতি, %
১	২	৩	৪	৫	৬
১। আয় দারিদ্র্য (%)	৫৯ (৫০)	৫০* (৪০)	-১.৫ (-১.৯)	২৫ (২০)	- ৩.৩ ৩.৩)
২। চরম দারিদ্র্য (%)	২৮	১৯*	- ৩.২	৯.৫	- ৩.৩
৩। বয়স্ক সাক্ষরতা (%)	৩৫	৪৯.৬	৩.৫	৯০	৬.৩
৪। প্রাথমিক পর্যায়ে নিবন্ধীকরণ (%)	৫৬	৮৬.৭	৪.৬	১০০	১.২
৫। মাধ্যমিক পর্যায়ে নিবন্ধীকরণ (%)	২৮	৫২.৮	৭.৪	৯৫	৬.১
৬। শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৯৪	৫৩	- ৩.৬	১৮	- ৫.১
৭। পাঁচ বছরের নীচে মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	১০৮	৭৬	- ২.৫	২৫	- ৫.২
৮। মাতৃ মৃত্যু হার (প্রতি লাখে)	৫৫৪	৩৯০	- ২.৫	৯৮	- ৫.৮
৯। গড় আয়ু (বছর)	৫৬	৬৪.৯	১.৩	৭৩	১.০
১০। জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি (%)	২.১	১.৪	-	১.৩	-
১১। কম ওজনের শিশুর হার (%)	৬৭	৫১*	- ২.৪	২৬	- ৩.৩

* ২০০০ সালের তথ্য। বন্ধনীর মধ্যের তথ্য বিকল্প হিসেবের তথ্য।

উৎসঃ ৭, পৃঃ ১৯০ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

বর্তমান সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ ও লক্ষ্যমাত্রাগুলোর উপরে কোন রকম মন্তব্য করার পূর্বে আমরা নিম্নে বাংলাদেশের বিদ্যমান দারিদ্র্য পরিস্থিতির একটি বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করবো ।

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে (৬) । পুঁজিবাদের সমর্থক অর্থনীতিবিদরা দারিদ্র্য পরিমাপের জন্যে কতগুলো স্থুল সূচক ব্যবহার করে থাকেন, যেমন– মাথাপিছু আয়, মাথাপিছু ক্যালরী গ্রহণ, সাক্ষরতার হার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্তি ইত্যাদি । আসলে এটা হচ্ছে দারিদ্র্যকে আড়াল করারই একটা অপচেষ্টা । কারণ দেশের সব আয়কে মানুষের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে যে আয় পাওয়া যায় তাতে সর্বহারা, ভূমিহীন ও কর্মবঞ্চিত মানুষের কিছু যায় আসে না । আবার নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালরীর নীচে গ্রহণ করলেই দারিদ্র্য বা চরম দরিদ্র্য বলা হচ্ছে । প্রশ্ন হচ্ছে সেটা কত নীচে হবে? শূন্য পর্যন্ত হবে নাকি ১ এ এসে শেষ হবে । অন্যান্য সূচকের ক্ষেত্রেও এ রকম প্রশ্ন করা যায় । অপরদিকে সমাজতন্ত্রের সমর্থক অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, মানুষের মৌলিক অধিকার হচ্ছে মোট ছয়টি ঃ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান । আর সেজন্যেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে মানুষের এ মৌলিক অধিকারগুলো স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করে থাকে । জাতিসংঘ ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনটি জিনিসকে (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান) মানুষের মৌলিক চাহিদা বা অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও ঐ বছর এর সাথে আরও দু'টি অধিকারের (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) স্বীকৃতি দেয় । আসলে কিন্তু দেয় নি । কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর চাপে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেও পুঁজিবাদী ধারায় এগুলোর বাস্তবায়ন কখনই সম্ভব নয় । আর অন্যটি যা বাকীগুলোর বাস্তবায়নে নিয়মকী ভূমিকা রাখে, অর্থাৎ কর্মসংস্থান এর নিশ্চয়তা দেয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কখনই সম্ভব নয় তা সে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রই (প্রায় ৬% মানুষ বেকার) হোক, ফ্রান্সই (প্রায় ২০% মানুষ কর্মহীন, অভিবাসীদের মধ্যে প্রায় ৫০%) হোক, বা জাপানই (প্রায় ৭% মানুষ কর্মহীন) হোক । আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনও পুঁজিবাদী দেশ নিজেকে বেকারত্বমুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা দিতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না । অতএব, আমরা বলতে পারি যে, বেকারত্ব যেখানে থাকবে দারিদ্র্যও সেখানে অবশ্যাম্ভাবীভাবে থাকবে । সুতরাং আমাদের মতে, দারিদ্র্য হচ্ছে এমন এক অবস্থা যেখানে মানুষ তার ছয়টি মৌলিক অধিকার বা চাহিদা ঃ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত থাকে ।

আমাদের দেশেও দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত স্থুল পদ্ধতিগুলোই ব্যবহার করা হয়ে থাকে । বর্তমানে বাংলাদেশে আয় দারিদ্র্য (income poverty) ও মানব দারিদ্র্য (human poverty) এ দু'ভাবে দারিদ্র্যকে পরিমাপ করা হয়ে থাকে । আয় পদ্ধতিতে মাথাপিছু আয় ও ব্যয় এবং জমির মালিকানার মত বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা হয় এবং মানব দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মত বিষয়গুলোকে প্রধান্য দেয়া হয় । উভয় পদ্ধতিই জরিপের উপর নির্ভরশীল । আর সেকারণে প্রাপ্ত ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই সীমিত বা প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য । বাংলাদেশে সর্ব প্রথম খানা ব্যয় জরিপ করা হয় ১৯৭৩ – ৭৪ সালে (১) । এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে আরও কয়েকটি জরিপ পরিচালিত হয় । সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ চালানো হয় ২০০০ সালে । উল্লেখ্য যে, ২০০০ সালের পূর্বে খানা জরিপে শুধু ব্যয় সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ করা হত । ১৯৯১ – ৯২ পর্যন্ত পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে দেশের দারিদ্র্য পরিমাপের জন্য খাদ্য শক্তি গ্রহণ (food energy intake বা FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ (direct calorie intake বা DCI) পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো । দারিদ্র্য পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলো ক্যালরীর নীচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র্যসীমা

(absolute poverty line) এবং ১৮০৫ কিলো ক্যালরীর নীচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র্যসীমা (hard-core poverty line) হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯৯৫ – ৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে প্রথমবারের মত মৌলিক চাহিদা ব্যয় (cost of basic needs বা CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্যসীমা পরিমাপে খাদ্য-বহির্ভূত (non-food) ভোগ্য পণ্যও অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ২০০০ সালের জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সাধারণতঃ প্রতি চার বছর পর পর খানা জরিপ চালিয়ে দারিদ্র্য পরিস্থিতি নির্ণয় করে থাকে। তবে ১৯৯৪ সাল থেকে বাৎসরিক ভিত্তিতে দারিদ্র্যাবস্থা পরিবীক্ষণের জন্যে দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ (poverty monitoring survey বা PMS) চালু করা হয়। ২০০৪ সালের মার্চে সর্বশেষ দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ চালানো হয়। এ জরিপে খাদ্য শক্তি গ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ এ দু'টি পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়। এতে শহর ও পল্লী অঞ্চলের জন্য পৃথক দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণ করা হয় ঃ খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত ভোগ্য পণ্যের চাহিদার ভিত্তিতে শহর অঞ্চলের জন্য জনপ্রতি মাসিক মোট ব্যয় ৯০৫.৯০ টাকা এবং পল্লী অঞ্চলের জন্য জনপ্রতি মাসিক মোট ব্যয় ৫৯৪.৬০ টাকা ধরে দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে আমরা এ জরিপের আলোকে প্রাপ্ত বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির সর্বশেষ চিত্র উপস্থাপন করবো।

সারণী ২ : খাদ্য শক্তি গ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ পদ্ধতিতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির তুলনামূলক চিত্র, ১৯৯৯ – ২০০৪ সময়ে

অঞ্চল	পদ্ধতি			
	খাদ্যশক্তি গ্রহণ, মাথা গণনার হার (%)		প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ, মাথা গণনা হার (%)	
	১৯৯৯	২০০৪	১৯৯৯	২০০৪
১	২	৩	৪	৫
১। পল্লী	৪৪.৯	৪৩.৩	৪৫.৬	৪০.১
২। শহর	৪৩.৩	৩৭.৯	৪৯.৯	৪৩.৬
৩। জাতীয়	৪৪.৭	৪২.১	৪৬.২	৪০.৯

উৎসঃ ১, ২ ও ৩, পৃঃ ১৬৫, ১৫৬ ও ১৪০ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

সারণী – ২ এ উপস্থাপিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ এ পাঁচ বছরের ব্যবধানে খাদ্য শক্তি গ্রহণ ও প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ উভয় পদ্ধতিতেই বাংলাদেশের দারিদ্র্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে প্রথম পদ্ধতি (২.৬%) অপেক্ষা দ্বিতীয় পদ্ধতিতে (৫.৩%) একটু বেশী কমেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। অঞ্চল ভেদেও দেখা যাচ্ছে প্রবণতা একই, অর্থাৎ শক্তি গ্রহণ পদ্ধতিতে পল্লী অঞ্চলে এ সময়ে দারিদ্র্য কমেছে যেখানে ১.৬%, সেখানে প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ পদ্ধতিতে হ্রাস পেয়েছে ৫.৫%। আর শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ৫.৪% ও ৬.৩%। লক্ষ্যনীয় যে, উভয় পদ্ধতিতেই উক্ত সময়ে পল্লী অঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাসের হার একটু বেশী। সার্বিকভাবে বলা যায় যে, গড়ে বার্ষিক কম-বেশী ১% হারে দারিদ্র্য কমেছে। তবে আপেক্ষিক অংকে সামান্য হ্রাস পেলেও প্রকৃতপক্ষে মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা এ সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের হিসেবে খাদ্য শক্তি গ্রহণ পদ্ধতিতে এ সময়ে দরিদ্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.০৭ মিঃ (২০০৪ ঃ (১৪০০.৪২১) = ৫৮.৯৪ – ১৯৯৯ ঃ (১২৫০.৪৪৭) = ৫৫.৮৭); আর ক্যালরী গ্রহণ পদ্ধতিতে প্রায় অপরিবর্তীত

থেকেছে ঃ –০.৪৯ মিঃ (২০০৪ ঃ (১৪০০.৪০৯) = ৫৭.২৬ – ১৯৯৯ ঃ (১২৫০.৪৬২) = ৫৭.৭৫)। এ তো গেল প্রথম দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থানকারী দরিদ্রদের চিত্র। দ্বিতীয় দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী দরিদ্রদের সংখ্যাও এখনও উল্লেখ করার মতই। ২০০৪ সালে ২৫.১৮ মিঃ (১৮.৭%) মানুষ চরম দারিদ্র্যের শিকার ছিল (সারণী – ৩)।

সারণী ৩ : প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ পদ্ধতিতে বাংলাদেশের চরম দারিদ্র্য পরিস্থিতির চিত্র, ১৯৯৯-২০০৪ সময়ে %

ক্যালরীর পরিমাণ, কিলো ক্যালরী	অঞ্চল	বছর	
		১৯৯৯	২০০৪
১	২	৩	৪
১৮০৫	১। পল্লী	২৪.৫	১৮.২
	২। শহর	২৭.৩	২০.৮
	৩। জাতীয়	২৪.৯	১৮.৭

উৎসঃ ১, ২ ও ৩, পৃঃ ১৬৫, ১৫৬ ও ১৪০ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

সারণী ৪ : বাংলাদেশে দারিদ্র্যের গভীরতা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের চিত্র, ১৯৯৯ – ২০০৪ সময়ে

অঞ্চল	বছর			
	১৯৯৯	২০০৪	১৯৯৯	২০০৪
	দারিদ্র্য ব্যবধান	বর্গকৃত দারিদ্র্য ব্যবধান	দারিদ্র্য ব্যবধান	বর্গকৃত দারিদ্র্য ব্যবধান
১	২	৩	৪	৫
১। পল্লী১১.১	৪.০	১০.৯	৩.৮	
২। শহর১১.২	৪.২	১১.১	৪.৫	
৩। জাতীয়	১১.১	৪.১	১০.৯	৩.৯

উৎসঃ ১, ২ ও ৩ পৃঃ ১৬৫, ১৫৬ ও ১৪০ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

এক্ষেত্রে আবার বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে, অর্থাৎ ঐ বছর শহর এলাকায় যেখানে ২০.৮% মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করতো, সেখানে পল্লী এলাকায় একটু কম ১৮.২% মানুষ অনুরূপ অবস্থার শিকার ছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, পল্লী, শহর ও জাতীয় তিন ক্ষেত্রেই ১৯৯৯ এর তুলনায় ২০০৪ সালে প্রায় ছয় শতাংশ হারে চরম দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে ঃ যথাক্রমে ৬.২%, ৬.৫% ও ৬.৩% হারে, অর্থাৎ বার্ষিক এক শতাংশের মত চরম দারিদ্র্য কমেছে বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। অপরদিকে সারণী – ৪ এ উপস্থাপিত তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দারিদ্র্যের গভীরতা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য খুব সামন্যই হ্রাস পেয়েছে। দারিদ্র্য ব্যবধান মূলতঃ দারিদ্র্যরেখা থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গড় দূরত্ব ও দারিদ্র্যের গভীরতা পরিমাপ করে। আর বর্গকৃত দারিদ্র্য ব্যবধান সাধারণত ঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য প্রকাশ করে। ১৯৯৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য ব্যবধান যেখানে ছিল ১১.১, সেখানে ২০০৪ সালে তা গিয়ে দাঁড়ায় ১০.৯ এ। শহর ও পল্লী অঞ্চলের ক্ষেত্রে

অনুরূপ অংকগুলো ছিল যথাক্রমে ১১.২ ও ১১.১; ৪.২ ও ৪.৫ এবং ১১.১ ও ১০.৯; ৪.০ ও ৩.৮। লক্ষ্যনীয় যে, একমাত্র শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বৈষম্য বরং কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণে আর একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। আর তা হচ্ছে এই যে, বিশেষ দু'একটি এলাকায় এর কেন্দ্রীভূত হওয়া (সারণী – ৫)। সারণী – ৫ এর তথ্য বলছে যে, দারিদ্র্যর দিক থেকে রাজশাহী বিভাগ প্রথম স্থানে আছে। এখানে ২০০৪ সালে ৬১.৬% মানুষ দারিদ্র্যের শিকার ছিল। দারিদ্র্য ব্যবধান ও বর্গকৃত দারিদ্র্য ব্যবধানও এখানে সবচেয়ে

সারণী ৫ : বিভাগ ভিত্তিক বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির চিত্র, ২০০৪ সালে

বিভাগ	মাথা গণনার হার (%)	দারিদ্র্য ব্যবধান	বর্গকৃত দারিদ্র্য ব্যবধান
১	২	৩	৪
১। বরিশাল	৩৯.৩	১১.১	৪.৩
২। চট্টগ্রাম	৬৩.৩	০৮.১	২.৭
৩। ঢাকা	৩৩.০	০৭.৭	২.৬
৪। খুলনা	৪৬.৪	১১.৫	৪.১
৫। রাজশাহী	৬১.৬	১৮.১	৬.৯
৬। সিলেট	২৮.৪	০৮.০	২.৯
জাতীয়	৪২.১	১০.৯	৩.৯

উৎসঃ ১ ও ৩, পৃঃ ১৬৬ ও ১৪১ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

বেশী, যথাক্রমে ১৮.১ ও ৬.৯। দারিদ্র্যের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে খুলনা বিভাগ যার ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ৪৬.৪%, ১১.৫ ও ৪.১। লক্ষ্যণীয় যে, এ দু'টি বিভাগের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট সূচকগুলো জাতীয় অনুরূপ সূচকসমূহের বেশ উপরে অবস্থান করছে। আর বাকী চারটি বিভাগের ক্ষেত্রেই তা জাতীয় সূচকসমূহের নীচে অথবা কাছাকাছি অবস্থান করছে। আমাদের দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির অনুধাবনে আর একটি জিনিষ অত্যন্ত সহায়ক বলে আমরা মনে করি। আর তা হচ্ছে

সারণী ৬ : ভূমির মালিকানার ভিত্তিতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির চিত্র, ২০০৪ সালে %

ভূমির মালিকানা, একরে	পল্লী	শহর	জাতীয়
১	২	৩	৪
১। ভূমিহীন	৫৭.৮০	৪৫.৫৩	৫১.৯৪
২। ছোট =১.৯৯	৪৫.৯৪	৩৮.৮৮	৪৪.৬২
৩। মাঝারী ২.০ – ৪.৯৯	২৮.৩৬	২১.৫৩	২৭.৩৫
৪। বড় ৫.০ +	২২.১১	০৯.০১	২০.০১
মোট	৪৩.৩	৩৭.৯	৪২.১

উৎসঃ ১ ও ৩, পৃঃ ১৬৬ ও ১৪১ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

এই যে, এখানে দারিদ্র্য প্রবণতা ও মালিকানাধীন ভূমির পরিমাণের মধ্যে অত্যন্ত ঋণাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান (সারণী – ৬)। সারণী – ৬ এর তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে ভূমিহীনদের মধ্যে দারিদ্র্য প্রবণতা সবচেয়ে বেশী – ৫১.৯৪%। মালিকানাধীন ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রুপে দারিদ্র্যও হ্রাস পাচ্ছে। ছোট ভূমি মালিকদের মধ্যে, অর্থাৎ যাদের ভূমির পরিমাণ ১.৯৯ একর বা তার কম তাদের মধ্যে ৪৪.৬২% মানুষ দরিদ্র। আর ২ একর থেকে ৪.৯৯ একর পর্যন্ত ভূমি মালিকদের, অর্থাৎ মাঝারী মালিকদের ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকটি হচ্ছে মাত্র ২৭.৩৫% এবং বড় মালিকদের, অর্থাৎ ৫ একর ও তার বেশী ভূমি মালিকদের মধ্যে মাত্র ২০.০১% মানুষ দরিদ্র। এ ক্ষেত্রে আবার পল্লী ও শহর এলাকার মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান। শহরের তুলনায় গ্রামে দারিদ্র্যের প্রবণতা অনেক বেশী।

মানব দারিদ্র্য পরিমাপের একটি পদ্ধতি হচ্ছে সাক্ষরতার হার। এক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় (সারণী – ৭)। সারণী – ৭ এ উপস্থাপিত তথ্য বলছে যে, বাংলাদেশের অর্ধেকেরও বেশী মানুষ এখনও অক্ষরজ্ঞানহীন। বয়সভিত্তিক কাঠামো অনুযায়ী এক্ষেত্রে কিছুটা বৈষম্য বিদ্যমান। যেমন, ২০০১ সালে পাঁচ বছর ও তদূর্ধ্বের বয়সীদের মধ্যে যেখানে সাক্ষরতার হার ৪২.৫% ছিল, সেখানে সাত বছর ও তদূর্ধ্বের এবং পনের বছর ও তদূর্ধ্বের বয়সীদের ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো ছিল যথাক্রমে

সারণী ৭ : বাংলাদেশে সাক্ষরতার চিত্র, ২০০১ – ২০০৪ সময়ে %

লিঙ্গ	সাক্ষরতা, ৫ বছর ও তদূর্ধ্ব		সাক্ষরতা, ৭ বছর ও তদূর্ধ্ব		সাক্ষরতা, ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব	
	আদমশুমারী	দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ	আদমশুমারী	দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ	আদমশুমারী	দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ
	২০০১	২০০৪	২০০১	২০০৪	২০০১	২০০৪
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। মহিলা	৩৮.৩	৪০.৪	৪০.৮	৪২.৯	৪০.৮	৪৩.৩
২। পুরুষ	৪৬.৪	৪৮.৪	৪৯.৬	৫১.১	৫৩.৯	৫৫.০
৩। উভয়	৪২.৫	৪৪.৪	৪৫.৩	৪৭.০	৪৭.৫	৪৯.২

উৎসঃ ২, পৃঃ ১৬৮ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

৪৫.৩% ও ৪৭.৫%। তিন বছরের ব্যবধানে, অর্থাৎ ২০০৪ সাল নাগাদ সর্বক্ষেত্রে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র দু'শতাংশের মত। তার মানে বার্ষিক এক শতাংশেরও কম হারে সাক্ষরতা বাড়ছে। বয়সভিত্তিক ২০০৪ সালে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো ছিল যথাক্রমে ৪৪.৪%, ৪৭.০% ও ৪৯.২%। সারণী – ৭ এর তথ্য থেকে আর একটি বিষয় পরিষ্কার যে, সাক্ষরতার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এখনও লিঙ্গ বৈষম্য বিদ্যমান। যেমন, ২০০১ সালে বয়সভিত্তিক মহিলাদের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার হারগুলো ছির যথাক্রমে ৩৮.৩%, ৪০.৮% ও ৪০.৮%; আর পুরুষদের ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো ছিল যথাক্রমে ৪৬.৪%, ৪৯.৬% ও ৫৩.৯%। এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষরা সাক্ষরতার দিক দিয়ে মহিলাদের তুলনায় অনেকখানি এগিয়ে আছে এবং বয়স কাঠামোভিত্তিক এ ব্যবধান ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পেয়েছে ঃ ২০০১ সালে পাঁচ ও তদূর্ধ্বের বয়সী পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার যেখানে ছিল ৪৬.৪% ও ৩৮.৩%, সেখানে সাত বছর ও তদূর্ধ্বের এবং পনের বছর ও তদূর্ধ্বের বয়সী পুরুষ ও

মহিলাদের ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো ছিল যথাক্রমে ৪৯.৬% ও ৪০.৮% এবং ৫৩.৯% ও ৪০.৮% । তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, প্রথম বয়স কাঠামোতে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে ৮.১%, দ্বিতীয় বয়স কাঠামোতে ৮.৮% এবং তৃতীয় বয়স কাঠামোতে ১৩.১% পিছিয়ে আছে সাক্ষরতার দিক দিয়ে । মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, প্রথম বয়স কাঠামোর তুলনায় দ্বিতীয় বয়স কাঠামোতে দুই শতাংশের মত মহিলা সাক্ষরতা বৃদ্ধির পর স্থির হয়ে গেছে, অর্থাৎ তৃতীয় বয়স কাঠামোতেও একই ছিল সাক্ষরতার হার । অপরদিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে বয়স কাঠামোভিত্তিক সাক্ষরতার হার অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । আবার তিন বছরের ব্যবধানে, অর্থাৎ ২০০৪ সালে এসেও প্রায় একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এ ক্ষেত্রে । মহিলা সাক্ষরতার ক্ষেত্রে ২০০১ সালের তুলনায় ২০০৪ সালে প্রথম বয়স কাঠামোর চেয়ে দ্বিতীয় বয়স কাঠামোতে দুই শতাংশের মত সাক্ষরতা বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হলেও তৃতীয় বয়স কাঠামোতে এসে প্রায় অপরিবর্তিই থেকে গেছে । আর পুরুষ সাক্ষরতার ক্ষেত্রে তা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে উক্ত সময়ে । সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও শিক্ষা বঞ্চিত এবং এক্ষেত্রে মহিলারা সবচেয়ে বেশী বঞ্চনার শিকার ।

মানব দারিদ্র্য পরিমাপের আর একটি সূচক হচ্ছে চিকিৎসা সুবিধা বা স্বাস্থ্য সেবা । সারণী – ৮ এর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে ১৯৯৯ – ২০০৪ সময়ে স্বাস্থ্য সেবার সার্বিক উন্নতি হয়েছে । যেমন, ১৯৯৯ সালে আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার ১৮.৪% অসুস্থ ছিল যা হ্রাস পেয়ে ২০০৪ সালে ১৫.৮% এ গিয়ে ঠেকে । দরিদ্র ও অদরিদ্র জনগোষ্ঠির ক্ষেত্রে ঐ অংকগুলো ছিল যথাক্রমে ১৭.৪% ও ১৫.৩% এবং ১৯.৩% ও ১৬.১% । তার মানে দরিদ্র–অদরিদ্র নির্বিশেষে বার্ষিক এক শতাংশের অনেক কম হারে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে । তবে এ ক্ষেত্রেও পল্লী ও শহারাঞ্চলের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বা বৈষম্য লক্ষ্যণীয় । শহরাঞ্চলে রোগীর অনুপাত পল্লী এলাকার তুলনায় কিছুটা কম হলেও ১৯৯৯ – ২০০৪ সময়ে তেমন কোনও পরিবর্তন হয় নি । আর পল্লী এলাকায় অসুস্থ মানুষের অনুপাতটা যেমন শহরাঞ্চলের চেয়ে কিছুটা বেশী, তেমনি উক্ত সময়ে তা হ্রাসের হারটাও কিছুটা বেশী । মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, দরিদ্রদের চেয়ে অদরিদ্রদের মধ্যে অসুস্থ মানুষের অনুপাত বেশী এবং সর্বক্ষেত্রেই এটা সত্য । অথচ কে না জানে যে, আমাদের দেশের প্রায় দুই থেকে তিন কোটি মানুষ শুধু অন্ধত্ব ও যক্ষার শিকার যাদের শতকরা আশি ভাগেরও বেশী হচ্ছে দরিদ্ররা । আর্সেনিক ও অপুষ্টিজনিত অন্যান্য অসুস্থতার কথা না-ই বা বললাম । অতএব, যেমনটা ইতোমধ্যেই উপরে উল্লেখ করেছি যে, বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা গ্রন্থের এ তথ্য নিয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে ।

সারণী ৮ : বাংলাদেশের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির সার্বিক চিত্র, ১৯৯৯ – ২০০৪ সময়ে

অঞ্চল	অসুস্থ জনসংখ্যার অংশ, %					
	১৯৯৯			২০০৪		
	দরিদ্র	অদরিদ্র	মোট	দরিদ্র	অদরিদ্র	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬ ৭	
১ । পল্লী	১৮.৭	২০.৩	১৯.৬	১৫.৪	১৭.১	১৬.৪
২ । শহর	১৫.০	১৭.৬	১৬.৪	১৪.৭	১২.৯	১৩.৬
৩ । জাতীয়	১৭.৪	১৯.৩	১৮.৪	১৫.৩	১৬.১	১৫.৮

উৎসঃ ২, পৃঃ ১৬৯ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ।

যাহোক বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে এখন আমরা সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের আকাংখাসমূহ নিয়ে আলোচনা করবো এবং বাস্তবতার সাথে একটু মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করবো ।

দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রটির মৌলিক দুর্বলতা হলো এই যে, এটি বাংলাদেশের দারিদ্র্যের কাঠামো ও ব্যবস্থাগত কারণের দিকে আদৌ নজর দেয় নি । এতে দারিদ্র্যের শিকড় সন্ধানের কোন চেষ্টাই করা হয় নি । এতে দারিদ্র্য নিরসনের কৌশল হিসেবে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । আর এ কাজটি সম্পাদনের ভার দেয়া হয়েছে বেসরকারী খাতের উপর । সরকার শুধু সহায়কের ভূমিকা পালন করবে । বস্তুতপক্ষে এ ধরনের বস্তাপচাঁ পুঁজিবাদী তত্ত্ব কথা আমরা বিগত শতাব্দীর সেই ষাটের দশক থেকেই শুনে আসছি । তখনও বলা হতো যে, প্রবৃদ্ধি হলেই তা চুয়িয়ে পড়বে গোটা দেশে এবং তাতেই উন্নতি হবে এবং দারিদ্র্য দূর হবে । কিন্তু বিগত সাড়ে তিন দশকের অভিজ্ঞতা বলছে যে, প্রবৃদ্ধির মাত্রা উঁচু হলেই তা দারিদ্র্য দূরীকরনে কোন ভূমিকা রাখে না, যদি না তার সঙ্গে যুক্ত হয় নতুন সৃষ্ট সম্পদের ন্যায্য বন্টনের বিষয়টি । বাজার অর্থনীতি কখনই তা নিশ্চিত করতে পারে না । এখানেই আসে রাষ্ট্রের গণমুখী নীতি নির্ধারণ ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের কথা । কিন্তু কেবল বাংলাদেশ কেন কোন নয়া উদারবাদী রাষ্ট্রই এই ন্যায্য বন্টনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারবে না । কারণ ব্যবস্থাটি নিজেই সে পথে একটি বড় বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে । মুখে মুখে সরকার ও দাতাগোষ্ঠী যতই দারিদ্র্য অভিমুখী প্রবৃদ্ধির কথা বলুক না কেন, আসলে তা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই না । তথাকথিত দারিদ্র্য অভিমুখী প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্য দারিদ্র্য দূর করা নয়, তাকে খানিকটা হ্রাস করা এবং মোটামুটি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা । সর্বোপরি, তথাকথিত এই দারিদ্র্য অভিমুখী প্রবৃদ্ধির মতাদর্শিক ধারনায় সমতার কোনও ঠাঁই নেই । এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্রদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রদত্ত উচ্ছিষ্টের পরিমাণ খানিকটা বাড়িয়ে দেয়া ।

দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপায় হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিকাশের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । আমরা বিশ্বাস করি যে, ঐ একই ব্যবস্থাগত প্রতিবন্ধকতার কারণে এরও বাস্তবায়ন সম্ভব নয় । অন্যদিকে অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, তথাকথিত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় প্রত্যাশিত কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বদলে বরং নতুন নতুন বেকারত্বের সৃষ্টি হচ্ছে । বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের পরামর্শে ঢালাও এবং একতরফাভাবে আমদানী উদারীকরণের ফলে আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় । সেই প্রক্রিয়া অদ্যাবধি চলছে । ফলশ্রুতিতে লাখ লাখ শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে । ২০০৩ সালে উপরোক্ত পরামর্শদাতাদের অর্থে মাইডাস পরিচালিত জাতীয় পর্যায়ের এক জরিপ প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, শুধুমাত্র জরিপ পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে বাংলাদেশে সাড়ে পাঁচ লাখেরও বেশী ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে এবং এর ফলে প্রায় সাড়ে বাইশ লাখ মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছে (১৫, ০৫. ০৩. ০৬) । আমদানী উদারীকরনের অভিঘাতেই মূলতঃ এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারে নি । এ ছাড়া ঢালাও বেসরকারীকরণ নীতি বাস্তবায়নের ফলে দেশী শিল্পখাত প্রায় ধ্বংসের মুখে পড়েছে । এর ফলে বহু দেশীয় শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং বেকার হয়ে পড়েছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী । অথচ দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার শর্ত পূরণ করতে গিয়ে সরকার অব্যাহতভাবে আমদানী উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জোরেশোরেই চালিয়ে যাচ্ছে । বাংলাদেশ সরকারের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাম্প্রতিককালের তথ্যে দেখানো হয়েছে যে, দেশে বেকারের সংখ্যা তিন কোটির

মত। বলতেই হবে এটা অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিসংখ্যান। প্রকৃত বেকারের সংখ্যা অবশ্যই অনেক অনেক বেশী। আমাদের মতে অর্ধবেকার ও কার্যত বেকারসহ বাংলাদেশের বেকারের সংখ্যা সাত কোটি ছাড়িয়ে গেছে বহু আগেই। সবচেয়ে আশংকার কথা হলো এ সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছেই। এ বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করার জন্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পকে যে প্রটেকশন দেয়া প্রয়োজন তা-ও নয়া উদারবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ তথাকথিত বিশ্বায়নের মোড়ল দেশসমূহ ও তাদের বশংবদ বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা তা করতে দেবে না কিছুতেই। তদুপরি দারিদ্র্য নিরসনে শুধু কর্মসংস্থান সৃষ্টিই যথেষ্ট নয়, তার স্থায়িত্বশীলতাও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আজকের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতিতে নিশ্চিত করা একেবারেই অসম্ভব। তা'ছাড়া অর্থবহ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরী এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়টিও বিবেচনায় নেয়া আবশ্যক। বিশেষ করে কৃষি শ্রমিকের মজুরীর বিষয়টি বিশেষ নীতি-প্রণয়ন ও বিবেচনার দাবী রাখে। তা না হলে কার্যকরভাবে আমাদের দেশের দারিদ্র্য বিমোচন কখনই সম্ভব হবে না। বাংলাদেশের কর ব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন এবং একে দরিদ্র-অভিমুখী করা দরকার। কর ব্যবস্থা অবশ্যই যেন দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রাখে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর সেজন্যে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ করের বোঝা না চাপিয়ে সমাজের বিত্তবানদের উপর আরও বেশী প্রত্যক্ষ কর আরোপ করতে হবে। তা না হলে দারিদ্র্য নিরসনে যে পদক্ষেপই নেয়া হোক না কেন তা কোন কার্যকর প্রভাব রাখবে না। কারণ কর ব্যবস্থায় এ ধরনের পরিবর্তন আনা না হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় আরও সংকুচিত হয়ে পড়বে এবং তাদের ক্রয় ক্ষমতা আরও হ্রাস পাবে। ফলে দরিদ্ররা কখনই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র অত্যন্ত চাতুরতার সাথে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে কার্যত পাশ কাটিয়ে গেছে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এর প্রণয়ন পদ্ধতি। আসলে বাংলাদেশের তথাকথিত দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী দাতাগোষ্ঠির চাপিয়ে দেয়া এবং তাদের নির্দেশিত ও তাদের স্বার্থে প্রণিত একটি কৌশল পত্র। আমাদের দেশের দারিদ্র্য হ্রাসের ব্যাপারটি হচ্ছে এর মুখোশ মাত্র। এটা রচিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক সরবরাহকৃত সোর্সবুকের আলোকে, যাতে সুনির্দিষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র রচনার প্রক্রিয়াটি কেমন হবে এবং কী কী উপাদান এতে থাকবে। এতে আরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কৌশল পত্রটি তৈরী করতে হবে বিশ্ব ব্যাংকের কম্প্রিহেনসিভ ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্কের ভিত্তিতে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এসব নির্দেশনা ও রূপরেখায় অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর প্রণয়ন প্রক্রিয়াটিকে হতে হবে কান্ট্রিড্রিভেন বা দেশজাত। কিন্তু আমাদের প্রশ ঃ একই সময়ে একটি প্রক্রিয়া কিভাবে ডোনার-ড্রিভেন বা দাতাজাত ও কান্ট্রিড্রিভেন বা দেশজাত হতে পারে? আসলে কান্ট্রিড্রিভেন বা দেশজাত ব্যাপারটিও একটি মুখোশ। বলা হয়েছে তা নাকি সম্ভব হয়েছে প্রক্রিয়াটিকে অংশগ্রহণমূলক করার মাধ্যমে। কিন্তু পূর্বাহ্নেই যেখানে রূপরেখা ঠিক হয়ে ছিল, উপাদানও নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, সেখানে অংশ গ্রহণের কোনও সুযোগ আর থাকলো কি বাংলাদেশের জন্যে? আসলে তথাকথিত দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র প্রণয়নকারী এমন একটি দেশও নেই, যেখানে এ অংশ গ্রহণের ব্যাপারটি প্রশ্নবিদ্ধ হয় নি। সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের নাগরিক সমাজ কৌশল পত্রের প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাত্রা ও গুণাগুণ নিয়ে অসন্তোষ ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। আমাদের দেশেও আমাদের জানামতে কিছু ভাড়াটিয়া দালাল ও আমলা ছাড়া কৌশল পত্র রচনার সাথে সাধারণ মানুষ দূরের কথা শিক্ষিত সমাজেরও কোন

সম্পৃক্ততা ছিল না। তারপরও প্রশ্ন উঠে ঃ সবার অংশগ্রহণ বা সম্পৃক্ততা থাকলেই বা কী হতো? সাম্রাজ্যবাদী উপরোক্ত দাতা সংস্থা দু'টোর দেয়া নীল নকশার বাইরে যাওয়ার কি কোন সুযোগ ছিল? নিশ্চয়ই না। কারণ সেরকম কিছু ঘটলে বিশ্ব ব্যাংকের নির্বাহী বোর্ডের অনুমোদনের জন্যেই তা পাঠানো হতো না, নাকোচ হয়ে যেত ঢাকার অফিস থেকেই। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের তথাকথিত দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রের প্রকৃত মালিক হচ্ছে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল। আর বাংলাদেশ সরকার হচ্ছে এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা মাত্র।

দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রে নির্ধারিত লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্যে মূলতঃ বেসরকারী খাত ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের ভূমিকার উপর অতি মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমাদের জানামতে বেসরকারী খাত ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে নি এবং পারবেও না। ১৯৭৫ এর আগষ্ট (বঙ্গ বন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয় ১৫-ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালে) পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত বেসরকারী খাতের ভূমিকা সন্দেহাতীতভাবে আমাদেরকে হতাশ করেছে। এ দেশে বেসরকারী খাত বিকশিত হয়েছে মূলতঃ রাষ্ট্রীয় খাতকে পুঁজি করে। পঁচাত্তর পরবর্তী সামরিক ও বেসামরিক সরকারগুলো বেসরকারী খাতের বিকাশের নামে রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যাংকের টাকা অবাধে লুণ্ঠন করতে সহায়তা করেছে, ব্যক্তিগত খাতকে কর মওকুফ সুবিধা দিয়েছে এবং প্রতিটি বাজেটে তাদের জন্যে নগদ সহায়তার (রপ্তানীতে উৎসাহ প্রদানের নামে) নামে বিপুল অংকের টাকা বরাদ্দ রেখেছে। এ ছাড়াও তারা শুল্ক মওকুফ সুবিধা ভোগ করেছে। এই যে হাজার হাজার কোটি টাকার আর্থিক সুবিধা বেসরকারী খাত রাষ্ট্র তথা সরকারের কাছ থেকে নিয়েছে বা নিচ্ছে এগুলো কিন্তু সব জনগণের টাকা। বিনিময়ে তারা জনগণকে কি দিয়েছে? দিয়েছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার খেলাপী ঋণ, যার মধ্যে কুড়ি হাজার কোটি টাকা সম্ভবতঃ ইতোমধ্যেই মওকুফ করে দেয়া হয়েছে নানা অজুহাতে। দিয়েছে শোষণ, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য। ধ্বংস করেছে বস্ত্র শিল্পকে। ধ্বংস করেছে দরিদ্রদের পরিবহণ রেল ও নৌ পরিবহণ ব্যবস্থাকে। বলতে গেলে এ তালিকা অনেক দীর্ঘ হবে। আলোচ্য প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এ সম্পর্কে আর কথা বাড়াবো না। অন্যদিকে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও পদ্ধতি প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছিল সমাজতন্ত্রকে ঠেকানোর জন্যে বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র জনগণ যাতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার চাপে বিদ্রোহী হয়ে না ওঠে এবং সামাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট না হয়, সেজন্যে এই ব্যবস্থার দ্বারা দরিদ্র দেশগুলোর তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এনজিওগুলোর ওপর নির্ভরশীল কিছু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। নারী ও বেকার যুবকদের বামপন্থী কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন থেকে সরিয়ে রাখাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। এদের কলকাঠি নাড়ত কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশগুলো এবং তাদের বশংবদ বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ও মধ্য প্রাচ্যের সুলতান-বাদশা নামধারী চরম রক্ষণশীল শাসক-গোষ্ঠী। ঠান্ডা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষায় তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ তথাকথিত "সমাজতান্ত্রিক হুমকি" থেকে মুক্ত হওয়ায় তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এনজিওগুলোর প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় – তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে তার পাশাপাশি এমন একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করা, যাতে প্রয়োজন পড়লে রাজনৈতিক সরকারগুলোকে তারা ইচ্ছামতো চালনা করতে পারে এবং কথা না শুনলে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে পারে। আমাদের দেশে বর্তমানে কোন কোন এনজিও বিশালত্বে এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিতে এমন "বিকল্প" সরকার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, অনেকে ইতোমধ্যেই আশংকা প্রকাশ করেছেন, সাধারণ নির্বাচনের সময় তারা বশীভূত ভোটারদের দ্বারা যেকোন দলকে ক্ষমতায় রাখা বা অপসারনের শক্তি

অর্জনের পর্যায়ে গিয়ে পৌছাতে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের উত্থান ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্টের কাজে একশ্রেণীর ইসলামী ব্যাংক ও এনজিওর ভূমিকা স্মর্তব্য (১৬, ২৯ ঃ ০৩ ঃ ০৬)।

এনজিওগুলো সম্পর্কে আর একটি কথা না বললেই নয়। আর তা হচ্ছে তাদের ক্ষুদ্র ঋণ বা মাইক্রো ক্রেডিট কার্যক্রম। এর মূল উদ্দেশ্য যতটা না দারিদ্র্য দূর করা তার চেয়ে বেশী হচ্ছে কায়েমী স্বার্থ গ্রুপ বা ভেষ্টেড ইন্টারেষ্ট গ্রুপ সৃষ্টি করা। আর তাই তো আমরা প্রতিনিয়ত খবরের কাগজে ও টিভিতে দেখতে পাই তাদের ঘন ঘন বিদেশ সফরের খবর। কি জন্যে তারা বিদেশ সফর করেন? সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র ঋণের সাফল্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে এবং সাম্রাজ্যবাদের ধারক-বাহক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাত করার জন্যে। একদিকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, সার্ভিস চার্জের নামে ক্ষুদ্র ঋণের জন্য তারা বিপুল অংকের সুদ আদায় করছে ঋণ গ্রহীতাদের কাছ থেকে; আর অন্যদিকে দেখছি বিশাল বিশাল ভবন নির্মান করে ভাড়া দিচ্ছে এবং বহুমুখী সব বানিজ্যিক কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে পড়ছে ক্রমান্বয়ে। এখানেই তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের আশংকা। ইদানিং তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব নিয়ে যখন কথা হচ্ছে, তখন সাম্রাজ্যবাদীদের শেখানো তথাকথিত সুশাসন ও উন্নয়নের রোড ম্যাপের (পুঁজিবাদী) জিকির তুলে পাঁচ তারকা হোটেলের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সমবেত হয়ে তারাই যে সেই তৃতীয় শক্তি সেকথাও তারা ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে। অবশ্য দেশব্যাপী তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠায় আপাততঃ তারা কৌশলে কিছুটা পরিবর্তন আনলেও লক্ষ্য অর্জনে তারা অটল বলেই মনে হচ্ছে। কারণ এ ক্ষেত্রে তারা সামরিক ও বেসামরিক আমলা চক্রের সমর্থন পাচ্ছে। এনজিওগুলোর এসব কর্মকান্ড থেকে প্রমানিত হচ্ছে যে, দরিদ্রদের দারিদ্র্য বিমোচন তাদের লক্ষ্য নয়, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে নিজেদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের দারিদ্র্য কিছু সময়ের জন্যে প্রশমিত করে সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করা। প্রশ্ন হচ্ছে কতদিন পারবে তারা একাজ করতে? শেষ বিচারে সফল হবে কি? আমরা বিশ্বাস করি হবে না। ল্যাটীন আমেরিকার ঘটনাবলী ও পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালের ঘটনাবলী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রে অবকাঠামোর কথা বলতে গিয়ে রেল ও নৌ যোগাযোগের ব্যাপারে প্রায় নিরবতা পালন করেছেন এর রচয়িতারা। অথচ কে না জানে যে, স্থল পরিবহণের ও যোগাযোগের সবচেয়ে সস্তা, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হচ্ছে রেল পথ এবং নৌ পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে সকল প্রকার পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে সস্তা। প্রকৃতি আমাদেরকে উদার হস্তে নৌ ও সামুদ্রিক পরিবহণ ও যোগাযোগের সুবিধা দান করেছিল ঃ বাংলাদেশের গোটা দক্ষিণ সীমান্ত সাগরের দিকে উন্মুক্ত এবং আভ্যন্তরীণভাবে গোটা বাংলাদেশ চারটি শক্তিশালী নদী প্রণালী দ্বারা আবৃত (গঙ্গা-পদ্মা, ব্রক্ষ্মপুত্র-যমুনা, মেঘনা ও কর্ণফুলী)। দুঃখের বিষয় যে, স্বাধীনতার পয়ত্রিশ বছরেও আমরা প্রকৃতি প্রদত্ত এ সকল সুযোগ-সুবিধার কানাকড়িও কাজে লাগাতে পারি নি। কৌশল পত্রে প্রায় তিন লক্ষ কিঃ মিঃ রাস্তা বানানোর ব্যাপারে প্রসংশাসূচক অনেক কথা বলা হয়েছে ; অথচ রেলের ব্যাপারে প্রায় নিরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। তিন লক্ষ কিঃ মিঃ রাস্তার নীচে যে লক্ষ লক্ষ হেক্টর মূল্যবান কৃষিজমি নষ্ট হয়েছে সেব্যাপারে কোনও হিসেব নিকেশ করা হয় নি কৌশল পত্রে। অন্যদিকে রেলের মাধ্যমে রাজধানী ঢাকাকে যদি চৌষট্টিটি জেলা শহরের সাথে সংযুক্ত করা যেত এবং বড় বড় বিশেষ করে রাজধানী ও বিভাগীয় শহরগুলোকে কেন্দ্র করে কমিউটার ট্রেন সার্ভিস গড়ে তোলা যেত তা'হলে কি পরিমাণ উপকার হতো তারও কোনও হিসেব করেন নি কৌশল পত্র প্রণেতারা। অথচ আমরা সবাই

জানি উপরোক্ত দু'টো পরিবহণ ও যোগাযোগ মাধ্যমই দরিদ্র-বান্ধব এবং উন্নয়ন বান্ধবও বটে। দেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক সচলতা বা ইকোনমিক মোবিলিটি বৃদ্ধিতে এগুলো হচ্ছে অদ্বিতীয় (১৩)।

দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্রে সুশাসনের কথা বলা হয়েছে ; অথচ বর্তমান জোট সরকারের দুঃশাসন নিয়ে কোন কথাই বলা হয় নি। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের বিগত সাড়ে চার বছরের তথাকথিত কুশাসন ও অপশাসনে দেশ আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছেছে। দেশের প্রত্যেকটি খাত আজ সংকট ও নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির শিকার। তবে জোট সরকার সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে জনপ্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার। ২০০১ এর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক উপজেলা নির্বাচন না করে; বরং অনির্বাচিত ও অপ্রয়োজনীয় গ্রাম সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। আর গ্রাম সরকারগুলো সম্পূর্ণরূপে সরকার দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে গঠন করা হয়েছে। এর ফলে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদগুলোর কর্মকান্ড অনেকটাই ঝিমিয়ে পড়েছে। কারণ প্রায়শই কর্তৃত্ব নিয়ে গ্রাম সরকারগুলো ইউনিয়ন পরিষদের সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। ব্যাহত হচ্ছে পল্লী এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ড। গত বছরই গ্রাম সরকার আইনকে অবৈধ এবং সংবিধান পরিপন্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট। অবশ্য সরকার এ রায়কে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে অদ্যাবধি। ক্ষমতায় এসেই জোট সরকার আর একটি তোঘলোকী কাজ করে। আর তা হচ্ছে এই যে, সরকার দলীয় সাংসদ, মন্ত্রী ও বশংবদদের নির্বাহী নির্দেশে স্থানীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়। এর ফলে স্থানীয় প্রশাসন বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে নি। সবকিছুই নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়লো। সরকারী দলের ক্যাডাররা সবাই নিজেদেরকে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ভাবতে শুরু করলো। আমলারা হয়ে পড়লো একেবারেই নিরুপায়। এ সকল নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী মন্ত্রীদের হুকুম তালিম করাই হয়ে পড়লো তাদের একমাত্র কাজ। এরই অবধারিত ফল স্বরূপ বিগত সাড়ে চার বছর ধরে গোটা বাংলাদেশে চলছে দখল, জবরদখল, হামলা, মামলা, খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও দুর্নীতির মচ্ছব। সাংসদ আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর ২০০৩ সালের এক মামলার রায়ে ইদানিং হাইকোর্ট উপরোক্ত নির্বাহী আদেশকেও অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দুর্নীতি দূর করার জন্যে চার বছরের মাথায় জোট সরকার বুড়ো, অক্ষম এবং সম্পূর্ণ দলীয় লোকদের সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করেছে। এক বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে; অথচ এ দুর্নীতি দমন কমিশন আদৌ কোন কাজ করে নি। এটা গোটা জাতির সাথে এক ধরনের তামাশা ছাড়া আর কিছুই না। আসলে যে সরকার দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, সে সরকার কখনই দুর্নীতির বিচার চাইতে পারে না। আর সেকারণেই সম্ভবতঃ দুর্নীতি দমনের নামে এরকম একটি বাহাস করেছে সরকার। সুশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ও স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমের উপস্থিতি। বর্তমান বিএনপি-জামাতের জোট সরকার ২০০১ সালের নির্বাচনের সময়ে বিচার বিভাগ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা দেবে বলে এ দেশের জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অথচ মেয়াদের শেষ প্রান্তে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিচার বিভাগ তো স্বাধীন হয়ই নি ; বরং একে অত্যন্ত নগ্নভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে এবং সরকার নিজেই আদলত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে। স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমকে বলা হয়ে থাকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। অথচ সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের নির্যাতনে জোট সরকার শুধু দেশে নয় সারা বিশ্বে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ১৯৯১ ও ২০০১ এর নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারকে স্বায়ত্বশাসন প্রদানের। তখনও এ অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করে নি বিএনপি। আর এবারে তো সে অঙ্গীকারের কথা স্মরণও করছে না। বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারকে এখন বিএনপি ও জামাতের একান্তই দলীয় প্রচার যন্ত্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ব্যক্তি খাতের

প্রবক্তারা এবারে ক্ষমতায় এসে ব্যক্তি মালিকানার একমাত্র টিভি চ্যানেল একুশে টিভিকে শুধু বন্ধ করেই খান্ত হয় নি ; এর মালিক, পরিচালক ও কলা-কুশলী ও সাংবাদিকদের চরমভাবে নির্যাতন ও হেনস্তা করেছে। এমন কি এর বিদেশী মালিক আমাদের মহান মুক্তি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিখ্যাত বৃটিশ সাংবাদিক সায়মন ড্রিংককে অত্যন্ত নির্মম ও অসম্মানজনকভাবে বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মামলা করেছে একুশে টিভির বিরুদ্ধে। বর্তমানে এ চ্যানেলটি সকল মামলা থেকে মুক্ত হওয়ার পরও সরকার নানা তালবাহানায় এর সম্প্রচারের লাইসেন্স দিচ্ছে না। অথচ চার বছর পূর্বেও যাদের গরুর গাড়ী ক্রয়ের সামর্থ্য ছিল না ; তারা আজকে একাধিক চ্যানেলের মালিক বনে গেছে জোট সরকারের বদান্যতায়। দলীয় বিবেচনায় নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ডজন খানেক চ্যানেলের অনুমতি ইতোমধ্যেই দেয়া হয়েছে এবং আরও নাকি অনেক প্রক্রিয়াধীন আছে। বিরোধীদের এবং সৎ ও নিরপেক্ষতার দাবীদারদের এক্ষেত্রে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে উপরোক্ত বিষয়গুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য হলেও কৌশল পত্র প্রণেতারা অন্যান্য অনেক কিছুর মত ওগুলোকেও এড়িয়ে গেছেন সুকৌশলে ; দিতে হবে, করতে হবে গোছের কিছু বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। সর্বোপরি যেই দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্যে কৌশল পত্র সেই জনগোষ্ঠী এ সম্পর্কে আদৌ কিছু জানে না। আর তাই তো প্রতিদিনকার সংবাদপত্রে আমরা দেখতে পাই যে, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রকল্পসমূহের টাকা আত্মসাত করছে সরকার দলীয় ক্যাডাররা (১৫, ২২ ঃ ০৪ ঃ ০৬, ২৫ ঃ ০৪ ঃ ০৬ ও ২৯ ঃ ০৪ ঃ ০৬)। দেশের সর্বত্র, সর্বক্ষেত্রে চলছে হরিলুট (১৫, ০৮ ঃ ০১ ঃ ০৬, ২০ ঃ ০১ ঃ ০৬ ও ১১ ঃ ০৪ ঃ ০৬)। এমতাবস্থায়, আমরা মনে করি যে, তথাকথিত সহাস্রাব্দের লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রার নামে যা নির্ধারণ করা হয়েছে কৌশলপত্রে (সারণী – ১) তা আদৌ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আর তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আসলে এ কৌশল পত্র দারিদ্র্য নির্মূল বা হ্রাসের জন্যে নয় ; বরং দারিদ্র্য সংরক্ষণের জন্যেই করা হয়েছে। ইংরেজীতে আমরা এভাবে বলতে পারি ঃ It is not a Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP); but a Poverty Preservation Strategy Paper (PPSP).

পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা বনাম দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র

আধুনিক পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার জন্ম হয় বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নে। আসলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার ধারনাটি সমাজতন্ত্রের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। পরিকল্পনা ছাড়া সমাজতন্ত্রের কথা চিন্তাই করা যায় না। অবশ্য সোভিয়েতদের পরিকল্পিত উন্নয়ন শুরু করতে একটু দেরী হয়। কারণ ১৯১৭ সালের ৭-ই নভেম্বর (রুশ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৫-শে অক্টোবর যেজন্যে একে মহান অক্টোবর বিপ্লব নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে) মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাত্র ছয় মাসের মাথায় ১৯১৮ সালের এপ্রিলে বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক ও জাপানসহ এক ডজনের মত শক্তিশালী পুঁজিবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে এর তিন চতুর্থাংশ দখল করে নেয়। সদ্যজাত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিকে তারা গলাটিপে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সে আশা পূর্ণ হয় নি। মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে মাত্র দেড় বছরের মাথায় ১৯২০ সালের ডিসেম্বর নাগাদ সোভিয়েতরা সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে তাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই সোভিয়েতরা গোত্রলরো নামে বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যার বাস্তবায়ন শুরু হয় ১৯২১ সাল থেকে। এ পরিকল্পনাটি ছিল দীর্ঘ মেয়াদী, অর্থাৎ দশ থেকে পনের-বিশ বছরের জন্যে। এ পরিকল্পনায় মূলতঃ গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নের

বিদ্যুতায়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আর সেজন্যে লেনিন একে সমস্ত দেশের বিদ্যুতায়নের পরিকল্পনা নামে অভিহিত করেছিলেন। এর পাশাপাশি সোভিয়েতরা পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (মধ্যমেয়াদী) রচনার কাজও এগিয়ে নেয়। কারণ গোত্রলরো পরিকল্পনা আসলে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯২৮ সালের শেষদিকে তারা বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যার মেয়াদকাল ছিল ১৯২৮–২৯ থেকে ১৯৩২–৩৩ সাল পর্যন্ত। মাত্র সোয়া চার বছরে তারা এ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা শুধু অর্জনই করে নি ; প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাকে অতিক্রম করে যায় বহুগুণে। ফলে পরিকল্পনার মেয়াদের অনেক পূর্বেই তারা দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষক পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যার মেয়াদকাল ছিল ১৯৩২-৩৩ থেকে ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্যন্ত। এ দু'টি পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অত্যন্ত সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু সমাজতন্ত্রের ভিত্তিই নির্মাণ করে নি, দেশে শিল্প বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছিল। ১৯৩৭ সাল নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বে একটি শক্তিশালী শিল্পায়ীত দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। পুঁজিবাদী দেশগুলোতে যেখানে শিল্প বিপ্লব ঘটাতে তিনশো থেকে চারশো বছর সময় লেগেছিল (বিশ্বকে লুণ্ঠন করার পরও); সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন মাত্র দু'দশকে (চরম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও) শিল্প বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। আর পরিকল্পনার হিসেবে দেখলে মাত্র দু'টো পরিকল্পনায়ই, অর্থাৎ মাত্র দশ বছরেই সোভিয়েতরা অমন অসাধ্য সাধন করেছিল। আসলে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই (মাত্র ৪.২৫ বছরে) তারা দেশ থেকে দারিদ্র্যকে চিরতরে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল এবং মানুষের ছয়টি মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান) পূরণে সক্ষম হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হতে না হতেই অর্থনীতিতে শ্রমশক্তির ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। যেকারণে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় তারা শ্রম সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। গোত্রলরো পরিকল্পনায় সোভিয়েতরা ৩০টি বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিল, যার তিন চুতর্থাংশই নির্ধারিত ছিল প্রত্যন্ত এলাকাগুলোর জন্যে। কিন্তু বাস্তবে ১৯৩৭ সাল নাগাদ তারা ৪২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছিল, যার বেশীরভাগই তখন উৎপাদনে ছিল। আসলে গোত্রলরো এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাগুলোই সোভিয়েত ইউনিয়নের পরবর্তী উন্নয়নের শক্ত ভিত তৈরী করে দিয়েছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সোভিয়েতরা যখন সংকটবিহীনভাবে এরকম অভূতপূর্ব সাফাল্য অর্জন করেছিল, ঠিক তখন সমস্ত পুঁজিবাদী বিশ্ব মহাসংকটে (১৯২৯-১৯৩২ এর মহামন্দা) হাবুডুবু খাচ্ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৩৭-৩৮-১৯৪১-৪২) বাস্তবায়ন করতে পারে নি। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর প্ররোচনায় হিটলারের জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পাদিত অনাক্রমন চুক্তি লংঘন করে বিশ্বাসঘাতকের মত ১৯৪১ সালের ২২-শে জুন এক কোটি সৈন্য নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। গোটা সোভিয়েত অর্থনীতি পুনরায় যুদ্ধ কালীন অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৫ সালের ৯-ই মে লাল বাহিনীর হাতে বার্লিনের পতনের মাধ্যমে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ সময়ে কোনও পরিকল্পনা করা সম্ভব ছিল না। যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের অপূরণীয় ক্ষতি হয় ঃ প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন সোভিয়েত নাগরিক প্রাণ হারায় এবং দেশটির তিন চতুর্থাংশ বস্তুগত সম্পদ ধ্বংস হয়েছিল, বিরান হয়ে গিয়েছিল কৃষি। যুদ্ধোত্তর সময়ে তারা চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করে যার মেয়াদকাল ছিল ১৯৪৫-৪৬ থেকে ১৯৪৯-৫০ সাল পর্যন্ত। এ পরিকল্পনাটি ছিল মূলতঃ পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের পরিকল্পনা (৫, ৬)।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পূর্ব ইউরোপের পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয় এবং ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী কিউবায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে ফিডেল ক্যাস্ট্রো ক্ষমতায় আসেন। তবে এগুলোর চেয়েও বড় ঘটনা হলো এই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সময়ে অতি দ্রুত সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর উপনিবেশগুলোতে দাউ দাউ করে স্বাধীনতার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আর এক্ষেত্রে উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা সংগ্রামীরা স্বাভাবিকভাবেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন পায়। ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই যে, মাত্র দু'দশকের ব্যবধানে পৃথিবীর মানচিত্রে একশোরও বেশী স্বাধীন রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। সারা পৃথিবীব্যাপী বৃটেন, ফ্রান্স ও পর্তুগালসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের উপনিবেশ হারায়। আর এ জন্যে তারা সমাজতন্ত্রের উপর ক্ষিপ্ত হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের ক্ষেত্র সাংঘাতিকভাবে সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় তারা নতুনভাবে চক্রান্ত শুরু করে নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তাদের ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলোকে সমাজতন্ত্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে। তারা নতুন রাষ্ট্রগুলোকে তাদের প্রয়োজনীয় সকল ধরনের কাঁচামালের উৎস ও তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার হিসেবে ব্যবহারের পদ্ধতি খুঁজতে শুরু করে। আর এভাবে তারা নব্য সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

অন্যদিকে বিগত শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকের পুঁজিবাদের মহাসংকট এবং যুগযুগের ঐপনিবেশিক শাসন, লুণ্ঠন ও শোষণের ফলে নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলো সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাফল্যে তারা সাংঘাতিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সারা বিশ্বব্যাপী তখন পরিকল্পিত অর্থনীতির ধারণাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশই পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকে তাদের উন্নয়নের প্রধান দর্শন হিসেবে বেছে নেয়। তবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের অগ্রযাত্রাকে নানাভাবে বাধা দিতে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সফলকাম হয়। এ ক্ষেত্রে তারা বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, কমনওয়েলথসহ তাদের গঠিত বিভিন্ন সংস্থাকে ব্যবহার করে। এমন কি যেসকল দেশ তাদের কথামত চলতে রাজি হয় নি, সেখানে তারা বল প্রয়োগ পর্যন্ত করেছে। ইন্দোনেশিয়ার ড. সুকর্ণোর সরকার, চিলির ড. আলেন্দের সরকার ও বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধুর সরকারসহ বহু দেশের সরকারকে তারা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে উৎখাত করেছে অত্যন্ত নৃশংসভাবে। অথচ চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, কিউবা, ভারত ও মালয়েশিয়ার মত দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদীদের রুখে দাঁড়াতে পেরেছে বিধায় তারা পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশও স্বাধীনতা উত্তর সময়ে তার আর্থসামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্যে পরিকল্পিত উন্নয়নকে প্রধান অর্থনৈতিক দর্শন হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের আশা-আকাংখাকে ধারণ করে ১৯৭২ সালেই রচিত হয়েছিল বাংলাদেশের সংবিধান যা ঐ বছরের ৪-ঠা নভেম্বর সংসদে পাশ হয়েছিল। এ সংবিধানে বাংলাদেশের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল চারটি ঃ বাঙালী জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। আর এ চারটি লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) যার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ (১০)ঃ

১। *দারিদ্র্য হ্রাস করা ;*

২। *পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন ১৯৬৯-৭০ সালের পর্যায়ে উন্নীত করা ;*

৩। *মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৫.৫% হারে বৃদ্ধি করা, ৪১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং ছদ্ম বেকারত্ব হ্রাস করা ;*

৪। *ভোগ্য পণ্যের (খাদ্য, বস্ত্র, ভোজ্য তেল, কেরোশিন ও চিনি) উৎপাদন বৃদ্ধি করা ;*

৫। *মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা ;*

৬। *মাথাপিছু আয় ২.৫% হারে বৃদ্ধি করা (দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধি ও ধনীদের আয় স্থির রাখার মাধ্যমে);*

৭। *সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্যে ইতোমধ্যে অর্জিত সাফল্যসমূহকে আরও শক্তিশালী ও মজবুত করা ;*

৮। *স্বয়ম্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা হ্রাস করা (আমদানী বিকল্প শিল্পায়ন ঃ মাধ্যমিক পণ্য, সার, সিমেন্ট, ইস্পাত ইত্যাদি শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে) ;*

৯। *খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্যে কৃষির প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর ঘটানো ;*

১০। *জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রনের এক উচ্চাকাংখী কর্মসূচীর ভিত্তিমূলক কাজে হাত দেয়া ;*

১১। *উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি করা এবং সামাজিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মত খাতগুলোকে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ আবাসন ও পানি সরবরাহ ইত্যাদি) গুরুত্ব দেয়া ;*

১২। *সারা দেশব্যাপী সুষমভাবে আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা।*

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অত্যন্ত মহৎ ও সুদূরপ্রসারী ছিল এবং ওগুলো বাস্তবায়িত হলে প্রকৃতপক্ষেই আমাদের দেশ একটি স্বয়ম্ভর ও মর্যাদাশীল দেশে পরিণত হতো বলে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু একাত্তরের পরাজিত শক্তি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল অশুভ শক্তির নানামুখী অপতৎপড়তার কারণে এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া মাঝপথে বাঁধাগ্রস্থ হয়। যেসকল কারণে এ পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হতে পারে নি সেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১। *মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের অপুরনীয় ক্ষয়ক্ষতি (৩০ লক্ষ মানুষের আত্মাহুতি, রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট, রেল লাইন, নগর, বন্দর ইত্যাদি প্রায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় এবং কৃষি, শিল্প ও অবকাঠামোর মত খাতগুলো বিরান হয়ে যায়) ;*

২। *যাওয়ার (পরাজিত হওয়ার) মূহুর্তে পাকিস্তানীদের আখেরী লুণ্ঠন (আমাদের উড়োজাহাজ, সমুদ্রগামী জাহাজ–ট্যাংকার, বোট, গানবোট ইত্যাদি ; বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল ব্যাংকে রক্ষিত টাকা–পয়সা, সোনা–দানা সবকিছুই তারা নিয়ে যায়) ;*

৩। *স্বাধীনতার শত্রুদের ধ্বংসাত্মক তৎপড়তা (শিল্প কলকারখানায় আগুন দেয়া, নানাভাবে উৎপাদন কর্মকান্ডে বাঁধা দেয়া, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি) ;*

৪। *আন্তর্জাতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী–পুঁজিবাদী দেশসমূহের অসহযোগিতা (শর্তযুক্ত সাহায্যের প্রস্তাব যা বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রত্যাখ্যান করেন, ঋণ ও খাদ্য সাহায্য দিতে গড়িমশী করা (১৯৭৪), দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিগুলোকে মদদ দান ইত্যাদি) ;*

৫। *১৯৭৪ সালের ভয়াবহ বন্যা (বন্যার ফলে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়) ;*

৬। *জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি (১৯৭৩ সালের ইসরাইল–মিশর–সিরিয়ার যুদ্ধের ফলে তেলের মূল্য*

বৃদ্ধি পেতে শুরু করে ঃ ১৯৭৩ সালের ব্যারেল প্রতি এক ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৫ সালে পনের ডলার এবং ১৯৭৮ নাগাদ প্রায় কুড়ি ডলারে উঠে যায়) ;

৭। *১৯৭৫ সালের ১৫-ই আগষ্ট বঙ্গ বন্ধুকে সপরিবারে হত্যা (শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ব্যতীত অন্য সকলকে হত্যা করা হয় ; প্রতিষ্ঠা করা হয় সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী ক্রীড়নক সরকার ; অবশ্য প্রকৃত ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতেই থেকে যায় এবং পরবর্তীতে জেনারেল জিয়ার ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে যা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে) ;*

৮। *লক্ষ্যের পরিবর্তন (সামরিক শাসক জিয়া এক কলমের খোঁচায় সংবিধানের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য কেটে ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে বিসমিল-াহ এর প্রবর্তন করলেন এবং সমাজতন্ত্রের বদলে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিস্থাপন করলেন)।*

সামরিক একনায়ক জেনারেল জিয়া সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছেন দেশের পরিকল্পনা ব্যবস্থার। বঙ্গবন্ধুর সরকার স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে একটি মর্যাদাসম্পন্ন স্বাধীন পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেছিলেন এবং সেখানে দেশের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের স্থান করে দিয়েছিলেন। প্রফেসর নূরুল ইসলাম (ডেপুটি চেয়ারম্যান), প্রফেসর মুশাররফ হোসেন (সদস্য), প্রফেসর মোজাফফর আহমদ (সদস্য) ও প্রফেসর রেহমান সোবহান (সদস্য) এর মত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনে কাজ করেছেন এবং দেশের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। অথচ সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের কুপরামর্শে জেনারেল জিয়া পরিকল্পনা কমিশনের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে সেখানে আমলাদের রাজত্ব কায়েম করেন। মন্ত্রণালয়ের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয় পরিকল্পনা কমিশনকে। বিশেষজ্ঞরা বিশেষ করে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদরা বিতারিত হন সেখান থেকে। পরিকল্পনা কমিশন পরিণত হয় একটি অধঃস্তন মামুলি প্রতিষ্ঠানে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের পরবর্তী সকল পরিকল্পনাই মূলতঃ আমলাদের স্বার্থে এবং আমলাদের দ্বারা রচিত হয়েছে। অথচ প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল দেশের জন্যে, দেশের জনগণের জন্যে এবং দেশের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা। পরবর্তী পরিকল্পনাগুলোর ক্ষেত্রে আমরা অমনটা দেখতে পাই নি। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ; যেখানে বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগানোর একটা প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হলেও আমলাদের খবরদারীমুক্ত করা যায় নি পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে। আসলে পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারগুলো বিশেষ করে সামরিক, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সরকারগুলো বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফের মত সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলোর কুপরামর্শে এদেশ থেকে পরিকল্পনার নাম-গন্ধ মুছে ফেলার প্রকল্প হাতে নেয়। আর সেজন্যেই আমরা দখেতে পাই যে, ১৯৯১–৯৬ সময়ে বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হলেও তৎকালীন সরকার পরবর্তী পরিকল্পনা, অর্থাৎ পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করে নি। ফলে ১৯৯৬–৯৭ সময়টা বাংলাদেশ পরিকল্পনাহীন অবস্থায় চলেছে। ১৯৯৬ এর নির্বাচনে শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় এসে ১৯৯৭-২০০২ সময়ের জন্যে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করে। ২০০২ সালে এ পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হলেও বিএনপি-জামাতী সরকার পরবর্তী, অর্থাৎ ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করে নি। তারা আবার সাম্রাজ্যবাদীদের নীলনকসা অনুযায়ী ঘূর্ণায়মান (rolling) পরিকল্পনা, অংশীদারিত্বের পরিকল্পনা এবং সবশেষে পিআরএসপি ইত্যাদি বিভিন্ন চটকদারী ও অদ্ভূত সব কর্মসূচী রচনা করে চলেছে। দেশের অর্থনীতিতে বর্তমানে বিদ্যমান চরম নৈরাজ্যজনক অবস্থার জন্যে আমরা মনে করি পরিকল্পনাহীনতাই অনেকাংশে দ্বায়ী। আসলে অর্থনীতির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রকল্পের পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত

কম পক্ষে একটা মধ্য মেয়াদের সময়ের, অর্থাৎ পাঁচ বছরের সময়ের প্রয়োজন হয় (যেমন একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান, একটি সেতু নির্মান ইত্যাদি)। আর জাতির সম্মুখে কতগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা থাকলেই কেবল তা অর্জনের জন্যে প্রচেষ্টা নেয়া সম্ভব হয়। একমাত্র পঞ্চ বর্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই তা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। সেকারণেই চীন, ভারত ও মালয়েশিয়ার মত দেশগুলো তাদের অর্থনীতিতে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার ধারা বজায় রেখেছে এবং যা কিছু সংস্কার প্রয়োজন তা তারা পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায়ই করেছে। ভারত তো সরাসরি পিআরএসপি করার ধারণা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে।

বর্তমানে বিএনপি-জামাতী জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, উপদেষ্টা, নেতা, উপ-নেতা, পাতিনেতা সবারই এক কথা বাংলাদেশ তাদের আমলে উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে। কিন্তু দেশের মানুষ দেখছেন ঃ সর্বত্রই উন্নয়নে ভাটা; সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী, ক্রস ফায়ার ও এনকাউন্টারে হত্যা, ক্লীনহার্ট অপারেশনে হত্যা, খুন-খারাবি, রাহাজানি, দখল, জবর-দখল, দুর্নীতি ও দুঃশাসনে দেশ ডুবছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর সমস্যা তো মানুষকে পাগল করে দিয়েছে। এ সবে জর্জড়িত মানুষ এখন বিদ্রোহী হয়ে উঠছে ঃ কানশাট ও শনির আখড়ার ঘটনা এরই সর্বশেষ উদাহরণ। দেশের তথা জনগণের সমস্যা নিয়ে সরকারের কোনও মাথাব্যাথা নেই। সংসদে এগুলো নিয়ে সরকার নিজেও আলোচনা করে না, বিরোধী দলগুলোকেও আলোচনা করতে দেয় না। আর জাতীয়তাবাদী সরকারের অর্থমন্ত্রী তো তথ্য ইঞ্জিনিয়ারিং এ ওস্তাদ। পরিসংখ্যান ব্যুরোকে তিনি তার কাছে নিয়ে নিয়েছেন এবং ইচ্ছে মত তথ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করছেন। শেখ হাসিনার আমলের তথ্যকে কমিয়ে দেখাচ্ছেন এবং তাদের (বিএনপি–জামাতী সরকারের) তথ্য বাড়িয়ে দেখাচ্ছেন। দেশের এবং বিদেশের জাতীয়তাবাদী হোক আর বিজাতীয়তাবাদীই হোক কেহই বর্তমান সরকারের তথ্যে বিশ্বাস করছে না। এমন কি বিশ্ব ব্যাংক, এডিবির মত সংস্থার হিসেবের সাথে বর্তমান অর্থমন্ত্রীর প্রবৃদ্ধির হিসেব মিলছে না। এত কিছুর পরেও দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান ও অতীতের বিএনপি সরকারগুলোর প্রবৃদ্ধির চিত্র আওয়ামী লীগ সরকারগুলোর প্রবৃদ্ধির চিত্রের তুলনায় অনেকটাই মলিন। সামরিক ও এরশাদ সরকারের প্রবৃদ্ধির চিত্র আরই খারাপ (সারণী – ৯)। সারণী–৯ এ উপস্থাপিত তথ্য বলছে যে, চরম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার বেশ সন্তোজনক ছিল–৪.০০%। অন্যদিকে পরবর্তি তিনটি পরিকল্পানয়–একটি দু'বছর মেয়াদী ও দু'টি

সারণী ৯ : বাংলাদেশের পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের চিত্র, ১৯৭৩ – ২০০২ সময়ে

পরিকল্পনাসমূহ	প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা, %	অর্জন, %
১	২	৩
১। প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ঃ ১৯৭৩ – ১৯৭৮	৫.৫০	৪.০০
২। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা ঃ ১৯৭৮ – ১৯৮০	৫.৬০	৩.৫০
৩। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ঃ ১৯৮০ – ১৯৮৫	৫.৪০	৩.৮০
৪। তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ঃ ১৯৮৫ – ১৯৯০	৫.৪০	৩.৮০
৫। চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ঃ ১৯৯০ – ১৯৯৫	৫.০০	৪.১৫
৬। পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ঃ ১৯৯৭ – ২০০২	৭.০০	৫.২১

উৎসঃ ১, পৃঃ ২৪৩ এর ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধি ছিল অত্যন্ত অসন্তোষজনক ঃ ৪.০০% এর নীচে, যথাক্রমে ৩.৫০%, ৩.৮০% ও ৩.৮০% । চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় এসে প্রবৃদ্ধির হার প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যায়ে উন্নীত হলেও সন্তোষজনক বলা যায় না কোনও বিবেচনায় (বিএনপি ক্ষমতায় ছিল তখন) । পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় এসে দেখা যাচ্ছে যে, প্রবৃদ্ধির হার জাতীয়তাবাদী হিসেবেও পূর্ববর্তী সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে, অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি ৫.২১% এ উন্নীত হয় (আওয়ামী লীগ সরকারের হিসেবে ৬.০% এর বেশী) ।

সারণী ১০ : সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশের তিনটি সরকারের আমলে সরকারী বিনিয়োগের চিত্র, ১৯৯১ – ২০০২ সময়ে

সরকারী বিনিয়োগ	সরকার		
	খালেদা	হাসিনা	খালেদা – নিজামী
	১৯৯১ – ১৯৯৬	১৯৯৬ – ২০০১	২০০১ – ২০০৫
১ ২	৩	৪	
মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অংশ, %	৬.৬৪	৬.৯৪	৬.১৮

উৎসঃ ২, পৃঃ ২২২ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত ।

সারণী ১১ : বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের তিনটি সরকারের গড় প্রকল্প সাহায্য ব্যয়ের চিত্র, ১৯৯১ – ২০০৫ সময়ে

প্রকল্প সাহায্য	সরকার		
	খালেদা	হাসিনা	খালেদা – নিজামী
	১৯৯১ – ১৯৯৬	১৯৯৬ – ২০০১	২০০১ – ২০০৫
১	২	৩	৪
মোট ব্যয়ের অংশ, %	৮৯.৪	৯১.২	৭৮.৪

উৎসঃ ২, পৃঃ ২৩৫ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত ।

২০০৩ সাল থেকে সরকার পিআরএসপি বাস্তবায়ন শুরু করে (২০০২ সালে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয়) । ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত সরকারী তথ্যেই দেখা যাচ্ছে যে, সরকারী বিনিয়োগ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বর্তমান জোট সরকার পূর্ববর্তী হাসিনা সরকারের অনুরূপ তথ্য থেকে অনেকটাই পিছিয়ে আছে (সারণী – ১০, সারণী – ১১ ও সারণী – ১২) । সারণী – ১০ এর তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, খালেদা–নিজামী জোট সরকারের আমলে ২০০১–২০০৫ সময়ে গড়ে সরকারী বিনিয়োগের অংশ ছিল মাত্র ৬.১৮% (মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অংশ হিসেবে) যা খালেদা জিয়ার পূর্ববর্তী শাসনামলের (১৯৯১–১৯৯৬) চেয়েও কম (৬.৬৪%) । আর শেখ হাসিনার আমলে (১৯৯৬–২০০১) অনুরূপ অংকটি ছিল ৬.৯৪% (প্রায় ৭.০%) । প্রকল্প বাস্তবায়নেও জোট সরকার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে । ২০০১–২০০৫ (জোট

সারণী ১২ : বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের তিনটি সরকারের আমলে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের গড় প্রবৃদ্ধির চিত্র, ১৯৯১ – ২০০৫ সময়ে %

খাতসমূহ	সরকার		
	খালেদা	হাসিনা	খালেদা – নিজামী
	১৯৯১ – ১৯৯৬	১৯৯৬ – ২০০১	২০০১ – ২০০৫
১	২	৩	৪
১। কৃষি	০.৪৪	৪.৫৮	১.৬৭
২। মৎস্য	৭.৭৬	৬.১৮	২.৯২
৩। শিল্প	৮.২১	৫.৬৪	৬.৯৪
৪। খুচরা ব্যবসা	৫.৩৪	৬.৩৪	৬.৫২
৫। যোগাযোগ	৪.১০	৬.২১	৬.২৬
৬। নির্মাণ	৭.৮৫	৮.০৩	৮.৪১
মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন	৪.৬৪	৫.৩৪	৫.০৮

উৎসঃ ২, পৃঃ ২২৫ এর ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

সরকারের আমলে) সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের গড় হার ছিল ৭৮.৪%, ১৯৯১–১৯৯৬ (খালেদার আমলে) ছিল ৮৯.৪%, আর ১৯৯৬–২০০১ (শেখ হাসিনার আমলে) সময়ে ছিল ৯১.২%। ২০০৫–২০০৬ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়নের হার আরও হ্রাস পেয়েছে (৭০.০% এরও কম)। অপরদিকে সারণী – ১২ এর তথ্য থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অন্যান্য খাতগুলোর গড় প্রবৃদ্ধি হাসিনা আমলের কাছাকাছি থাকলেও কৃষি ও মৎস্য খাতের প্রবৃদ্ধি সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। খালেদা–নিজামী আমলে কৃষির গড় প্রবৃদ্ধি মাত্র ১.৬৭% এ এসে ঠেকেছে, যা হাসিনার আমলে প্রায় তিন গুণ বেশী ছিল (৪.৫৮%)। অবশ্য খালেদার পূর্ববর্তী আমলে (১৯৯১–১৯৯৬) তা আরও কম ছিল মাত্র ০.৪৪%। মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে খালেদা ও হাসিনার আমলের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ২.৯২% ও ৬.১৮%। ২০০৫–২০০৬ এ এসে অবস্থার যে আরও অবনতি হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বর্তমান জোট সরকারের চরম দুঃশাসনে দেশ আজ ধ্বংসের শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছে। সংকট নেই এমন কোনও ক্ষেত্র আজ আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা মনে করি সরকার সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও সংস্থাগুলোর কুপরামর্শ মোতাবেক পরিকল্পনাহীন অবস্থায় চলতে গিয়েই এরকম একটা লেজে-গোবরে অবস্থার জন্ম দিয়েছে যা আমাদের দেশের প্রাপ্য ছিল না। অতএব, আমরা বিশ্বাস করি যে, পি.আর.এস.পি কখনই পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার বিকল্প হতে পারে না। টেকসইভাবে দারিদ্র্য নির্মূল করতে হলে পরিকল্পনার কাছেই যেতে হবে।

সুপারিশমালা

তথাকথিত প্রবৃদ্ধি এবং তার উচ্ছিষ্ট বিতরণ নয়, আমরা চাই টেকসইভাবে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান। আর তা করতে হলে আমাদের মতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী ঃ

১. পিআরএসপি নয়, পরিকল্পনায় ফিরে যেতে হবে ঃ পঞ্চ বার্ষিক ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনায়। মনে রাখতে হবে দারিদ্র্য একটি বহু মাত্রিক জটিল সমস্যা ঃ এর সাথে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক (demographic), অর্থনৈতিক (economic), সামাজিক (social), সাংস্কৃতিক (cultural) ইত্যাদি উপাদানের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। কাজেই সমস্যার মূলে হাত দিতে হবে। আর সেজন্যে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী (১০ – ২০ – ৫০ – ১০০ বছর), মধ্যমেয়াদী (৫ – ১০ বছর) ও স্বল্প মেয়াদী (১ – ৫ বছর) সুসমন্বিত পরিকল্পনার যার থাকবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য – দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

২. সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার দিতে হবে। ভূমি ও জলাশয়সহ যাবতীয় জাতীয় সম্পদে দরিদ্রদের তথা জনগণের মালিকানা কায়েম করা ব্যতীত বাংলাদেশের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলে আমরা মনে করি। জরুরী ভিত্তিতে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে সরকারী খাশ জমি দরিদ্রদের মধ্যে বন্টনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে রক্ষক ভক্ষক হলে চলবে না। দেখা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু খাশ জমি বন্টন করা হলেও প্রকৃত দরিদ্ররা তা পায় নি, অথবা পেলেও পরবর্তীতে প্রভাবশালীরা তা জবরদখল করে নিয়েছে। সুতরাং দরিদ্ররা যাতে বন্টনকৃত জমির দখল পায় ও তা ব্যবহার করতে পারে তার নিশ্চয়তা সরকারকেই দিতে হবে। জলমহল (নদী, বিল, হাওর-বাওর, সাগর ইত্যাদি) ও বনাঞ্চলের ক্ষেত্রেও দরিদ্রদের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যক। বর্তমানে প্রভাবশালীরাই এগুলো ভোগ করছে নিজের নাম করে এবং সরকার বঞ্চিত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ঃ খাশ জমি, জলমহল ও বনাঞ্চলের ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতি প্রয়োগ করে দরিদ্রদের সংগঠিত করা যেতে পারে এবং সরকার সর্বোতভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা দিলে এভাবে ওগুলোর অর্থনৈতিক ব্যবহার যেমন নিশ্চিত হবে, ঠিক তেমনিভাবে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান ও জীবন-জীবিকার সংস্থান সম্ভব হবে।

৩. দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। শেখ হাসিনার সরকারের আমলে স্থানীয় সরকারের কাঠামো (চার স্তর বিশিষ্ট) সংক্রান্ত যে আইন পাশ হয়েছিল তার আলোকে নিয়মিত নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে এ আইনের আংশিক বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি (উপজেলা নির্বাচন আদৌ হয়নি)। উপরন্তু গ্রাম সরকারের মত এক দানবীয় (অনির্বাচিত) দলীয় ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের সুন্দর গ্রামগুলোর উপর। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, হাইকোর্ট এ ব্যবস্থাকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিয়েছে; অথচ সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিলের নামে একে ঝুলিয়ে রেখেছে অদ্যাবধি। আমাদের কথা হচ্ছে ঃ ছল-চাতুরী করে লাভ নেই; দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন ব্যতীত দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়া অসম্ভব। অতএব, স্থানীয় সরকারের সর্ব স্তরে দরিদ্রদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. দেশের বাজেট ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। বাজেট হতে হবে দরিদ্রবান্ধব। পিআরএসপি করা হয়েছে; অথচ বাজেট করা হচ্ছে বিত্তবান ও শাসক গোষ্ঠির স্বার্থে। সরকারের রাজস্ব আয়ের

৮০% এরও বেশী আসছে পরোক্ষ কর থেকে যার বোঝাটা শেষ পর্যন্ত দরিদ্রদেরকেই বহন করতে হচ্ছে। আয়কর ও কর্পোরেট কর থেকে সরকার মাত্র ১৫% এর মত আয় করছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ী – শিল্পোদ্যোক্তাদের সরকার কর অবকাশ সুবিধাসহ হাজার হাজার কোটি টাকার নগদ সুবিধা দিয়ে আসছে। বিষয়টি এমন পর্যায়ে গেছে যে, ব্যবসায়ীরা এখন বিদ্যমান ৫% এর স্থলে ১৫% নগদ সহায়তা চাচ্ছে। সবচেয়ে আতঙ্কের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বিএনপি–জামাত জোট সরকারের বিগত পৌনে পাঁচ বছরের শাসনামলে চাঁদাবাজি ও সিন্ডিকেট ব্যবসা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, দেশবাসী আজ তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষেই জিম্মি হয়ে পড়েছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ আবুল বারকাত তার এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, বিগত সাড়ে চার বছরে সিন্ডিকেট চক্র বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ২ লাখ ৮৬ হাজার ১১০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে (১৫, ২০ ঃ ০৬ ঃ ০৬)। তাছাড়া সরকারী খাশ জমি, বনাঞ্চল, জলাশয় ও রেলের জমিসহ সরকারী সকল প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি মন্ত্রী, এমপিসহ সরকারী দলগুলোর গুন্ডা-মাস্তানরা দখল, জবর-দখল করছে, ভোগ করছে। অথচ সরকারের বাজেটে এ সম্পর্কে কোনও বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কি দাঁড়াল? সরকার বাজেটের মাধ্যমে দরিদ্রদের কাছ থেকে টাকা (কর আকারে) নিয়ে ধনীদের মধ্যে বিভিন্ন সুবিধা দেয়ার নামে বন্টন করে দিচ্ছে। আর কৃত্রিমভাবে (চাঁদাবাজি ও সিন্ডিকেট ব্যবসার মাধ্যমে) জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়ে দরিদ্র মানুষের সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে। তাছাড়া সরকারী সম্পত্তি (যা আসলে গরীবের হক) লুন্ঠনের মাধ্যমে সরকারদলীয়রা দরিদ্র মানুষের হক নষ্ট করছে, তাদেরকে বঞ্চিত করছে। বাজেট ব্যবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে দুর্নীতির ব্যাপারে নিরবতা পালন। কোন কোন বাজেটে দুর্নীতির স্বীকৃতি থাকলেও অর্থমন্ত্রীকে এরকম বলতে শোনা গেছে যে, "উন্নত দেশেও দুর্নীতি হয় ; অতএব আমাদের দেশেও হবে, তাতে দোষের বা আশ্চর্যের কিছু নেই"। আর দুর্নীতি দমন কমিশনের নামে যে ধ্বজভঙ্গ কমিশন গঠন করা হয়েছে তাকে দুর্নীতি দমনের নামে বাহাস বললেও কম বলা হবে বলে আমরা মনে করি। সুতরাং আমাদের কথা হচ্ছে এই যে, বাজেটের এ গরীব-বিদ্বেষী দিকগুলোকে উল্টোদিকে ঢেলে সাজাতে হবে। ভারত ও চীন পারলে আমরা পারবো না কেন? ধনীরা কর দেবে, দরিদ্ররা পাবে, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি থাকবে না। এ বিষয়গুলো সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে দারিদ্র্য উচ্ছেদ শুধুই ফাঁকা বুলি হয়ে থেকে যাবে।

৫. দরিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। কে না জানে যে, রেল ও নৌ পরিবহণ হচ্ছে সবচেয়ে দরিদ্রবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থা। অথচ আমাদের দেশে এ দু'টি পথই সবচেয়ে অবহেলিত রয়ে গেছে। স্বাধীনতার পয়ত্রিশ বছরে প্রায় ৯ হাজার কিলোমিটার নৌ পথ এখন প্রায় ৩ হাজার কিলোমিটারে এসে ঠেকেছে; আর প্রায় ২,৮০০ কিলোমিটার রেল পথ মাত্র ২,৬০০ (প্রায়) কিলোমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে (১৩)। পক্ষান্তরে প্রায় আড়াই লক্ষ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এতে দেশের অতি মূল্যবান হাজার হাজার হেক্টর আবাদী জমি নষ্ট হয়েছে এবং অসংখ্য দরিদ্র মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে (তাদের জমিও গেছে এবং জমির মূল্যও তারা পায়নি)। তদুপরি মানসম্পন্ন রাস্তা না হওয়ায় প্রতিবছর মেরামতির নামে হাজার হাজার কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে। আর সড়ক পথে মানুষের উপকারের যে ফিরিস্তি দেয়া হচ্ছে তার চেয়ে রেল ও নৌ পথের বিকাশ ঘটালে হাজার গুণে বেশী উপকৃত হতো এদেশের দরিদ্র মানুষরা। কারণ

এ দু'টো পথেই অনেক কম খরচে মানুষ যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণ করতে পারতো। অতএব, দারিদ্র্য উচ্ছেদ করতে হলে এ দু'টো পথের দিকে জরুরী ভিত্তিতে বিশেষ নজর দিতে হবে।

৬. মানব দারিদ্র্য দূরীকরণে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরেও দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ অক্ষরজ্ঞানহীন। এত বিপুল সংখ্যক মূর্খ মানুষ নিয়ে দারিদ্র্য উচ্ছেদের চিন্তা করা অনেকটা উজানে নৌকা চালানোর মতই মনে হয়। আর শিক্ষার নামে আমাদের দেশে চলছে আসলে ব্যবসা। দেশপ্রেম ও বাস্তবতা বিবর্জিত চলমান শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের মানুষকে করছে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ঃ শিক্ষা খাতকে এ অবস্থা থেকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে ; এখাতের বরাদ্দ বর্তমানের কয়েক গুণ বাড়াতে হবে ; বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে ; স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার এক ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে হবে ; শিক্ষকদের জন্যে আলাদা ও উচ্চতর বেতন কাঠামোর প্রবর্তন করতে হবে এবং সাথে সাথে টিউশনি ও নোট ব্যবসা নিষিদ্ধ করতে হবে ; পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত পারলে আমরা পারবো না কেন? মনে রাখতে হবে শিক্ষক সমাজকে অভূক্ত রেখে আর যা-ই হোক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাও হবে না, শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্যও দূর করা যাবে না। মানসম্পন্ন শিক্ষা তো কল্পনাই থেকে যাবে।

৭. মানব দারিদ্র্য উচ্ছেদে স্বাস্থ্য সেবার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকার যদিও বলে বেড়াচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রায় একশো ভাগ মানুষ নিরাপদ পানীয় জল পাচ্ছে, সংবাদ মাধ্যমে আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি যে, খোদ রাজধানী ঢাকার অধিকাংশ মানুষ পানি পাচ্ছে না, কিংবা পেলেও তা অত্যন্ত দূঃষিত। আর একথা তো সবার জানা যে, আমাদের দেশের প্রায় তিন চতুথাংশ এলাকার ভূগর্ভস্থ পানি আর্সেনিক দূষণে দূঃষিত। জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ উপদেষ্টা প্রফেসর জেফ্রী সেক্সের মতে, বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ বিষাক্ত আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করছে (১১, পৃঃ ১৯)। আমাদের দেশে স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু বাৎসরিক ব্যয় পাঁচ ডলারেরও কম। এর সাথে যদি চুরি, আত্মসাৎ ও দুর্নীতির ব্যাপারটি যুক্ত করা যায় তাহলে সহজেই বোধগম্য যে, দরিদ্র মানুষরা আসলেই স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিতই থাকছে। ক্লিনিক আছে, তো ডাক্তার নেই। এরকম অবস্থায় গরীব মানুষ চিকিৎসা পাবে কিভাবে? আমরা মনে করি এ খাতে বরাদ্দ যেমন বাড়াতে হবে, ঠিক তেমনিভাবে বরাদ্দকৃত অর্থ যেন যথাযথভাবে ব্যয় হয় এবং দরিদ্র মানুষ সেবা পায় তার নিশ্চয়তা সরকারকেই বিধান করতে হবে।

৮. দারিদ্র্য দূরীকরণে বিদ্যুতের ভূমিকা অপরিসীম। অথচ এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমাদের দেশের প্রায় ৭০% মানুষ এখনও বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। প্রফেসর জেফ্রী সেক্সের মতে, যেদেশের বেশীর ভাগ মানুষ এখনও জ্বালানীর জন্যে গোবর ও কাঠের উপর নির্ভরশীল, সেদেশে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের আশা অত্যন্ত ক্ষীণ (১১, পৃঃ ১৯)। বিদ্যুৎ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠী। অথচ এক্ষেত্রে বর্তমান বিএনপি-জামাত জোট সরকারের ব্যর্থতা গগণচুম্বী। শেখ হাসিনার সরকারের আমলে যেখানে ৪০০০ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতো, এখন সেখানে উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ৩,০০০ মেগাওয়াটের মত। অথচ দেশের চাহিদা ৫০০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে যে, বিগত পৌনে পাঁচ বছরেও সরকার নতুন কোনও বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি। দেখা যাচ্ছে যে, জোট সরকার তাদের অতীত ইতিহাস থেকে মোটেও

শিক্ষা নেয় নি। ১৯৯৬ সালেও খালেদা জিয়া ক্ষমতা ছাড়ার সময় এক বিশৃংখল ও ভঙ্গুর বিদ্যুৎ খাত রেখে গিয়েছিল – মাত্র ১৬০০ মেগাওয়াট ছিল উৎপাদন ক্ষমতা, আর চাহিদা ছিল প্রায় ৩০০০ মেগাওয়াট। আমরা মনে করি বিদ্যুৎ খাতের সমস্যা সমাধানে দ্রুত এবং বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ খাতে বরাদ্দ যেমন বাড়াতে হবে, ঠিক তেমনিভাবে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রচেষ্টাও নেয়া প্রয়োজন। কারণ তা না হলে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পুরণ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে শেখ হাসিনার সরকার অনেকখানি এগিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় এসে এ ব্যাপারে আর আগায়নি বলেই মনে হচ্ছে।

৯. সর্বোপরি দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সুশাসনের কোনও বিকল্প নেই। সরকার যদি অগ্রাধিকার নির্ধারণে ব্যর্থ হয় ; সরকার যদি অপচয় ও দুর্নীতি রোধে ব্যর্থ হয় ; সরকার যদি আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আস্থাশীল না হয় ; তাহলে সেরকম কোন সরকারের পক্ষে দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান জোট সরকার সুশাসনের সকল সূচকে ব্যর্থতার ছাপ একে দিয়েছে। ষাটোর্ধের এক বিশাল মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে এ সরকার যাত্রা শুরু করে। উপদেষ্টা ও সমমর্যাদার কর্মকর্তাদের নিয়ে তা ইতোমধ্যেই আশির কাছাকাছি পৌছে গেছে। মাত্র ১ লক্ষ ৪৭ হাজার বর্গ কিলোমিটারের দেশ শাসন করতে কি এত মন্ত্রী–উপদেষ্টার দরকার আছে? কি গগণচুম্বী অপচয়। আর দুর্নীতিতে তো সরকার পর পর চারবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের গৌরব অর্জন করেছে। সরকার উপজেলা নির্বাচন তো করেই নি, উপরন্তু গ্রাম সরকারের মত দৈত্য চাপিয়ে দিয়ে দুঃশাসনের হাত তৃণমূল পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস (কোবরা, চিতা, র‍্যাব, সেনাবাহিনী ও পুলিশের মত বাহিনী দিয়ে বিনা বিচারে হত্যা ও নির্যাতন), সন্ত্রাসী ও জঙ্গী উত্থানে মদদদান (জেএমবি, হরকাতুল, বাংলাভাই ইত্যাদি) এবং আইন ও সংবিধান পরিপন্থী কর্মকান্ডে এ সরকারের রেকর্ড কোনও দিন কোন সরকার ভঙ্গ করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। মোটকথা সরকার তার কর্মকান্ডের দ্বারা সংকট সৃষ্টি করে নি এমন কোনও খাত খুঁজে পাওয়া যাবে না। সর্বশেষ সরকার আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাত তৈরী পোষাক শিল্পকে সংকটে ফেলে দিয়েছে। এতকিছুর পরও সরকার ক্ষমতা আকড়ে থাকতে চাইছে এবং আগামী নির্বাচনেও ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্যে জনগনের কাছে যাওয়ার পরিবর্তে নানা ধরনের কুটকৌশলের আশ্রয় নিতে শুরু করেছে – ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর পদ্ধতি খুঁজছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে সরকার পাশ্ববর্তী দেশ নেপাল ও থাইল্যান্ডের সাম্প্রতিককালের ঘটনাবলী থেকেও কোনও শিক্ষা নিচ্ছে না। আমরা মনে করি সরকারের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় হবে এবং ক্ষমতা ত্যাগ করে একটি স্বচ্ছ, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের পথ সুগম করে দেবে। এতে করে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ কন্টকমুক্ত হবে যা দেশকে অবশ্যই দারিদ্র্যমুক্ত করতে সাহায্য

করবে।

উপসংহার

বিএনপি–জামাত জোট সরকারের অপরিণামদর্শী সব সিদ্ধান্ত ও কর্মকান্ডের ফলে দেশ আজ এক মহাসংকটে নিপতিত হয়েছে। তারপরও সরকার ঘুম পাড়ানী ছড়ার মত উন্নয়নের জোয়ার আর প্রবৃদ্ধির গল্প শোনাচ্ছে জাতিকে। পরিস্থিতির উন্নতিতে সরকারের কোনও উদ্দ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এমতাবস্থায়, পিআরএসপির লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন করা সম্ভব হবে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, দারিদ্র্য নিরসনে সরকারের অতীতের সকল উদ্দ্যোগের মত পিআরএসপিও একটি ব্যর্থ প্রয়াস হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে দারিদ্র্য দূর হবে – এ তত্ত্বে বিশ্বাসী দেশগুলোর অবস্থা বাংলাদেশের চেয়ে ভাল হতে পারে না। বাংলাদেশে বিগত প্রায় সাড়ে তিন দশকে ৪% থেকে ৫% হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, অথচ দারিদ্র্য তেমন একটা কমে নি। এখনও আমাদের দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্য পরিস্থিতির শিকার এবং প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ চরম দারিদ্র্যের শিকার। অথচ ভারতে প্রবৃদ্দি ৭.০% ছাড়িয়ে গেছে এবং এখনও প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। অপরদিকে চীনে গত প্রায় তিন দশকে প্রবৃদ্দি ১০% এর উপরে ছিল এবং দরিদ্র মানুষের অনুপাত বর্তমানে ১০% এর নীচে নেমে গেছে। চীন নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতি চালু করে বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষ দিকে। কিন্তু সেখানে সমাজতান্ত্রিক খাত এককভাবে এখনও বৃহত্তম খাত হিসেবে (নিয়ামকী খাত) বিদ্যমান আছে। সংস্কারের ফলে সমাজে আয় বৈষম্য বেড়েছে (গিনি সহগ ০.৩৪), কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। সরকার তার আর্থিক ও সামাজিক নীতির মাধ্যমে এ সমস্যা যথাযথভাবে মোকাবেলা করছে। আর সেকারণেই চীন দারিদ্র্য পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ২০১০ সাল নাগাদ আশা করা হচ্ছে চীন দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে আবির্ভূত হবে। ভারতও সুশাসন ও সরকারের সচেতন পদক্ষেপের মাধ্যমে দরিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। মনে রাখতে হবে উপরোক্ত দেশ দু'টোর সরকারের অত্যন্ত সচেতন ও পরিকল্পিত ভূমিকার কারনেই এ ক্ষেত্রে তারা সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। অথচ বাংলাদেশে পঁচাত্তর পরবর্তী সময় থেকে মুক্ত বাজারের নামে (ব্যক্তিগত খাত, বিরাষ্ট্রীয়করণ ইত্যাদি) গোটা দেশের অর্থনীতিকে তছনছ করে দেয়া হয়েছে। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও পূর্ণ করেছে বর্তমান জোট সরকার ঃ পরিকল্পনাকে বাদ দিয়ে পুঁজিবাদী বটিকা পিআরএসপি গ্রহণ করেছে, যাকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ নতুন প্যাকেটে পুরাতন ঔষধ বলে আখ্যায়ীত করেছেন (১২, পৃঃ ১১১)। আমরাও মনে করি পুঁজিবাদী দাওয়াই দিয়ে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন কুসংস্কারমুক্ত, পরিকল্পিত ও সচেতন

সরকারী উদ্দ্যোগ ।

পরিশিষ্ট ১

জাতিসংঘের সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এমডিজি) ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ, জাতিসংঘ, সেপ্টেম্বর ২০০০

(১৯৯০ – ২০১৫ সময়ে)

লক্ষ্যসমূহ	লক্ষ্যমাত্রাসমূহ
১	২
১। চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা নির্মূল করা ;	১। প্রতিদিন এক ডলারের কম আয়ে জীবনযাপনকারী মানুষের অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা ;
	২। ক্ষুধাপীড়িত মানুষের অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা ;
২। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করা ;	৩। সকল বালক–বালিকার প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ কোর্স সম্পূর্ণকরণ নিশ্চিত করা ;
৩। লিঙ্গ সমতা প্রবর্তন করা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা ;	৪। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য পারতপক্ষে ২০০৫ সালের মধ্যে এবং সকল পর্যায়ে ২০১৫ সালের মধ্যে দূর করা ;
৪। শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা ;	৫। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যু হার দুই তৃতীয়াংশ হ্রাস করা
৫। মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করা ;	৬। মাতৃ মৃত্যুর হার তিন চতুর্থাংশ হ্রাস করা ;
৬। এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ;	৭। এইচআইভি/এইডস এর বিস্তার রোধ করা এবংথামিয়ে দেয়া
	৮। ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা এবং থামিয়ে দেয়া
৭। টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা ;	৯। টেকসই উন্নয়নের নীতিমালাসমূহকে জাতীয় নীতি ও কর্মসূচীর অঙ্গীভূত করা এবং পরিবেশগত সম্পদের ধ্বংস রোধ করা ;
	১০। স্থায়ীভাবে নিরাপদ পানীয় জলের অধিকারবঞ্চিত মানুষের অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা ;
	১১। ২০২০ সাল নাগাদ কমপক্ষে ১০০ মিলিয়ন বস্তিবাসী মানুষের জীবন মানের যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটানো ;
৮। উন্নয়নের জন্যে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্বের বিকাশ ঘটানো।	১২। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নিয়মভিত্তিক, বাস্তবানুগ ও বৈষম্যহীন মুক্ত বানিজ্য এবং আর্থিক ব্যবস্থার আরও বিকাশ ঘটানো যার মধ্যে সুশাসন, উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসের অঙ্গীকার অন্তর্ভূক্ত থাকবে ;
	১৩। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দেয়া। এর মধ্যে রয়েছে ঃ তাদের রপ্তানী পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার ; অত্যন্ত ঋণগ্রস্থ দরিদ্র দেশসমূহের ঋণ মৌকুফ সুবিধা বৃদ্ধি ; আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক ঋণ বাতিল করা এবং আরও উদারহস্তে দারিদ্র্য হ্রাসে নিবেদিত দেশসমূহকে আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সাহায্য প্রদান।
	১৪। ভূ-বেষ্টিত ও ক্ষুদ্র দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের বিশেষ প্রয়োজনের দিকে নজর দেয়া ;
	১৫। দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ যাতে টেকসই হয় সেজন্যে জাতীয় ও আন্ত র্জাতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহের ঋণ সমস্যাসমূহ সুসমন্বিতভাবে মোকাবেলা করা ;
	১৬। উন্নয়নশীল দেশসমূহের সহযোগিতায় যুব সমাজের জন্যে যথোপযুক্ত এবং উৎপাদনশীল কাজ সৃষ্টি করা ;
	১৭। ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় উন্নয়নশীল দেশ সমূহের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সামগ্রী প্রাপ্তিযোগ্য করে তোলা
	১৮। ব্যক্তিগত খাতের সহযোগিতায় নতুন প্রযুক্তির বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুফল প্রাপ্তিযোগ্য করে তোলা।

উৎসঃ ৪ এর ভিত্তিতে অনুবাদকৃত ও প্রস্তুতকৃত।

গ্রন্থপঞ্জী

১. অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৬।

২. অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫।

৩. অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪।

৪. MDGs Website : UN Millennium Development Goals – < >

৫. Academy of Science, USSR : Economic Encyclopedia – Political Economy, Vol. 3, << Soviet Encyclopedia >>, in Russian, Moscow, 1979.

৬. Academy of Science, USSR : History of Socialist Economy of the USSR, Vols. 1 – 7, << Nauka >>, in Russian, Moscow, 1976 – 1980.

৭. Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh : Unlocking the Potential – National Strategy for Accelerated Poverty Reduction, October, 2005.

৮. পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯৭ – ২০০২, মার্চ, ১৯৯৮।

৯. Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh : The Second Five Year Plan of Bangladesh 1980 – 1985, May, 1980.

১০. Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh : The First Five Year Plan of Bangladesh 1973 – 1978, March, 1973.

১১. Ahmad Q.K. : Emerging Global Economic Order and the Developing Countries, Bangladesh Economic Association and the University Press Limited, Dhaka, 2005.

১২. Ahmad Q.K. : "Poverty Reduction Strategy Paper : Repackaging Old Medicine", বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০০৪, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা, পৃঃ ১১১ – ১১৮।

১৩. খান মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ঃ "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা", ০৮-১০ ডিসেম্বর ২০০৪ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পঞ্চদশ দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত।

১৪. বারকাত আঃ "বাংলাদেশে দারিদ্র উচ্ছেদ ও দারিদ্র হ্রাস ঃ উদ্বেগের বিষয়", বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০০৪, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা, পৃঃ ১০১ – ১০৯।

১৫. দৈনিক সংবাদ, ঢাকা।

১৬. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা।

১৭. The Independent, Dhaka.

In Search of a Self-Reliant Poverty Reduction Policy for Bangladesh

Md Abdul Wadud*

Abstract

This paper examines the question whether with a heavy burden of debt on its shoulder it is possible to embark on an effective and self-reliant programme of poverty alleviation for Bangladesh. This is done by looking into the dynamic debt burden of Bangladesh, comparing the debt service payments with poverty reduction funding and then confronting the question of ownership of the poverty reduction strategy, that is, whether it is internally or externally funded.

1. Introduction

Bangladesh had a total external debt outstanding of over 16 billion U.S. dollars in 2002 and paid nearly a billion dollar in debt service payments for this debt. Between 1978 and 2002, Bangladesh paid over 13.5 billion dollars, or nearly 95,000 crore taka, as debt service. With such heavy burden of debt on its shoulder is it possible to embark on an effective and self-reliant programme of poverty alleviation in our country? This paper examines this question by looking into the dynamic debt burden of Bangladesh, comparing the debt service payments with poverty reduction funding and then confronting the question of ownership of the poverty reduction strategy, that is, whether it is internally or externally funded. Since this paper is related to the Poverty Reduction Strategy, we also make some comments on the implementation of the programme.

The paper is organized as follows. Section 2 deals with external debt and debt-service payments of Bangladesh. The dynamic burden of debt is analysed and an estimate of burden is obtained in Section 3. Section 4 looks into the implementation of poverty reduction strategy. Section 5 examines poverty reduction strategy funding and debt burden. Section 6 deals with ownership of the PRS, while Section 7 contains the conclusion.

---

* Paper presented at the Regional Conference of the Bangladesh Economic Association held at Rajshahi University on July 15, 2006.

2. External Debt and Debt Service of Bangladesh

Bangladesh is a heavily debt-ridden country. Data on various aspects of external debt of Bangladesh are given in Table 1. Total external debt of Bangladesh which stood at 3,083 million U.S. dollars in 1978, rose to 5,651 million after five years in 1983. This trend continued and external debt outstanding amounted to 10,692 million in 1988. After another five years in 1993, the amount stood at 14,650 million. Then it fell to 14,033 million in 1998. By the year 2002, the figure rose to 16,276 million dollars.

Table 1 : External Debt and Debt Service of Bangladesh (1978-2002), million U.S. dollars

Year	Total debt	Debt service
1978	3,083	145.9
1979	3,282	237.2
1980	4,230	277.8
1981	4,663	226.5
1982	5,233	253.7
1983	5,651	217.4
1984	5,857	286.7
1985	6,870	355.2
1986	8,282	479.0
1987	10,149	546.8
1988	10,692	504.2
1989	11,118	522.5
1990	12,768	790.6
1991	13,482	629.8
1992	13,928	574.3
1993	14,650	567.8
1994	15,373	603.4
1995	16,767	811.7
1996	15,166	698.0
1997	15,025	704.6
1998	14,033	644.6
1999	14,843	781.4
2000	16,211	915.9
2001	15,074	838.8
2002	16,276	910.9

Source: World Bank, *World Development Indicators, 1999.*
Government of Bangladesh, *Bangladesh Economic Review 2003.*

Debt service payment stood at 145.9 million U.S. dollars in 1978 and it rose to 910.1 million in 2002. This means that Bangladesh paid about Tk 52,267 million taka in 2002 as debt service. This is a huge amounts.

3. Dynamic Burden of Debt

Dynamic debt burden can be viewed as a burden, which is likely to prevail in the foreseeable future. For estimating dynamic burden, Domar's famous debt burden model is used here. We first describe the model and then use real data to estimate the dynamic burden for Bangladesh.

3.1 Domar's Burden of Debt Model

Government pays interest charges on its debt. If it is assumed that this amount is paid from tax revenue then that can constitute a burden on the public. According to Domar (1944), the burden of public debt should be measured by the ratio of the additional tax and national income. Domar argued that if income grew then an absolute increase in tax might not inflict any hardship on the public. What matters is an increase in the tax-income ratio. Domar's debt model is succinctly described below. [1] This part is

If total public debt outstanding is denoted by $D(t)$, debt lag by *D(t), GDP by Y(t), then*

$$D'(t) = \alpha Y(t) \qquad (0 < \alpha < 1) \tag{1}$$

If the interest is assumed to be constant at rate *i,* then the interest induced tax $T(t)$ is proportional to the debt outstanding:

$$T(t) = iD(t) \tag{2}$$

Domar analysed the burden of public debt under alternative scenarios of income growth. Of these, the case of income growing at constant relative rate is considered in this paper. This is because this leads to a bounded estimate of debt burden.

If income grows at a constant relative rate β , then the following equation holds:

$$Y'(t) = \beta Y(t) \qquad (0 < \beta < 1) \tag{3}$$

---

[1] This part is based on an earlier work of one of the authors of this paper by Islam (2005). A more elaborate description of Domar's model is available in Chiang (1999).

The debt burden can now be written as follows:

$$B(t) = \frac{T(t)}{Y(t)} = i\frac{D(t)}{Y(t)}$$

To derive the debt burden, the time paths of *D(t)* and *Y(t)* should be found before.

One possible approach is to integrate (3) in order to get *Y(t)* and then to substitute this into (2) and solve the resulting first-order differential equation for *D(t)*. The problem can be treated as one of solving a second-order differential equation. By differentiating (2) with respect to *t* and utilizing (3) and (2) successively, the following equation can be obtained

$$D''(t) = \alpha Y'(t) = \alpha\beta Y(t) = \beta D'(t)$$

That is,

$$D''(t) - \beta D'(t) = 0 \qquad (4)$$

The general solution for the above equation is:

$$D(t) = A_1 e^{\beta t} + A_2$$

To definitize this, the initial values of *D* and *Y* are denoted as $D(0) = D_0$ and $Y(0) = Y_0$. Setting t = 0 in the general solution, it is found that

$$D(0) = A_1 + A_2 = D_0 \qquad (5)$$

By setting t = 0 in the derivative of the general solution, it is found that, $D(0) = A_1$. *Since equation (1) implies* $D(0) = \alpha Y(0) = \alpha Y_0$, *it follows that*

$$\beta A_1 = \alpha Y_0 \qquad (6)$$

Now if equations (5) and (6) are simultaneously solved, then

$$A_1 = \frac{\alpha}{\beta} Y_0 \quad \text{and} \quad A_2 = D_0 - \frac{\alpha}{\beta} Y_0$$

So the definite solution of (4) is in the form below:

$$D(t) = \frac{\alpha}{\beta} Y_{0e}^{\beta t} + D_0 - \frac{\alpha}{\beta} Y_0$$

This depicts the time path of the public debt.

The other time path is easier to find. If the initial condition is taken into consideration, it can be derived from equation (3) that

$$Y(t) = Ae^t$$

or,
$$Y(t) = Y_0 e^t$$

Now it is possible to write the debt burden function as follows:

$$B(t) = iD(t)/\ Y(t) = \{i(\alpha/\beta)Y0e^{\beta t} + iD0 + i\ (\alpha/\beta)\ Y0\ \}\ /\ Y0e^{\beta t}$$

What will happen to B(t) if government borrowings is to continue indefinitely at the indicated rate or what is the limit of B(t) as t becomes infinite can be evaluated with the help of the above equation. For this, each term on the right is multiplied by $e^{-\beta t}$, thereby transforming the burden function into the following:

$$B(t) = \{i(\alpha/\beta)Y0 + [\ iD0 - i\ (\alpha/\beta)\ Y0\ ]\ e^{-\beta t}\ \}\ /\ Y0$$

Since $e^{-\beta t}$ 0 as t , the second term in the numerator will tend to zero. Therefore, it can be concluded that,

$$\lim_{t\to\infty} B(t) = \frac{i(\alpha/\beta)Y_0}{Y_0} = \frac{i\alpha}{\beta} \qquad (7)$$

From the above equation, it is seen that, if income grows at a constant rate, the debt burden will not increase without bounds but will approach a finite limit, depending on the values of the parameters ,α, β and *i*.

3.2 An Estimate of Dynamic Debt Burden of Bangladesh[1]

In Domar's Dynamic Burden of Debt Model, equation (1) states that

$$D'(t) = \alpha Y(t) \qquad (0 < \alpha < 1)$$

Using the OLS method, the estimate of for Bangladesh is,

= 0.0139

Equation (2) states that if interest rate is a constant *i* so that the interest induced tax T(t) is proportional to the debt outstanding:

$$T(t) = iD(t)$$

Using OLS, the estimate of *i* for Bangladesh is,

i = 0.1737

Equation (3) states that if income grows at a constant relative rate, then the following equation holds:

$$Y'(t) = \beta Y(t) \qquad (0 < \beta < 1)$$

Using OLS, the estimate of for Bangladesh is,

= 0.0446

[1] The estimates were obtained by Islam (2005).

The dynamic debt burden is given by the following relationship

$$\lim_{t\to\infty} B(t) = \frac{i(\alpha/\beta)Y_0}{Y_0} = \frac{i\alpha}{\beta}$$

Putting the estimated values of ,α, β *and i*

Dynamic debt burden = 0.0024 / 0.0446
= 5.4%

This means that Bangladesh has to raise tax for repaying external debt to the tune of 5.4% of GDP. This estimate being dynamic and based on past values also implies that Bangladesh will have to live with this, or a rate close to it, in the foreseeable future.

4. Assessing the Performance of PRSP in fiscal Year 2006

In Table 2, PRSP macroeconomic targets and actual attainments are presented. Overall balance remained lower that the PRSP target, while government failed to implement the ADP target by 0.73 per cent of GDP. Average inflation was also higher for the period as it reached 7.04 per cent in contrast to PRSP target of 6.5 per cent. Gross domestic investment (24.97%), total revenue (10.78%) and tax revenue (8.69%) all fell short of PRSP targets by 0.03 per cent, 0.22 per cent and 0.31 per cent of GDP respectively. Borrowing from the banking sector was 0.28

Table 2 : Measuring Budget Performance with PRSP Targets

Macroeconomic Indicators	PRSP	Actual	Deviation
Real GDP Growth (per cent)	6.50	6.70	0.20
CPI Inflation (average)	6.50	7.04	0.54
Gross domestic Investment (% of GDP)	25.00	24.97	-0.03
Total revenue	11.00	10.78	-0.22
Tax	9.00	8.69	-0.31
Non-tax	2.00	2.09	0.09
Total expenditure (% of GDP)	15.50	14.67	-0.83
Current expenditure (% of GDP)	8.60	8.90	0.30
ADP (% of GDP)	5.90	5.17	-0.73
Other expenditure	1.00	0.60	-0.40
Overall balance	-4.50	-3.89	0.61
Domestic financing	2.00	1.96	-0.04
Foreign financing	2.50	1.93	-0.75

Source: Centre for Policy Dialogue (2006).

per cent higher than the PRSP targets. Higher current expenditure and interest payment with respect to PRSP target (0.30 and 0.11 per cent, respectively) put pressure on the balance of payments.

Target was achieved in terms of GDP growth rate. Targets were achieved in various degrees in non-tax revenue, financing (net) of budget deficit and domestic financing. Targets were not achieved in case of such important indicators as gross domestic investment, CPI inflation, total revenue collection including tax revenue, total public expenditure including ADP. Overall assessment shows that while GDP growth surpassed the PRSP targets, most of the other indicators failed to achieve them (CPD, 2006).

5. Poverty Reduction Strategy Funding and Debt Burden

We could not exactly determine the size of annual allocation the PRS. Bhuyan (2005) mentioned that in the FY06 budget, an allocation of 767 million dollars was made for targeted poverty reduction, social safety net, and employment generation programmes. This can be viewed as annual expenditure on the PRS. If we compare this amount with annual debt payment of nearly 950 million dollars, question definitely arises as to the justifiability of such a huge foreign aided programme. Will it not further raise our debt burden and make our poverty reduction effort self-defeating?

6. Ownership of the PRS

It is necessary to know who funds this programme and whether this makes us even more indebted. If in the process of reducing our poverty we end up being more debt ridden, will not then the programme be self-defeating? That PRS was not only completely funded by the donors, but also used as means to attract foreign loan was eloquently stated by Sobhan (2004: 157):

"The PRSP was, however, identified as the basis around which both the WB and IMF, through its PRGF, would channel aid to Third World governments. The GoB therefore embarked on the process of preparing its PRSP on the clear understanding that this was a *sine qua non* for securing program loan from both the WB and the IMF. It was far from clear that the GoB or any other government would have autonomously prepared a PRSP if this was not connected to the promise of sizeable aid flows not just from the WB and IMF but other DPs. Thus, as the Five Year Plans, in vogue in the 1960s and 1970s, were seen as indispensable for laying claim to aid funds, the PRSPs have become the document of choice of the DPs around which their aid will be disbursed in the days ahead."

So far from conclusively reducing poverty, it appears to us that PRSP could make the country more debt ridden and eventually more dependent on the donors.

7. Conclusion

So, we have failed in our search for a self-reliant poverty reduction policy and ended up with another grand programme based completely on foreign aid. With yearly debt service payment of around a billion dollar and total debt outstanding of around 17 billion, how justified is it to undertake a programme of poverty alleviation completely on foreign aid? Will it not accentuate debt service payment problem further, raise the already high level of total debt, and make us increasingly dependent on donors for our economic decision making?

Lest we be misunderstood and thought to be unsupportive of poverty alleviation programmes, we make it emphatically clear that not only do we support such policies but think that those should be an integral part of our economic agenda. Where we differ is that in order to be effective, a poverty alleviation programme ought to be self-reliant. Bangladesh's success in growth of the real sectors has been mostly the result of indigenous effort. If ever an indigenous poverty reduction policy is devised, not as grandiose as the present one fed by foreign aid but much smaller and based on our meager resources, that day we shall see real poverty alleviation, that day we shall have reasons to feel proud of.

References

Bhuyan, A. R. (2005), "Bangladesh Budget 2005-06: A Critical Appraisal", *Thoughts on Economics*,Vol. 15, No. 1 & 2, 29-50.

Centre for Policy Dialogue (2006), *An Analysis of the National Budget for FY2006-07*, Dhaka, Bangladesh.

Chiang, A.C. (1984), *Fundamental Methods of Mathematical Economics*, Tokyo: McGraw-Hill., Third Edition.

Domar, E.D. (1944), "The 'Burden of the Debt' and the National Income", *American Economic Review*, December, 798-827.

Government of Bangladesh (2003), *Bangladesh Economic Review 2003,* Ministry of Finance, Dhaka.

Government of Bangladesh (2005), *Unlocking the Potential: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction,* Planning Commission, Dhaka.

Islam, Q.B.T. (2005), "An Empirical Study on External Debt Burden of Bangladesh", *Thoughts on Economics,* Vol. 15, No. 1 & 2, January-June, 21-28.

Sobhan, R. (2004), "The Political Economy of Aid", in *Revisiting Foreign Aid,* University Press Limited, Dhaka.

World Bank (1999), *World Development Indicators 1999*, Washington., D.C.

Implementation of Poverty Reduction Strategies (PRS) in Bangladesh: Some Comments[1]

A.N.K.Noman*

Abstract

The article highlight some problems on the way to implementing poverty reduction strategies written in the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP). In this strategy paper, agriculture and rural development has rightly been given the highest priority for the poverty reduction efforts.But some of the realities which are not mentioned may seriously limit the efforts, for example, the recent reduction in soil sertility, the trade-off between household fuel price and supply of bio-mass (soil nutrients) and slowing down of agricultural productivity, problems of further expansion and intensification of existing irrigation approach etc. After a brief discussion of some of these matters some way outs are indicated in this article.

1. Introduction

Since the launch of the Millennium Development Goals (MDGs) at the Millennium Summit in New York in September 2000, the MDGs have become the most widely-accepted yardstick of development efforts by governments, donors and NGOs. The MDGs are a set of numerical and time-bound targets related to key achievements in human development. These include:

a) halving income-poverty and hunger;
b) achieving universal primary education and gender equality;
c) reducing infant and child mortality by two-thirds and maternal mortality by three-quarters;
d) reversing the spread of HIV/AIDS and other communicable diseases; and
e) halving the proportion of people without access to safe water.

---

[1] Paper presented at the regional seminar in the senate building, Rajshahi University on15 July 2006 arranged jointly by Bangladesh Economic Association and Department of Economics, Rajshahi University.

* Associate Professor, Dept. of Economics, University of Rajshahi. Tel: 0721-750041-4160(O),0721-773825 (R), cell: 01718 586556 e-mail:ank-noman@hotmail.com

These targets are to be achieved by 2015 from their levels in 1990 (United Nations 2000). Bangladesh like most other developing countries in the world, has committed herself to attaining the targets embodied in the Millennium Declaration by 2015.

To achieve these targets Bangladesh has prepared the IMF and World Bank sponsored Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) and has started implementing these strategies from the financial year 2005-2006. This process of implementation is a comprehensive one and will continue through successive budgets.

2. Poverty and the Poor in Bangladesh

Poverty refers to a situation where people are deprived of fundamental rights to lead a normal life. It also refers to poor access to fundamental rights, economic wealth, social wealth and cultural and environmental aspects of life. In social terms, the poor are those who must live below what most people in a particular time and place regard as the minimum acceptable standard. Poverty is a relative concept and in its true sense, it can not be compared internationally.

The concept of poverty is classified in two categories, income (Consumption) poverty (people live below a certain level of income, say, one dollar a day, World Bank definition) and Human Poverty (United Nations Development Program (UNDP) definition). UNDP defined Human Poverty in terms of a complex index (Human Poverty Index, HPI) of *life* (over 30% of people in the least developed countries are unlikely to live beyond 40 years of age), of *basic education* (as measured by the percentage of adults who are illiterate, with an emphasis on educational deprivations for girls), and of *overall economic provisioning* (measured by the percentage of percentage of people without access to health services and safe water plus the percentage of children under 5 who are underweight).

Using a complex formula Human Poverty Index is computed and the developing countries are ranked according to their level of human development. UNDP publishes this index in its annual Human Development Reports. Since the HPI value indicates the proportion of population adversely affected by the three key deprivations (survival, knowledge and economic provisions), a low HPI is good (i.e., a smaller percentage of the population is deprived), and a higher HPI is reflective of greater deprivation.

Poverty is widespread in most of the developing countries located mostly in Asia, Africa and Latin America. Based on their socio-economic characteristics, it could be generalised that the poor are disproportionately located in rural areas, that they are primarily engaged in agricultural and associated activities, that they are more likely to be women and children than adult males, and that they are often concentrated in minority ethnic groups and indigenous people. Poor people are also frequently seen in the slums of big metropolitan cities. Most of these urban poor are self employed and engaged in informal sectors of the economy.

2.1 Measurement of Poverty

The measurement of poverty is done in many different ways. Those interested in measuring the amount of poverty existing in a country usually begin by drawing a poverty line. This line is defined in terms of household income per capita. Households with per capita incomes below the poverty line are defined as poor while those with incomes above the line are not poor. Poverty is also measured in terms of daily per capita calorie intake. In Bangladesh, we consider calorie intake below 2122 kilo calorie per day as absolute poverty and calorie intake below 1805 kilo calorie per day as hard-core poverty (GOB 2005a). After counting the number of people below the poverty line, their percentage in total population is calculated. This measure is called Head-Count ratio. This is the most frequently used measure of poverty.

In measuring poverty, two different concepts are considered important. These are Absolute Poverty and hard-core Poverty.

Absolute Poverty: A situation where a population or a section of population is able to meet only a bare subsistence essentials of food, clothing and shelter to maintain minimum levels of living. In Bangladesh, 40.9 percent of total population is estimated as living in absolute poverty in 2004 (GOB, 2005).

Hard-core Poverty: A situation where a population or a certain section of population is not able to meet even the bare subsistence essentials of food, clothing and shelter. Hard-core poverty in Bangladesh is calculated as 18.7 percent in 2004.(GOB, 2005).

3. Development Plans and Issues of Poverty in Development Plans in Bangladesh

A development plan is a comprehensive document with a set of objectives and targets to be achieved through a predetermined strategy within a certain period of

time. These plans could be short-term, medium-term or long-term say for fifteen to twenty years. Economic development is basically the broad objective of a development plan though the technique of the plan formulation and implementation could be different.

Since the country's independence till the end of 2002 five Five Year plans and a two year plan were implemented. These are:

i) First Five Year Plan (1973-1978);
ii) Two Year Plan (1978-1980);
iii) Second Five Year Plan (1980-1985);
iv) Third Five Year Plan (1985-1990);
v) Fourth Five Year Plan (1990-1995); and
vi) Fifth Five Year Plan (1997-2002).

Poverty reduction was always a prime concern of all these plans and all of these plans were implemented through annual development programmes. After the completion of Fifth Five Year Plan, Bangladesh government has changed the policy of preparing Five Year plans. Instead of five year plan procedure, it has prepared Interim–PRSP first, and then the final version of the PRSP.

4. Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP)

In December 1999, the Executive Boards of the IMF and the World Bank approved a new policy instrument, the PRSP to serve as a common context for the Bank and the Fund interventions in low-income countries receiving concessional assistance. PRSPs are prepared by governments in low-income countries through a participatory process involving domestic stakeholders as well as external development partners, including the IMF and the World Bank. A PRSP describes the macroeconomic, structural and social policies and programs that a country will pursue over several years to promote broad-based growth and reduce poverty, as well as external financing needs and the associated source of funding (IMF 2005).

Starting with the 41 heavily indebted poor countries (HIPC), the PRSP will be applied to an additional 30 countries receiving financing from the IDA (World Bank's concessional loan window) or the IMF's Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF). As end of February 2005, the Fund Executive Board reviewed 44 full PRSPs, and an additional 14 countries completed preliminary, or "interim", PRSPs.

According to the Bank and the Fund, the central objective of a country's PRSP is to try to ensure that policy actions to increase growth and reduce poverty are integrated in a coherent macroeconomic framework after extensive consultations with national stakeholders. Additionally, this country-owned document seeks to identify policy targets and interventions that would allow a country to make progress towards the agreed 2015 International Development Goals.

In the process of preparation of the PRSP document in Bangladesh, the whole gamut of civil society members including economists, professionals, development activists, NGOs and community based organisations participated. On the one hand, the PRSP process initiated by the Bank and the Fund was termed as a tool to impose further reform agenda on the country in favour of promoting globalisation and privatisation. On the other hand, different groups of society raised multiple questions with regard to the formulation process and the ownership of the poverty reduction strategy document.

5. PRSP Process in Bangladesh

Bangladesh took its decision to prepare the PRSP in the Bangladesh Development Forum in 2000 and formed an inter-ministerial task force headed by the Secretary, Economic Relations Division, Ministry of Finance in the same year to prepare the PRSP. The time frame set to finish the job was July 2002. The taskforce members included Secretaries, Additional Secretaries and Joint Secretaries of some relevant ministries. Additionally two professional consultants, one from the World Bank office in Bangladesh and the other from Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), a government owned autonomous research institute were hired to lead the drafting of the PRSP.

Till then up to March 2003 the government prepared several drafts and organised some consultation meetings with relevant stake holders to prepare the final version of the Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP), "A National Strategy for Economic Growth, Poverty Reduction and Social Development" and submitted the I-PRSP to the World Bank and the IMF in March 2003. After revision in the Joint Staff committee of the World Bank and the IMF the final version of the PRSP was published in October 2005 under the title, **Unlocking the Potential: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction** (GOB-2005a)**.**

6. Policy Priorities in the PRSP

There are eight specific avenues--four strategic blocks and four supporting strategies--through which the goal of accelerated poverty reduction will be pursued. These are *firstly* supportive macroeconomic policies; *secondly* choice of critical sectors to maximise pro-poor benefits from growth process with special emphasis on the rural, agricultural, informal and Small and Medium Enterprise sectors; *thirdly,* safety net measures; *fourthly,* human development; *fifthly,* participation and empowerment of the poor; *sixthly,* promoting good governance; *seventhly,* service delivery in the areas of basic needs; and *finally*, caring for environment and its sustainability.

In strategic block II, agriculture and rural development are considered as the most important sector, whose performance is outstandingly important to have any real impact on poverty alleviation. This is rightly so because, three-quarters of the country's total population and 85 percent of the total number of the poor live and earn their livelihood in rural areas. With about 22 percent of GDP contributed by agriculture (crops 12 percent, forestry 2 percent, livestock and poultry 3 percent, and fisheries 5 percent) and another 36 percent of the rural non-farm sector, the rural economy as whole contributes nearly 60 percent of total GDP. Agriculture generates two-thirds of total employment, contributes a quarter of total export earnings and provides food security to the increasing population (PRSP, page 83).

So agriculture is in the heart of the problem solving and some of the problems relating to agriculture are mentioned in the following section..

7. The Comments about the Implementation

There are a number of general concerns about the implementation of the overall poverty reduction strategy, such as weak infrastructure, maintaining a low fuel and energy price, corruption, weak governance and above all political unrest and uncertainty.

Serious questions have already been raised from different Departments and Ministries, such as Ministry of Water Resources, Fisheries and Livestock, Agriculture, Local Government, Education, Primary and Mass Education, Health and Family Planning, Social Welfare, Communication and the Ministry of Women and Child affairs about preparedness for the implementation of the strategy. These Ministries have raised concern about the inexperience and inefficiency for the preparation and implementation of the medium term budgetary plan.

There are some other concerns which are not even mentioned in the strategy paper. These are discussed below.

In greater northern districts cow dung is used as a major source of household fuel consumption among the majority of the low income people, even in the cities and towns in recent years. With ever increasing demand of household fuel and the increasing unavailability and consequent high price of fuel wood people are forced to substitute cow dung for fuel wood.

Again with the rapid expansion of fisheries, the use of cow dung as food for fisheries is increasing very fast, causing a huge and highly growing demand for this once low priced product and principal source of nutrient of soils. So price of cow dung is rising very fast and going to be very scarce in near future.

Again due to scarcity and very high price of cattle food, lack of grazing land and sharp increase in real wages in agriculture this very highly labour intensive cattle raising sector is shrinking gradually. Mechanised tilling system is substituting cattle ploughs causing threat to bio-mass supply.

If we compute internal terms of trade, it could be seen easily that the terms of trade is gradually moving against crop production and cattle raising in comparison to fisheries and other sub-sectors.

Again, with the increase in fish production, as it is still highly profitable in comparison to other agricultural practices, the owners of ponds and other water reservoirs are not allowing the crop producers any more to use their water. So the crop producers now rely more and more on underground water. Even the jute producers suffer due to the lack of access to use the pond water for rotting the raw jute sticks. Consequently, the dispute over the access to use pond water is now a days a growing concern about the harmony in rural Bangladesh.

There must be a proper policy planning immediately to keep the bio-mass contents of the soil intact. There should be a definite policy which could stop the use of cow dung as the major source of fuel for household consumption.

In some parts of the country, some water plants are used as bio-mass in the cropped lands but these are not available in all parts and again there is a trade off between the growing production of fish and the availability of water plants. This process is also labour intensive, and with the increase of real wages in agriculture as well as transport costs, this process is becoming less remunerative.

Alternative must be found out, for otherwise the effort to increase the productivity of agriculture will be in absolute jeopardy, which will ultimately threaten the objectives of poverty reduction and achievements of MDGs.

Unfortunately as the use of underground water is increasing, it is getting more and more scarce causing a serious threat to the sustainability of underground water based production. Presently, it is a real fear in greater Barendra Zone that the deep tube wells are failing gradually. There is a real concern that in the near future, there would be no alternative to surface water use and appropriate plan must be taken without any delay for the infrastructural development for surface water use.

The poverty reduction effort is very highly dependent on the performance of the agriculture sector in general and on the crop sub sector specifically. If the above mentioned problems are not addressed properly, it can be said without any hesitation that the productivity of agriculture will go down soon. The sign of such slowing down is already in display (PRSP, page 85).

Again, tourism is identified as a sector which could contribute to poverty reduction. In the sort-term, tourism may help a little bit, but in the longer term it can only aggravate the situation. This sector must be dealt with extreme caution otherwise its long term consequences may be extremely dangerous. Experiences could be gathered from many of the African countries and also from Cuba, Thailand etc.

8. Conclusion

PRSP is a comprehensive policy document, and the government with the help of the IMF and World Bank will try to implement the policies written there. The whole process of preparation of the PRSP was a complex one and its implementation will be even more difficult. We have already seen many dissents about the document itself and also simultaneously about the preparedness of the government for implementation of the strategies.

One thing one should always keep in mind is that the IMF and the World Bank are the initiators, sponsors and also owners of this document. So this policy document will be implemented under the active supervision of these institutions. So, this may not always be a blessing for this country.

Increasing the productivity of agriculture and more specifically of the crop sector depends on many factors, many of which are not addressed in the PRSP document, such as land ownership, tenancy pattern, renting contracts etc. These may not pose immediate threat for the productivity increase in the country but the problems which are mentioned in this paper should be addressed immediately. The government should take initiative with the help of the researchers to solve the problem.

Finally, whether the low-income countries will be benefited from the PRSP or whether it will only serve the purpose of the IMF and the World Bank and in a broader sense the purpose of the developed world through promotion of further structural change and economic liberalisation and globalisation, needs to be seen in future. But at the least, it can be said that the similar interventionist Structural Adjustment Packages of the IMF and the World Bank failed to achieve the well-formulated targets for the poor countries. In most cases, it only helped the interest of developed countries. So many of us will remain curious about the final outcome of the very well formulated and highly advertised document (i.e. PRSP) of the IMF and the World Bank.

References

Bhuyan, A.R. (2006) 'Millenninm Development Goals: Bangladesh Experence *Journal of Islamic Economics and Finance* Vol 2, No. 1, Januray-June,

GOB (2005): Bangladesh Economic Review 2005. Ministry of Finance, Government of Bangladesh.

GOB 2005a: *Unlocking the Potential, National Strategy for Accelerated Poverty Reduction*. General Economics Division, Planning Commission, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.

International Monetary Fund (IMF) (2005) : http//:www.imf.org

Todaro M. P.(2001): *Economic Development.* 7th Ed., Addison-Wesley, 2001.

World Bank: http//:

United Nationas (2000): *Millennium Declaration*, New York.

Economic Growth and Income Inequality in Bangladesh

Md. Farid Uddin Khan*

Abstract

This paper identifies the relationship between income inequality and economic growth in Bangladesh for 1984-2000 by analyzing the measures of income inequality, Lorenz curves and Gini coefficients. The standard view of the relationship between growth and inequality is that broad based economic growth is poverty reducing. But, growth may also be associated with rising inequality. This point was first made by Kuznets who suggested the hypothesis that the distribution of income initially worsens in the course of economic growth and then improves. Although economists have for a long time investigated the trade-off relations between growth and inequality, yet no consistent and systematic relationship can be referred between income distribution and economic growth. This paper reveals that Gini Co-efficient increased from 0.360 to 0.472 over the sixteen-year period, 1984 to 2000 in Bangladesh, whereas, GDP growth rate increased from 4.3 to 5.9 percent over the same period. It appears that in Bangladesh both GDP growth and income inequality are taking place and we are yet to reach the second half of the Kuznets curve when inequality declines with GDP growth.

1. Introduction

In both developing and developed countries the pursuit of economic growth along traditional GNP– maximizing lines as the major objective of economic activity was widely heard. This exclusive principal indicator of development and economic well-being has been rising significantly throughout the world. But the term inequality misleads or confuses the whole success story of achieving

* Lecturer, Department of Economics, University of Rajshahi

economic growth as about half of the world population is fighting against hunger and poverty.

The idea that relentless pursuit of growth is the principal economic objective of society is now in question. As a result, both in rich and poor countries, concerns for the problems of poverty and income inequality became the major theme of the 1970s. In the developed counties, the major emphasis seemed to shift toward the concern for the quality of life and in the poor countries the main concern focused on the question of growth verses income distribution. Obviously development requires a higher GNP and faster growth rate, but the basic issue is not only how to make GNP grow, but also who would make it grow – the few or the many. If it were the rich, they would likely appropriate it, and poverty and inequality would continue to grow worse. But if it were generated by the many, then the fruits of economic growth would be shared more evenly. Realizing this pertinent issue Bangladesh government is taking the policy of promoting pro-poor economic growth for increasing income and employment of the poor to continue the anti-poverty strategy under Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP).

This paper seeks to find the relationship between growth and income inequality. It takes no explicit stance on causality between inequality and growth,but addresses a simpler question: Does the pursuit of economic growth tend to improve, worsen, or have no necessary effect on, the distribution of income in Bangladesh? Or when growth occurs, how do the poor fare?

The major objectives of the study are to examine the relationship between economic growth and income inequality and to reexamine the Kuznets hypothesis in the case of Bangladesh. Specifically the paper has three objectives. First: to observe whether income inequality at the beginning of the period significantly affected per capita growth over the years, 1984 to 2000. Secondly: to look at whether the growth affected the evolution of inequality over the same period. Thirdly: based on the findings of the first two objectives, to obtain a Kuznets relationship in the case of Bangladesh.

Methodologically, this paper uses simple arithmetic and graphics, instead of attempting an econometric analysis for studying the questions of inequality and growth. We use two convenient and well-known tools for graphing and measuring income inequality, Lorenz curves and Gini coefficients to analyze the relationship between growth and inequality. In this study secondary sources of data are used which have been collected mainly from the successive issues of Bangladesh Economic Review of the Government of Bangladesh and Household Income and

Expenditure Survery (HIES), Bangladesh Bureau of Statistics. Gini Index is calculated with the Brown Formula:

$$G = |1 - \sum_{k=1}^{n}(X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})|$$

where

G is the Gini coefficient

X_k is the cumulated proportion of the population variable, for k = 0,...,n, with $X_0 = 0$, $X_n = 1$

Y_k is the cumulated proportion of the income variable, for k = 0,...,n, with $Y_0 = 0$, $Y_n = 1$

The paper is organised as follows. It is divided into four sections including the introduction. Section II reviews some of the earlier studies regarding the relationship between growth and inequality. Estimation and Data issues are discussed in Section III. Section IV analyses the results and sketches a picture of what happened to growth and inequality in Bangladesh between 1984 and 2000. It also illustrates the possible reasons behind the relations between inequality and growth. Section V concludes the study.

2. Literature review

The subject of income inequality and its growth over time is widely discussed but has rarely been researched in Bangladesh. We hear a lot about the growing income inequality but there is little evidence to substantiate it. Professor Khan talked on: Accelerating Growth and Poverty Reduction in Bangladesh in a seminar organised by the World Bank in June 2003.The paper by Khan reports that the annual increase in per capita GDP doubled, from about 1.5 per cent to about 3 per cent, between the late 1970s and the late 1990s. In the decade since the mid 1980s the poverty-reduction effect of growth became much weaker. What follows from Khan's observations is that per capita income in rural areas increased with modest positive impact on poverty reduction. But the serious concerns emerge on the growing inequality of income.

Kuznets (1955) had asked if income inequality rose or fell in the course of economic growth. He documented that both occurred: looking across countries, from poorest to richest, within country in the early stages of economic growth the distribution of income will tend to worsen, while at later stages it will improve.

This hypothesis has come to be known as the "inverted U" Kuznets curve. The possible explanations about why inequality seemed first to worsen during the early stage of economic growth might be the nature of structural change. At the earlier stage, growth may be concentrated in the industrial sector and consequently the income gap between the modern and the traditional sector may widen quickly.

Osmani presented an estimate based on surveys conducted between 1963-64 and 1973-74. The contributions of khan (1986) and Rahman (1988) were based on surveys upto the early 1980s. Rahman and Huda (1992) considered inequality between occupational groups using the 1983-84 HES.

Alesina and Rodrik (1994), Perotti (1996), and Persson and Tabellini (1994) conclude that inequality and growth are negatively related, while Barro (2000), Forbes (2000), and Li and Zou (1998) report a positive or varying relation between the two. Barro (2000), Ravallion (2001), Sarel, (1997), Chang and Ram (2000) and Li et al. (1998) investigate how income equality evolves over time and the impact of growth on income inequality. They generally fail to find any systematic pattern of change in income distribution during recent decades or even any systematic link from fast growth to increasing inequality. Some recent empirical evidence has tended to confirm the negative impact of inequality on growth. Others have found that the level of initial income inequality is not a robust explanatory factor of growth.

Deininger and Squire (1998) used regression analysis and more elaborate data, in contrast to the minimalist, arithmetic approach of this paper. They concluded: The poor benefit more from increasing aggregate growth by a range of factors, than from reducing inequality through redistribution. Dollar and Kraay (2001) studied directly average incomes of the poorest fifth of the population, across many different economies, and noted that those incomes rose proportionally with overall average incomes, for a wide range of factors generating economic growth. They concluded that the poor benefit, whatever drives aggregate economic growth. Similarly, Ravallion and Chen (1997) found in survey data that changes in inequality were orthogonal to changes in average living standards.

3. Measuring Income Inequality in Bangladesh

The Lorenz Curve

One of the most elegant devices for understanding income inequality is the Lorenz curve. Conrad Lorenz, an American statistician, devised this convenient graphical

tool in 1912. The Lorenz curve is used in economics to describe inequality in wealth or income. Lorenz curves place the cumulative percentage of income received on the vertical axis, and the cumulative percentage of population on the horizontal axis. The Lorenz curve diagram, then, is a square, and if all individuals are the same size, the Lorenz curve is a straight diagonal line, called the line of equality since if the Lorenz curve were coincident with this line, income could be described as being equitably distributed. If there is any inequality in size, then the Lorenz curve falls below the line of equality. It is also convenient to scale the graph in decimal units, so that the sides of the square are exactly one unit. If the Lorenz curve diagram is scaled in decimal terms, area A + B is always equal to 0.5. Thus, it remains only to estimate area A. We find it easier to take advantage of the fact that, A = 0.5 – B, that is, we estimate area B first, and then calculate area A from that result. The total amount of inequality can be summarized by the Gini coefficient (also called the Gini ratio).

The Gini Coefficient

At this point, the Gini coefficient, which is simply a quantification of the Lorenz curve, can be introduced. Gini coefficient is simple and handy summary measure of Lorenz curves. It is the ratio of the area between the line of equality and the Lorenz curve and the area beneath the line of equality. It is often used to measure income inequality. It is a number between 0 and 1, where 0 corresponds to perfect equality (e.g. everyone has the same income) and 1 corresponds to perfect inequality (e.g. one person has all the income, and everyone else has zero income). It was developed by the Italian statistician Corrado Gini and published in his 1912 paper "Variabilità e mutabilità".

The Gini coefficient is defined as a ratio of the areas on the Lorenz curve diagram in Figure 1. If the area between the line of perfect equality and Lorenz curve is A, and the area under the Lorenz curve is B, then the Gini coefficient is given by the following:

$$\text{Gini coefficient} = A/(A + B).$$

By considering the above definition and a graph such as Figure 1 a more "bowed out" Lorenz curve results in a larger Gini coefficient since area A becomes relatively larger. That is, large Gini coefficients imply greater degrees of income inequality.

Figure 1 : Graphical representation of the Gini coefficient

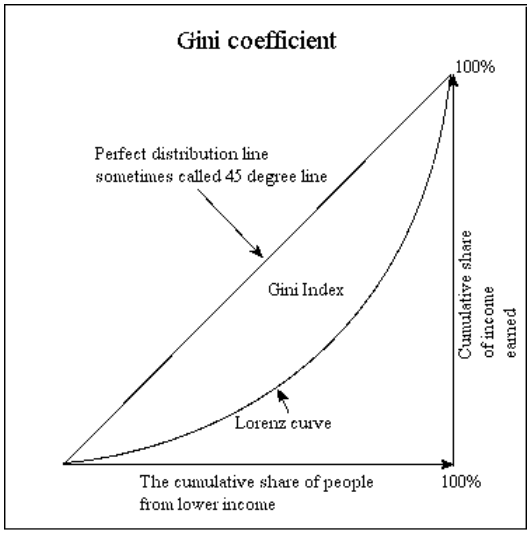

4. Data Analysis

Table 1 contains the information on the percentages of households in various deciles income shares from 1983-84 to 2000 at the national level in Bangladesh. From the Table it can be found that the relative share of income of the percentage

Table 1 : Decile partitioning of shares of income accruing to percentage of households in national level.

Deciles of households	2000	1995-96	1991-92	1988-89	1985-86	1983-84
Lowest 5%	0.67	0.88	1.03	1.06	1.18	1.17
Decile-1	1.84	2.24	2.58	2.64	2.81	2.89
Decile-2	3.13	3.47	3.94	4.00	4.18	4.31
Decile-3	3.96	4.46	4.95	4.96	5.13	5.39
Decile-4	4.77	5.37	5.94	5.93	6.05	6.36
Decile-5	5.68	6.35	7.08	6.95	6.98	7.38
Decile-6	6.84	7.53	8.45	8.10	8.09	8.56
Decile-7	8.32	9.15	10.09	9.61	9.48	9.99
Decile-8	10.40	11.35	12.10	11.62	11.25	11.74
Decile-9	14.30	15.4	15.64	15.2	14.58	15.08
Decile-10	40.72	34.68	29.23	31	31.46	28.30
Highest5%	30.66	23.62	18.85	20.51	21.35	18.30
Gini Index	0.472	0.432	0.388	0.379	0.370	0.360

Source: The Household Expenditure Survey 1991–92 and 2000, BBS

of households with lowest 5 percent declined over the years, from 1.17 percent in 1983-84 to 0.67 percent in 2000. On the other hand, the relative share of income of the percentage of households with highest 5 percent increased during the periods, from 18.30 percent in 1983-84 to 30.66 percent in 2000, which clearly indicates that inequality in income distribution has been rising over the periods. Analysis of data also reveals that between 1995-96 and 2000, income attributable to the poorest 10 percent of the population declined further from 2.24 percent to 1.84 percent. Conversely, the control on the income by the richest 10 percent of the population increased from 34.68 percent to 40.72 percent. Further, up to deciles 4 income bracket the households' share of income decreased from 18.95 percent in 1983-84 to 13.70 percent in 2000 whereas the last 2 deciles' i.e. 20 percent households' income share increased from 43.38 percent in 1983-84 to 55.02 in 2000.

It can also be calculated that the top 10 percent of family receives almost 32 percent of the total income received in an average over the period, and the richest 20 percent receive around 47 percent of income. We apply the Brown formula given above to calculate the value of Gini coefficient. Gini coefficients over the 1984 –2000 period are presented in Table 1. We note that it increased fairly slowly in 1984, 1986, 1989 and 1992, but it increase more rapidly in 1996 and 2000 than before. Discussing Gini coefficients and changes in the income distribution over the period it is interesting to note that the Gini coefficient from 1984 to 2000 only increased by 31 percent.

Figure 2 : Lorenz curves for the period 1984 to 2000.

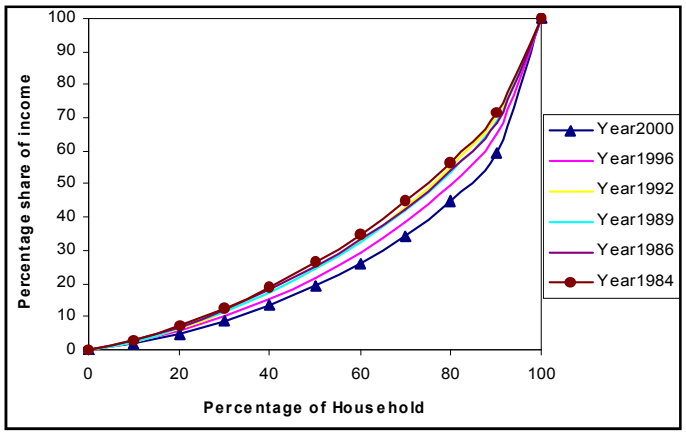

The Lorenz curves for various family income groups over the period 1984 to 2000 are shown in Figure 2. Here we note that as time goes by Lorenz curves are going far away from the perfect equality line over the period. It is easy to see that the further the Lorenz curve bows from the line of equality, the more unequally income is distributed. It can also be seen that the 2000 curve is below the 1996 curve, and the 1996 curve is below all previous years' curves, reflecting an increase in income inequality. Because the distribution of Income changed gradually between 1984 and 2000, these curves provide a convenient way to look about the increasing trends of income inequality and also say about the distribution over the period of time in Bangladesh.

Now it is time to see what happens to growth. Table 2 exhibits the per capita GDP and GDP growth for some specific years during the period 1984 to 2000,

Table 2 : Per capita GDP and Gini coefficient and their growth rates

Year	Per Capita GDP at current market price	Gini co-efficient	Growth rate of GDP at constant price	Growth rate of Gini coefficient (%)
1984	5063.5	0.360	-	-
1986	5176.6	0.370	4.3	2.78
1989	5282	0.379	2.5	2.43
1992	10551	0.388	4.2	2.37
1996	13768	0.432	4.6	11.34
2000	18511	0.472	5.9	9.26

Sources: World Bank, World Development Indicators, 1998 & Government of Bangladesh, Bangladesh Economic Review, 2003 and 2004 editions.

particularly for the years when income distribution data are available. As we observe, there is, by and large, a consistency among the per capita GDP at different years and also a little bit upward trend of GDP growth during the period.

The Table above also shows the Gini coefficient and its growth for the same selected years during the period 1984 to 2000 as income distributions among different family groups are not available for every year. Similarly we observe the increasing values of Gini coefficient and a little bit of its fluctuating growth in the different years over the period.

Figure 3 : Comparison of GDP growth and Gini coefficients' growth

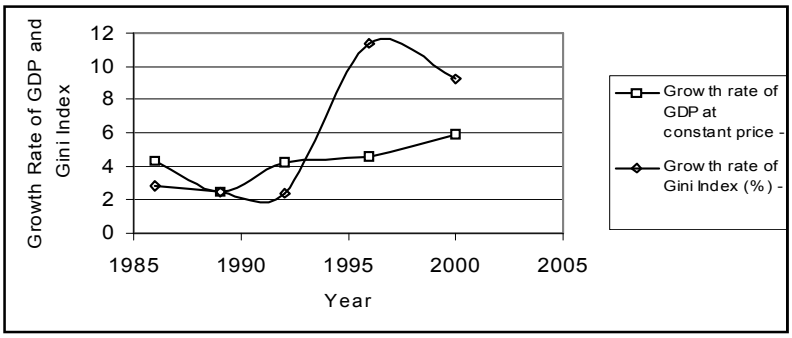

Figure 3 shows the comparative growth pattern of GDP and Gini coefficient. Growth rate is increasing steadily whereas, at the initial stage Gini coefficient rising at a decreasing rate until 1992 and then drastically rising in an increasing rate from 1992 to 1996 and finally it is declining. We can observe that income inequality increases more rapidly than that of income.

Figure 4 : Kuznets curve in case of Bangladesh

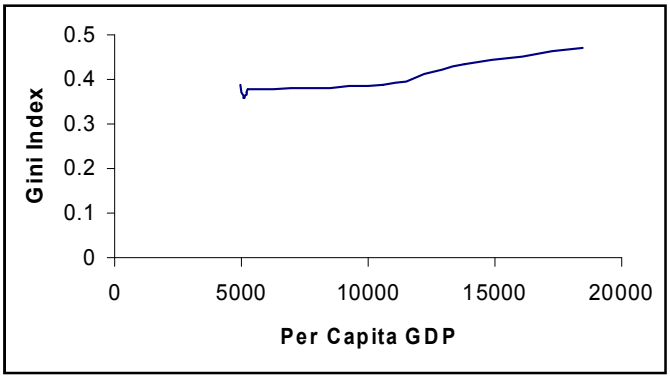

Diagrammatically, the Kuznets curve fitted by the growth and inequality data for 1984-2000 of Bangladesh shown in figure 4 can be illustrated as follows: In the diagram, the curve is not consistent with the 'Inverted U' Kuznets curve which reflects that at the earlier stage of development income inequality will tend to worsen, while at later stages of development inequality improves.

In the case of Bangladesh it is evident from the growth and inequality data that economic growth does not tend to improve the distribution of income over the

period but worsens it. The country is still in the left wing of the Kuznets curve where both growth and inequality are taking place together. However, it is obvious from the paper that at the initial stage of development in Bangladesh, inequality was taking care of economic growth but the growth is not doing the same for the distribution. As a result, inequality is getting worse in spite of the increase in income.

The upward trend of income inequality can roughly be described as the fact that the economy is growing but such growth is limited in specific sector particularly in modern sector. This sector is conducted by a more or less fixed number of rich people keeping wages constant in the traditional sector that causes the Lorenze curve to shift downward and further from the line of equality, as shown in Figure 2.

In the modern economy especially in developing countries, government has the extra responsibilities to ensure a reasonable distribution of income through different social welfare and development policies targeting the poor. As it is established, macroeconomic instability and lack of sufficient public investment in physical and social infrastructure are widely recognized as important reasons for inequality. In addition, because the rural poor's links to the economy vary considerably, public policy should focus on issues of their access to land and credit, education and health care, support services, and right to food through well-designed public works programs and other transfer mechanisms.

It is well recognized that the income tax rates, the minimum wage laws, and all the major government welfare and transfer programs can improve income distribution. But the problems we find in Bangladesh are: firstly, after adopting structural adjustment policies (SAP) the country has relaxed its trade barriers by reducing import duties which resulted in the loss of a huge amount of revenues from import duty. Secondly, the tax collection systems in the country is not transparent and corrupt. Rich people, as a result, frequently hide their income and evade taxes. Thirdly, foreign aid has recently declined and is subject to strong donor conditionalities.. So, the availability of funds allocated for social welfare has not been increasing sufficiently. Finally and more importantly, lack of accountability and transparency in public sector, political instability, corrupt politicians, vindictive politics and bureaucratic complexities are the main hurdles on the way of reducing inequality in Bangladesh. In addition, high concentration of land ownership and asymmetrical tenancy arrangements, large and rapidly growing families with high dependency ratios, rural-urban wage gap, and internal and external shocks stemming from natural factors and changes in the international politics and economy are some other noticeable obstacles in the way of improving inequality.

5. Conclusion

This paper has applied a simple arithmetic approach to analyze growth and inequality of incomes in Bangladesh over the period 1984-2000. A positive relation is observed between the income inequality and GDP growth i.e. in spite of growing GDP, income inequality is large and increasing in Bangladesh. Bangladesh has experienced relatively high rates of economic growth in the recent years but it brought little benefits to the poor.

The lesson drived is that exclusive reliance on economic growth to reduce the extent of absolute poverty in developing countries would probably be insufficient. The possibilities that inequality causes economic growth positively are empirically tenable for Bangladesh. But even as growth occurs, the poor might be disadvantaged anyway, because inequality has risen over the period. So, it can be concluded from the finding of the paper that only under inconceivably high increases in inequality, economic growth would not benefit the poor.

References

Alesina, Alberto, and Dani Rodrik (1994) "Distributive politics and economic growth,"

Quarterly Journal of Economics 109(2), 465– 490, May

Bangladesh Bureau of Statistics 1998, *Report on The Household Expenditure Survey*

1995-96, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka.

Barro, Robert J. (2000) "Inequality and growth in a panel of countries," *Journal of Economic*

Growth, March

Deininger, Klaus, and Lyn Squire (1996) "A new data set measuring income inequality,"

World Bank Economic Review 10(3), 565–591, September

Dollar, David, and Art Kraay (2001) "Growth is good for the poor," *Working Paper, DRG,*

The World Bank, Washington DC, March

Government of Bangladesh, *Bangladesh Economic Review*, 2004 and 1996 editions, Dhaka:

Ministry of Finance.

Government of Bangladesh, *Unlocking the Potential*, National Strategy for Accelerated

Poverty Reduction, Planning Commission, Dhaka, 2005

Http://*en.wikipedia.org*/wiki/Gini_coefficient

Http://*mathworld.wolfram.com*/GiniCoefficient.html

Khan H., 1986, "Income Inequality, Poverty and Socio-Economic Development in

Bangladesh: An Empirical Investigation", *Bangladesh Development Studies,* 14, 75-92.

Khundker, N., W. Mahmud, B. Sen, and M. U. Ahmad, 1994, "Urban Poverty in Bangladesh:

Trends, Determinants, and Policy Issues", *Asian Development Review* 12: 1-31.

Kuznets, Simon (1955) "Economic growth and income inequality," *American Economic*

Review 45(1), 1–28, March

Li, Hongyi, and Hengfu Zou (1998) "Income inequality is not harmful for growth: Theory and evidence," *Review of Development Economics* 2, 318–334

Osmani, S., 1982, Economic Inequality and Group Welfare: A Theory of Comparison with Application to Bangladesh", *Clarendon Press,* Oxford.

Perotti, Roberto (1996) "Growth, income distribution, and democracy:

What the data say," *Journal of Economic Growth* 1(2), 149– 187, June

Persson, Torsten, and Guido Tabellini (1994) "Is inequality harmful for growth?" *American*

Economic Review 84(3), 600–621, June

Rahman, Atiq. and Trina. Haque, 1988, "Poverty and Inequality in Bangladesh in the Eighties:

An Analysis of Some Recent Evidence", *Research Report No. 91*, BIDS, Dhaka.

Rahman M., and S. Huda, 1992, "Decomposition of Income Inequality in Rural Bangladesh,

Modern Asian Studies, 26, 83-93.

Rahman M., 1988, "Some Aspects of Income Distribution in Rural Bangladesh", *Applied*

Economics, 20,1007-1015,.

Ravallion, Martin, and Shaohua Chen (1997) "What can new survey data tell us about recent changes in distribution and poverty?," *World Bank Economic Review* 11(2), 357–382, June

Todaro, Michael P and Smith, Stephen C. (2003), *Economic Development*, Eighth Edition,

Pearson Education Asia, Delhi, India.

ট্রানজিট ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত দক্ষিণ এশিয়া

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান*

সারসংক্ষেপ

আলোচ্য প্রবন্ধে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ তথা সার্কভুক্ত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা – ট্রানজিট সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের প্রথমাংশে ট্রানজিট ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর তা করতে গিয়ে ট্রানজিটের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থান করা হয়েছে। প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে সার্ক অঞ্চলের (দক্ষিণ এশিয়া) দেশসমূহের বিশেষ করে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ট্রানজিটের ভূমিকা বিশে- ষণ করা হয়েছে। আর সবশেষে ট্রানজিট সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ কিভাবে তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে সেবিষয়ে সুপারিশমালার আকারে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

ভূমিকা

দু'দশকেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা হিসেবে সার্কের আবির্ভাবের। অথচ এ দীর্ঘ সময়েও এর মূল যে উদ্দেশ্য (অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও ইন্টিগ্রেশন) তার ছিটে-ফোটাও অর্জিত হয় নি। যদিও কাগজে-পত্তরে অনেক কিছু অর্জিত (সাপটা, সাফটা ইত্যাদি) হয়েছে বলে আমাদেরকে অব্যাহতভাবে জানানো হচ্ছে। বাস্তবতা কিন্তু সম্পূর্ণই ভিন্ন কথা বলছে। অদ্যাবধি দক্ষিণ এশিয়ার (সার্কের) এক দেশের মানুষ অবাধে অন্য দেশে যাতায়াত করতে পারছে না। তাদেরকে বার্লিন ওয়ালের চেয়েও কঠিন সব বাধা অতিক্রম করতে হচ্ছে। এক দেশের টাকা-পয়সা অন্য দেশে চলছে না। টাকা-পয়সার যাবতীয় কর্মকান্ড সাম্রাজ্যবাদী টাকা-পয়সায় (ডলার, পাউন্ড, ইউরো ইত্যাদি) করতে হচ্ছে। এক দেশের যানবাহন অন্য দেশে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে দিলেও অত্যন্ত সীমিতভাবে এবং অত্যন্ত কড়াকড়িতে। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হচ্ছে যে, প্রতিনিয়ত সীমান্ত এলাকায় গোলাগুলিতে মানুষ (সাধারণ ও আইন-শৃংখলা বাহিনীর) মারা পড়ছে। এরকম এক দুর্বিষহ অবস্থায় ফলপ্রসু আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা (সার্কের প্রধান লক্ষ্য) কি আদৌ সম্ভব ? আলোচ্য প্রবন্ধে এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়, রাজশাহী।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আঞ্চলিক সহযোগিতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপায় ট্রানজিটের উপর আলোকপাত করা। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

১. *ট্রানজিটের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা ;*
২. *আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ট্রানজিটের গুরুত্ব তুলে ধরা ;*
৩. *দক্ষিণ এশিয়ায় (সার্ক অঞ্চলে) ট্রানজিটের বিকাশের পথে সমস্যা ও অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করা;*
৪. *আর এ সমস্যা ও অন্তরায়সমূহ দূর করে কিভাবে ট্রানজিটের সম্ভাবনাসমূহ কাজে লাগানো যায় সেসম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ উপস্থাপন করা।*

পদ্ধতি ও তথ্য

আলোচ্য প্রবন্ধ রচনায় ব্যবহৃত তথ্য প্রধানত ঃ মাধ্যমিক উৎস থেকে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা গ্রন্থের বিভিন্ন সংখ্যা এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী গ্রন্থের বিভিন্ন সংখ্যা। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক সংস্থা এসকাপের বিভিন্ন প্রকাশনা, বিভিন্ন গ্রন্থ এবং সাময়িকী ও দৈনিকে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত অসংখ্য নিবন্ধ ও প্রবন্ধের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

ট্রানজিট ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক

এক দেশের ভূখন্ড অন্য দেশের বা দেশসমূহের মানুষ ও যানবাহনের যাতায়াতের জন্যে ব্যবহার করতে দেয়ার নামই হচ্ছে ট্রানজিট। ট্রানজিট দু'ধরনের হতে পারে ঃ ১। আন্তঃদেশীয়, অর্থাৎ দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে ; ২। একই দেশের দুই স্থানের মধ্যে। অপরদিকে করিডোর হচ্ছে কোন রাষ্ট্রের সংকীর্ণ ভূখন্ড যা অন্য রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে কোন বন্দরে যাবার পথ হিসেবে বা কোন ছিটমহলে যাবার পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বৃহৎ অর্থে করিডোর ট্রানজিটেরই অন্তর্ভূক্ত। প্রশ্ন হচ্ছে ঃ ট্রানজিটের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন সম্পর্ক আছে কি ? আর থাকলে তা কেমন সম্পর্ক ? অবশ্যই ট্রানজিটের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক আছে এবং তা সরাসরি সম্পর্ক ; অর্থাৎ ট্রানজিট সুবিধা থাকলে বা দিলে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। উদাহরণ হিসেবে ইউরোপের কথা বলা যায়, আসিয়ানের কথা বলা যায়, চীন-ভিয়েতনামের কথা বলা যায়, চীন-উত্তর কোরিয়া, চীন-রাশিয়া ও চীন-মঙ্গোলিয়ার কথা বলা যায়। ১৯৭৩ সালে হেলসিংকিতে স্বাক্ষরিত সর্ব ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও শান্তি চুক্তির আওতায় ইউরোপীয় দেশসমূহ তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পরস্পরকে ট্রানজিট সুবিধা দিতে সম্মত হয়। এমন কি প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোও এ সুবিধা (ট্রানজিট) লাভ করে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পশ্চিম ইউরোপের একমাত্র বৃটেন বাদে বাকী সব রাষ্ট্রগুলোই বিগত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে জ্বালানী সংকটে পড়ে। ফলে তারা জ্বালানীর বিশেষ করে গ্যাসের প্রায় অফুরন্ত ভান্ডার সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে তাকাতে বাধ্য হয়। জার্মানী, ফ্রান্স ও ইতালীসহ বেশ কিছু দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি করে গ্যাস সরবরাহের জন্যে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে চুক্তি অনুযায়ী যথাসময়ে গ্যাস

সরবরাহের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ট্রান্স সাইবেরিয়ান ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্যাস পাইপ লাইন নির্মানের কাজ শুরু করে। প্রায় এক দশক লেগে যায় এ গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ করতে। বিগত শতাব্দীর আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সোভিয়েত গ্যাস জার্মানী ও ফ্রান্সে পৌছে যায়। পরবর্তীতে ইতালীসহ অন্যান্য দেশে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর তাদের অর্থনীতির চালিকা শক্তি জ্বালানীর (গ্যাসের) জন্যে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এ ভয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা তাদের দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাইপ ও অন্যান্য সরঞ্জাম (গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণের জন্যে) সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে সোভিয়েতরা বাধ্য হয়ে নিজেরাই তা উৎপাদন করে এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করে। ইদানিং চাহিদা বৃদ্ধিজনিত কারণে জার্মানী বাল্টিক সাগরের তলদেশ দিয়ে আরও একটি সরবরাহ লাইন নির্মাণের জন্যে রাশিয়ার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ওদিকে চীন ও জাপানও রাশিয়ার সাইবেরিয়ার গ্যাস ও তেল পাইপ লাইনের মাধ্যমে পাওয়ার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছে শীঘ্রই। আসিয়ানের দেশগুলোও পরস্পরের উপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছে। সিংগাপুর একটি দ্বীপরাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও সে তার ভৌগলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে দেশকে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে সিংগাপুর পুনঃরপ্তানী (re-export) ব্যবসা গড়ে তোলে। গড়ে তোলে অসংখ্য তেল শোধন শিল্প ও সংরক্ষণাগার। আর এভাবে পার্শ্ববর্তী মালয়েশিয়ার তেল ও রাবারসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ পুনঃরপ্তানীর মাধ্যমে সিংগাপুর দ্রুত উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় মুলধনের যোগান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিল (৩, ৪)। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, ট্রানজিট সুবিধা একটি দেশের উন্নয়নকে দারুণভাবে প্রভাবিত করতে পারে। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দক্ষিণ এশিয়ার (সার্ক অঞ্চলের) দেশসমূহে এখনও আমাদেরকে ট্রানজিট নিয়ে বিতর্ক করতে হচ্ছে। সার্ক গঠনের পর দু'দশকেরও বেশী সময় অতিবাহিত হলেও (১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়) এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আস্থা ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যে কারণে প্রায়ই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ও তীক্ততার সৃষ্টি হচ্ছে এমন কি ছোট-খাট ও তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সাফটা (South Asian Free Trade Area বা SAFTA) চুক্তি কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে পহেলা জুলাই, ২০০৬ থেকে (পহেলা জানুয়ারী থেকে হবার কথা ছিল)। ২০১৫ সাল নাগাদ পুরোপুরি মুক্ত বানিজ্য এলাকায় পরিণত হবে দক্ষিণ এশিয়া এ সংক্রান্ত চুক্তিতে অন্ততঃ এমনটা আশা করা হয়েছে। কিন্তু ট্রানজিটের ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রগতি না হলে মুক্ত বানিজ্যের সুফল কতটা পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

ট্রানজিটের ব্যাপারটি এখনও আতুর ঘরেই রয়ে গেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে পারস্পরিক অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা ও সহযোগিতার মনোভাবের অনুপস্থিতি। আমাদের দেশেও এক্ষেত্রে পক্ষে-বিপক্ষে মতামত বিদ্যমান। যারা ট্রানজিটের পক্ষে তাদের যুক্তিগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. *অর্থনৈতিক অবকাঠামোর বিকাশ বিশেষ করে রেলপথ ও নৌপথের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে ;*
২. *আঞ্চলিক বানিজ্য বৃদ্ধির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে ;*
৩. *সহায়ক অনেক সেবাখাতের বিকাশ ঘটবে ;*
৪. *অর্থনৈতিক অবকাঠামো খাতে ভারতসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে ;*
৫. *বানিজ্য ঘাটতি বিশেষ করে ভারতের সাথে আমাদের দেশের বানিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাবে ;*
৬. *বহুমুখী ট্রানজিট সুবিধা (বন্দর, করিডোরসহ) আমাদের দেশের জন্যে বানিজ্যের সম্ভাবনার*

নতুন দিগন্ড় উন্মোচন করে দেবে ;

৭. *বাংলাদেশের দরকষাকষির শক্তি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে ;*

৮. *সাদফ (South Asian Development Fund বা SADF) ব্যবহারের সুযোগ অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে।*

অন্যদিকে যারা ট্রানজিটের বিরুদ্ধে তাদের যুক্তিগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. *জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে ;*

২. *অমীমাংসিত ঐতিহাসিক সমস্যার উপস্থিতি ;*

৩. *চীন ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা ;*

৪. *মাদক দ্রব্য পাঁচারের সমস্যা ;*

৫. *ট্রানজিট পথসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ;*

৬. *অবৈধ বানিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ;*

৭. *পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্ভাবনা।*

ট্রানজিটের পক্ষে-বিপক্ষের উপরোক্ত যুক্তি-তর্কের আলোকে প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আমরা আমাদের দেশের অর্থনীতিতে এর ভূমিকা আলোচনা করবো।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ট্রানজিটের ভূমিকা

আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার আবির্ভাব ঘটে মূলতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে। তবে সবচেয়ে দেরীতে জন্ম হয় সার্কের। দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতার উদাত্ত আহ্বানের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (South Asian Association for Regional Cooperation বা SAARC) গঠিত হয়। বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক সনদ অনুমোদন করেন যার মূল বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. *দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ সাধন এবং তাদের জীবনমান উন্নত করা ;*

২. *অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি দ্রুততর করা ;*

৩. *যৌথভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়া ;*

৪. *পরস্পরের সমস্যা অনুধাবন, পারস্পরিক বিশ্বাস ও বোঝাপড়ায় সাহায্য করা ;*

৫. *অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সাহায্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ;*

৬. *অন্যসব উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা ;*

৭. *একই স্বার্থ সংশি-ষ্ট বিষয়ে আন্ড়র্জাতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার প্রসার ;*

৮. *অন্যসব আঞ্চলিক ও আন্ড়র্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা।*

সার্ক সনদের বিষয়বস্তুর আলোকেই নির্ধারিত হয় এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মূলনীতি যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. *দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের ১৪০ কোটি মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করা ;*
২. *সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক উন্নতির ধারা ত্বরান্বিত করা ;*
৩. *জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;*
৪. *জনগণের স্বার্থে সব দেশের মধ্যে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা ;*
৫. *অন্যসব আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা।*

সার্কের মূলনীতি

১. *সিদ্ধান্ত হবে সর্বসম্মত ;*
২. *দ্বিপক্ষীয় বিরোধপূর্ণ বিষয় সার্কের আলোচ্য বিষয় করা যাবে না ;*
৩. *আঞ্চলিক অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না করার নীতি এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার নীতিকে সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা ;*
৪. *সদস্য দেশের আশা-আকাংখার প্রতি লক্ষ্য রেখে ভূমিকা পালন করা।*

সার্ক গঠনের পর দু'দশকেরও বেশী সময় অতিবাহিত হলেও এর অর্থনৈতিক সাফল্য প্রায় শূন্যের কোটায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আসিয়ান অনুরূপ সময়ে যে সাফল্য অর্জন করেছিল তার ধারে-কাছেও যেতে পারে নি সার্ক। অনুরূপ সময়ে তারা ভিসামুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থা ও পারস্পরিক ট্রানজিট সুবিধা প্রদানসহ অনেক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিল। সার্কের মত আঞ্চলিক জোট থাকতেও দক্ষিণ এশিয়ার আন্তঃবানিজ্য খুবই সীমিত (১১, ১৮ ঃ ১১ ঃ ০৫)। বর্তমানে এ অঞ্চলের সাতটি দেশের মোট বানিজ্যের মাত্র ৫.০% নিজেদের মধ্যে হচ্ছে। অথচ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, নাফটা ও আসিয়ানের ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ৬৫.০%, ৫৭.০% ও ৩৭.০%। সার্কের পিছিয়ে পড়া আঞ্চলিক বানিজ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের দেশ। কারণ এই স্বল্প বানিজ্যের মধ্যেও সার্কের অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের রয়েছে বিশাল বানিজ্য ঘাটতি বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে।ট্রানজিট সুবিধাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে অবশ্যই এ ঘাটতি কমিয়ে আনা সম্ভব। আশার কথা হচ্ছে এই যে, দেরীতে হলেও গত ১ জুলাই ২০০৬ সাল থেকে সাফটা কার্যকর হয়েছে (১১, ০২ ঃ ০৭ ঃ ০৬)। উল্লেখ্য যে, সাফটা চুক্তি সই হয় সেই ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত সপ্তম সার্ক সম্মেলনে। এর অধীনে সার্কভুক্ত সাতটি দেশের মধ্যে বানিজ্যের ব্যাপারে নির্ধারিত হারে শুস্ক হ্রাসের কথা আছে। এতে আঞ্চলিক বানিজ্যিক আদান-প্রদান বেড়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। সাফটা অনুযায়ী ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা তাদের আমদানী শুল্ক বাংলাদেশসহ সার্কের অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে আগামী ছয় মাসের মধ্যে বর্তমান হার থেকে ১০.০% হ্রাস করবে। আর বাংলাদেশ কমাবে ২.৫%। বর্তমানে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ শুল্ক হার হচ্ছে ২৫.০%। সাফটা চুক্তি অনুসারে আগামী তিন বছরের মধ্যে তা ০.০ – ৫.০% এ নামিয়ে আনতে হবে। আর এজন্য বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলো সময় পাবে দশ বছর। সংশ্লীষ্টরা অবশ্য আশংকা করছেন যে, নন-ট্যারিফ ও প্যারাট্যারিফ বলে পরিচিত শুল্ক বহির্ভূত বাধা-বিপত্তির জন্য

সাফটা থেকে ফায়দা উঠানো কঠিন হবে। অতএব, শুল্ক বহির্ভূত বাধা দূর করা না হলে মুক্ত বানিজ্য কাজে আসবে না, এমনকি শুল্ক হার শূন্য করা হলেও না।

দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় দেশ হচ্ছে ভারত। গোটা অঞ্চলের প্রায় দেড় বিলিয়ন অধিবাসীর মধ্যে এক বিলিয়নেরও বেশী মানুষ বাস করে ভারতে। ভারতের অর্থনীতি যেমন শক্তিশালী, প্রবৃদ্ধিও তেমনি সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থান করছে (প্রায় ৮.০%)। কাজেই সাফটা কার্যকর হওয়ার একটি প্রধান বাস্তবতা হচ্ছে এ চুক্তি থেকে আমাদের দেশসহ এ অঞ্চলের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর লাভবান হওয়া। আর সেটা নির্ভর করছে বড় দেশ বা বড় বাজার ভারত এই দেশগুলোর জন্যে তার বাজার কতটা উন্মুক্ত করছে বা পণ্য প্রবেশের শুল্ক, অশুল্ক বা প্যারাশুল্ক বাধাগুলো কতটা দূর করছে তার উপর। এমতাবস্থায়, স্বাভাবিকভাবেই সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বানিজ্যের প্রথম টার্গেট হচ্ছে ভারতের বাজারে প্রবেশ করা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ভারত এ যাবৎ তার বাজারে আমাদের দেশী পণ্য প্রবেশের সুযোগ সামান্যই দিয়েছে। অথচ শুধু আঞ্চলিক বানিজ্য চুক্তি সাফটাই নয়, দ্বিপক্ষীয় মুক্ত বানিজ্য নিয়েও আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছে। সার্কের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র বিশেষ করে বাংলাদেশ বানিজ্য উদারীকরণ করলেও ভারত যথাযথ বানিজ্য উদারীকরণ করেনি। বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার আওতায় বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলের অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ভারতের যেসব সুবিধা প্রদানের কথা সেগুলো প্রদান করা হয় নি বলে যেমন অভিযোগ রয়েছে, তেমনি শুল্ক বহির্ভূত ও প্যারা শুল্ক বাধা আরোপের মধ্য দিয়েও বানিজ্য সুবিধা বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। কাষ্টম, ব্যাংকিং সমন্বয়, পণ্যমান নির্ধারণ এবং অবকাঠামোগত সমস্যা ও রাজ্য সরকারগুলোর পৃথক শুল্ক আরোপজনিত সমস্যাগুলো এখনও পূর্বের মতই রয়ে গেছে। বর্তমানে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বানিজ্য ঘাটতি প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার (১)। এ ঘাটতির সবটুকুই যে ভারতের কারণে তা অবশ্যই নয়, আমাদের দেশের রপ্তানী পণ্যের সীমাবদ্ধতাও এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী। শুল্ক বহির্ভূত নানা রকম বাধা সৃষ্টি করে ভারত বাংলাদেশের হাতেগোনা কয়েকটি পণ্যেরও প্রবেশাধিকার বন্ধ করে রেখেছে।

তবে এটাও ঠিক, মুক্ত বানিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের মান এবং রুলস অফ অরিজিনের (৫) নিয়মাবলি মেনে চলার ব্যাপার রয়েছে। তাছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা দূর করা, কাষ্টমের প্রক্রিয়াগত সমন্বয় সাধন, ব্যাংকিং প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ও সমন্বয় এবং কার্যকর বীমা ব্যবস্থা একান্ত জরুরী। ঋণ পত্রের ক্ষেত্রেও এ অঞ্চলের সবার কাছে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। পণ্যের মানের ক্ষেত্রেও সঠিক একটি সমন্বিত মান নির্ধারণ প্রক্রিয়া গ্রহণ অপরিহার্য। পণ্য আনা নেয়ার ক্ষেত্রে অব্যবস্থা দূর করা দরকার। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতের বানিজ্যের ক্ষেত্রে উভয় দেশের স্থল বন্দরের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা দূর করা খুবই জরুরী। এছাড়াও ঘুষ, দুর্নীতি ও হয়রানীর ব্যাপার তো রয়েছেই। কিন্তু এসব সমস্যা সত্ত্বেও কাষ্টমের বাধা, জটিল সার্টিফিকেশন নিয়মাবলি এবং শুল্ক বহির্ভূত বাধাগুলো দূর করা অবশ্যই সম্ভব। এর জন্যে প্রয়োজন সদিচ্ছা এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সম্প্রতি ভারতের শুল্ক বিভাগ সাফটা চুক্তির আওতায় শুল্ক হার হ্রাসের নোটিশ দিয়েছে (১১, ০৮ ঃ ০৭ ঃ ০৬)। ৩০ জুন ২০০৬ তারিখে জারি করা এ নোটিশে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপের ক্ষেত্রে অধিকতর হারে শুল্ক হ্রাসের বিধান করা হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে এ ঘোষণা বাস্তবায়নে যেন প্রাতিষ্ঠানিক বাধা প্রধান হয়ে না দাঁড়ায়ে সে ব্যাপারে ভারত সরকারকে সজাগ থাকতে হবে। আরও বড় বিষয় হলো শুল্ক বহির্ভূত বাধাগুলো দূর করার ব্যাপারে বাংলাদেশ-ভারতের

মধ্যে অব্যাহত আলোচনা বাঞ্ছনীয়। যত দ্রুত সম্ভব এ সমস্যা দূর করা দরকার, তা না হলে শুল্ক হ্রাস যেমন কোন কাজে আসবে না, তেমনি সাফটা বাস্তবায়নও সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকবে।

তবে সব কিছুর মূলে হচ্ছে ট্রানজিট। ট্রানজিট সুবিধা উন্মুক্ত করার সাথে সাথে যদি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা না হয় তাহলে অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হবে না। আর এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্থল পরিবহণ অবকাঠামো। স্থল পরিবহণ অবকাঠামো আবার দু'ধরনের ঃ রেল ও সড়ক পরিবহণ অবকাঠামো। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে রেল পরিবহণ হচ্ছে সবচেয়ে লাভজনক। কারণ রেল হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, দ্রুত ও সস্তা। অথচ এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সবচেয়ে পিছিয়ে আছে। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে কোনও রেল যোগাযোগ নেই। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বছর দুই পূর্বে যাত্রীবাহী রেল যোগাযোগ শুরু হলেও তা অত্যন্ত সীমিত ও অনিয়মিত। অনেক আলাপ-আলোচনা হলেও বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অদ্যাবধি রেল যোগাযোগ শুরু করা সম্ভব হয় নি। অথচ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রেল নেটওয়ার্ক সর্বভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গেই সংযুক্ত ছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত – পাকিস্তান যুদ্ধের পর বর্তমানের বাংলাদেশের সাথে ভারতের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর কিছুদিন মালবাহী ট্রেন চললেও ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে তাও বন্ধ হয়ে যায়। সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রায় একই অবস্থা বিদ্যমান। নামকা ওয়াস্তে সড়ক যোগাযোগ বিদ্যমান থাকলেও মানসম্পন্ন সড়কের অভাব ও নানা রকম বিধি নিষেধের ঘেরাটোপের কারণে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে এশিয়ান মহাসড়কের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ অন্যান্য দেশ এ মহাসড়কের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হলেও বাংলাদেশ হয় নি (৩১ ডিসেম্বর ২০০৫ চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে)। ইউএনএসকাপ (United Nations Economic and Social Council for Asia and the Pacific, বা UN-ESCAP) ১৯৯২ সালে অলটিড (Asian Land Transport Infrastructure Development বা ALTID) নামে এক প্রকল্প শুরু করে যার প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. *এশিয়ান মহাসড়ক (Asian Highway বা AH) নির্মাণের মাধ্যমে এশিয়ার দেশগুলোকে সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় আনা ;*
২. *ট্রান্স-এশিয়ান রেল পথ (Trans-Asian Railway বা TAR) নির্মাণের মাধ্যমে এশিয় দেশগুলোকে ইউরোপের সাথে যুক্ত করা ;*
৩. *আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রবেশের জন্যে সীমান্ত পাড়াপাড়ের নিমিত্তে সীমান্ত পাড়াপাড় সুবিধা (Border Crossing Facility বা BCF) গড়ে তোলা।*

এসকাপের পরিকল্পনা অনুযায়ী এশিয় মহাসড়কের একটি শাখা ভারতের হরিদাসপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের বেনাপোল সীমান্ত অতিক্রম করবে এবং বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে সিলেট সীমান্ত দিয়ে ভারতের আসাম রাজ্যে ঢুকে যাবে। আর অন্যটি নেপাল ও ভারত হয়ে রাজশাহী সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে প্রথমটির সাথে বঙ্গবন্ধু সেতুর কাছাকাছি গিয়ে মিলিত হবে। তার মানে এশিয় মহাসড়কের বাংলাদেশ অংশ পরবর্তীতে চট্টগ্রাম ও মঙ্গলা বন্দরকে নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার, ভারত ও চীনের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ এশিয় মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত হলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক স্বর্ণ দরজা খুলে যেতে পারে। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো যদি স্থল পরিবহণ ও যোগাযোগ এবং ট্রানজিট সুবিধার ক্ষেত্রে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করে তাহলে ২০১৫ সাল নাগাদ আন্তঃআঞ্চলিক বানিজ্যের পরিমাণ এগারো বিলিয়ন

ডলারে গিয়ে পৌছাতে পারে (৯)। অপরদিকে রেলের সম্ভাবনা সড়ক যোগাযোগের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ভারত যদি বাংলাদেশ রেলওয়েকে তার ভূখন্ড ব্যবহার করে নেপালে যেতে দেয় তাহলে প্রতি বছর আমাদের দেশ থেকে ৫০ থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানী হতে পারে সেদেশে। তেমনিভাবে নেপালও বাংলাদেশে এবং আমাদের মঙ্গলা বন্দর ব্যবহার করে তার রপ্তানী ও আমদানী কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে পারে (৭)। আর বানিজ্য ও বিনিয়োগের সরাসরি সম্পর্কের কথা বিবেচনায় নিলে এটা পরিস্কার যে, অলটিড প্রকল্পের আওতায় ট্রানজিট ও অন্যান্য সেবার ফি বাবদ বাংলাদেশ শুধু বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাই আয় করবে না, বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক বিনিয়োগও আসবে দেশে।

হতাশার কথা এই যে, বিএনপি-জামাত জোট সরকার এশিয় মহাসড়ক সংক্রান্ত চুক্তিতে সই করে নি নিরাপত্তা ও ভারতীয়দের বেশী সুবিধা হবে এ অজুহাতে। বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শুরুতেও তৎকালীন বিএনপি সরকার একই ভুল করেছিল বিনা খরচায় তথ্য মহাসরণীতে যোগদানে সম্মত না হয়ে। এসকাপের প্রস্তাবিত রুট (সিলেট হয়ে) বাদ দিয়ে টেকনাফ হয়ে মিয়ানমার রুটের পাল্টা প্রস্ত াব দিয়ে বর্তমান জোট সরকার আসলে গোটা জিনিষটাই বলা যায় ভন্ডুল করে দিয়েছে। রেলপথের অবস্থা তো একেবারেই ভঙ্গুর ও দুর্বল (৬)। স্বাধীনতার পয়ত্রিশ বছরে রেললাইনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাস পেয়েছে। বন্দরগুলোর অবস্থা তো তথৈবচ। স্থল বন্দরের কোনও অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। সমুদ্র বন্দর দু'টোর অবস্থা ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর অবস্থাকেও হার মানায়। অতএব, আমাদের দেশের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে অর্থনীতি, রাজনীতি ও প্রযুক্তির সুসমন্বয় ঘটাতে হবে।

সুপারিশমালা

সার্ক জোটের আওতায় কোন রকম সফল অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্যে আমাদের মতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী ঃ

১. ট্রানজিটের ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পারস্পরিক ট্রানজিট ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার আশা করতে পারে না। বাংলাদেশ ভারতকে তার পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যের সাথে যোগাযোগের জন্যে ট্রানজিট দিলে উভয়েই লাভবান হবে। কারণ বর্তমানে ভারতকে পশ্চিম বঙ্গ থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত যেতে প্রায় এক হাজার ছয়শত পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়। অথচ বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে গেলে এ দূরত্ব মাত্র তিনশত পঞ্চাশ কিলোমিটারে এসে দাঁড়াবে। কাজেই ট্রানজিট সুবিধা পেলে ভারতের সময় ও অর্থের প্রভূত সাশ্রয় হবে এবং যোগাযোগ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। আর বাংলাদেশ রয়ালটি ও সেবা খাতের বিকাশের মাধ্যমে যথেষ্ট আয় করতে পারবে। করিডোর সুবিধা ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুবিধা দিলে এ আয় কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। সম্প্রতি ভারত মায়ানমারের গ্যাস বাংলাদেশের উপর দিয়ে নেয়ার জন্যে তৃদেশীয় গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ তা প্রত্যাখান করেছে। আমরা মনে করি এটিও একটি ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ শুধু এ গ্যাস পাইপ লাইন থেকেই বাংলাদেশ বছরে কম পক্ষে পাঁচশত মিলিয়ন ডলার আয় করতে পারতো। আর ভবিষ্যত গ্যাস নিরাপত্তার ব্যাপারটি তো রয়েছেই। মায়ানমারের প্রচুর গ্যাস আছে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্যে গ্যাসের চাহিদা

অব্যাহতভাবে বাড়বে যা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন দিয়ে ভবিষ্যতে মোকাবেলা করা সম্ভব নাও হতে পারে। বাংলাদেশ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভারত ইদানিং বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তের ভারতীয় ভূখন্ড দিয়ে গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক জরিপ কাজ চালানোর জন্যে তারা বেলজীয় একটি কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের মত কুনীতি নিয়ে চললে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বিশ্বের তথা এশীয় অঞ্চলের দেশগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। মনে রাখতে হবে যে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ তার ভৌগলিক অবস্থানের এ সুবিধা কাজে লাগানোর সুযোগ নাও পেতে পারে। অতএব, সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখনই, এই মূহুর্তে। তা না হলে সাবমেরিণ ক্যাবল প্রকল্পের মত পস্তাতে হবে।

২. ট্রানজিট (করিডোর ও বন্দর সুবিধাসহ) প্রদানের বিনিময়ে অবশ্যই বাংলাদেশ নেপাল, ভুটান এবং ভবিষ্যতে চীনের সাথে যোগাযোগের জন্যে ভারতীয় ভূখন্ড ব্যবহারের সুবিধা চাইতেই পারে। নেপাল, ভুটান ও চীনও এ ব্যাপারে সক্রিয় হলে ভারত অবশ্যই এ দেশগুলোকে ট্রানজিট সুবিধা দিতে বাধ্য হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেক দিনের শত্রুদেশ ভারত ও চীন পরস্পরের মধ্যে ব্যবসা-বানিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর পর (১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পর বন্ধ হয়ে যায়) নাথু লা (সিকিম রাজ্যের) সীমান্ত খুলে দিয়েছে বিগত ০৬ ঃ ০৭ ঃ ০৬ তারিখ। উল্লেখ্য যে, এটি বিখ্যাত সিল্ক রুটের একটি অংশ। শুধু তাই নয়, চীন তিব্বতের সাথে তার অন্যান্য এলাকার যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্যে ইদানিং বিস্ময়কর এক রেল লাইন নির্মাণ করেছে যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক হাজার একশত বিয়াল্লিশ কিলোমিটার। বিগত ০১ ঃ ০৭ ঃ ০৬ তারিখ চীনের প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও এর উদ্বোধন করেন (১১, ০৪ ঃ ০৭ ঃ ০৬)। এটা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু রেল লাইন। এর উচ্চতা হচ্ছে চার হাজার মিটার (চার কিলোমিটার)। যে জন্যে অক্সিজেন ঘাটতির আশংকায় এতে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই রেলওয়েকে চীনের রাষ্ট্রপতি বিশ্বের এক "বিস্ময়" বলে অভিহিত করেছেন। এর ফলে "পৃথিবীর ছাদ" বলে পরিচিত হিমালয় অঞ্চলের উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। চীন সরকার ইতোমধ্যেই এই লাইন তিব্বতের রাজধানী লাসা থেকে দক্ষিণ এশিয়ার কাছাকাছি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে। আগামী দশ বছরে চীনের সীমান্ত সংলগ্ন ষ্ট্র্যাটেজিক গুরুত্বসম্পন্ন ভাদং শহর পর্যন্ত ট্রেন লাইন পাতা হবে। ভাদং তিব্বতে কোমো ও ভারতে ভা ঢুং নামে পরিচিত। এটি লাসা থেকে ৩১৫ কিলোমিটার, ভুটানের রাজধানী থিম্পু থেকে ১০০ কিলোমিটার এবং ঢাকা থেকে ৪৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আর নেপাল তো আরই কাছে। আমরা মনে করি ভারত যেমন চীনের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্যে সকল বৈরীতাকে আড়াল করে সীমান্ত খুলে দিয়েছে, সার্কের দেশ হিসেবে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশকেও ভারত ট্রানজিট (করিডোর ও বন্দরসহ) সুবিধা প্রদান করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে।

৩. ট্রানজিট সুবিধাকে সফলভাবে কাজে লাগাতে হলে সর্বাগ্রে দরকার আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণ। বাংলাদেশের স্থল বন্দরগুলো ইউরোপের মধ্যযুগীয় অনুরূপ বন্দরের কথা মনে করিয়ে দেয়। সুতরাং আধুনিক কম্পিউটার ও কনভেয়ার সিষ্টেমসহ পরিপূর্ণ এক স্থলবন্দর অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে। ভারত পারলে আমরা পারবো না কেন। ভারত বন্দর

অবকাঠামোর আধুনিকায়ন করেই যাচ্ছে। শক্তিশালী রেল অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে এবং এসকাপের ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে প্রকল্পের সাথে বাংলাদেশ রেলওয়েকে সংযুক্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক রেল পরিবহণ ব্যতীত ট্রানজিট থেকে তেমন একটা সুবিধা পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান অত্যন্ত দুর্বল অবস্থা নিয়ে একবিংশ শতাব্দীর পরিবহণ চ্যালেঞ্জ কিছুতেই মোকাবেলা করা যাবে না (৬)। সড়ক অবকাঠামোর ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। সড়ক পথের বিকাশ ঘটলেও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সড়কের এখনও যথেষ্ট অভাব রয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অবশ্যই অনতিবিলম্বে এসকাপের এশিয়ান হাইওয়ে প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না যে, এ সুযোগ হাতছাড়া করলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে একঘরে হয়ে পড়তে হতে পারে। ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে ও এশিয়ান হাইওয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার মত ঝুঁকি বাংলাদেশ কিছুতেই নিতে পারে না। কারণ ভবিষ্যতে এর জন্যে চরম মূল্য দিতে হতে পারে।

৪. সবকিছুর মূলে রয়েছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। সার্কের দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাস এতটাই প্রবল যে, অর্থনৈতিক বিবেচনা এখানে একেবারেই কাজ করছে না। যে কারণে সার্কের আওতায় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত বেশ কিছু চুক্তি হলেও তার বাস্তবায়নে সদস্য রাষ্ট্রগুলো আদৌ আন্তরিক নয়। এছাড়া ঐতিহাসিকভাবে ভূখন্ডগত বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে (সিটমহল, জম্মু ও কাশ্মীর ইত্যাদি) যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের সংকট থেকেই যাবে। অতএব, কোন রকম অর্থবহ অর্থনৈতিক (ট্রানজিটসহ) সহযোগিতা চাইলে সার্কের সদস্য দেশগুলোকে উপরোক্ত সমস্যাগুলোর বাস্তবসম্মত, দ্রুত ও ন্যায্য সমাধান অবশ্যই খুঁজে বেড় করতে হবে।

৫. ডলার সাম্রাজ্যবাদ থেকে সার্কের সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে মুক্তির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। আসিয়ানের দেশগুলো কিন্তু বহু আগেই নিজেদের মধ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মুদ্রা বিনিময়যোগ্য করেছে। সার্ক দেশসমূহেরও উচিত এ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্তে আসা। বাংলাদেশী টাকাকে ডলারে রূপান্তর এবং ডলারকে আবার রূপীতে রূপান্তর-এ এক জটিল, ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া। সরাসরি টাকাকে রূপীতে এবং রূপীকে টাকায় কেন রূপান্তর করা যাবে না ? এ প্রশ্নের উত্তর সার্ক দেশের নেতৃবৃন্দকে খুঁজে বেড় করতে হবে। আর তা যতদিনে সম্ভব না হবে ততদিনে ট্রানজিট ও অন্যান্য ব্যবস্থার সুফলও আশানুরূপ পাওয়া যাবে না।

উপসংহার

বিগত প্রায় তিন দশক (১৯৭৮ – ২০০৬) যাবৎ চীনের গড় প্রবৃদ্ধি ১০.০% এর উপরে অবস্থান করছে। আর সার্কের দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি পাঁচ থেকে ছয় শতাংশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। অবশ্য ইদানিং ভারতের প্রবৃদ্ধি ৮.০% এ পৌছেছে (২০০৫ – ২০০৬)। মনে রাখতে হবে প্রবৃদ্ধি আকাশ থেকে পড়ে না। প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্যে কিছু পূর্বশর্ত পূরণ করতে হয় যা শক্ত প্রবৃদ্ধির ভিত তৈরী করে। চীনারা বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে। চীনের প্রতিটি পরিবার আজ এক একটা গার্মেন্টস কারখানায় তথা উৎপাদন সংস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। এর পেছনে অবশ্য মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে চীনের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। চীন আজ আধুনিক প্রযুক্তি

জ্ঞানসম্পন্ন এক বিশাল কর্মী বাহিনীর দেশে পরিনত হয়েছে। আর একটি বিষয় হচ্ছে এই যে, চীন অত্যাধুনিক এবং অত্যন্ত বিশাল ও সুবিস্তৃত এক অবকাঠামো গড়ে তুলেছে। চীন বর্তমানে অবকাঠামো খাতে ভারতের তুলনায় ছয় গুন বেশী বিনিয়োগ করছে। কাজেই প্রবৃদ্ধি তো বেশী হবেই। বিদেশী ও স্বদেশী বিনিয়োগ তো চীনেই যাবে বা হবে। কাজেই আমরা বিশ্বাস করি যে, সার্কের দেশগুলোও যদি চীনের অভিজ্ঞতায় আলোকিত হয়ে শিক্ষা (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) ও ট্রানজিটসহ অবকাঠামোর উপর অগ্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে যায়, তাহলে সার্কও অর্থনৈতিক জোট হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. অর্থ মন্ত্রনালয়, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৬ ।

২. অর্থ মন্ত্রনালয়, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫ ।

৩. Antipov V. I. : Singapore, <<Misl>>, in Russian, Moscow, 1982.

৪. Kurzanov V.N. : Industrial Development of Singapore, <<Nauka >>, in Russian, Moscow, 1978.

৫. Azad A. K. : "A Theoretical Note on the SAARC Cumulation System," বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা, পৃঃ ৫০৩-৫১১ ।

৬. খান মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ঃ "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা", ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন ঢাকায় ০৮-১০ ডিসেম্বর ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পঞ্চদশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ ।

৭. Khan M. M. H. : "Trade between Bangladesh and other SAARC Countries : Some Pertinent Issues", Presented at the Biennial Conference of the Bangladesh Economic Association Held on 08-10 December 2004 at the Engineers Institution, Dhaka.

৮. Rahmatullah M. : Asian Land Transportation Development : Its Implications for Trade and Economic growth for Bangladesh, Background Paper of C. P. D. arranged Dialogue, 04-05 January 1997, Dhaka.

৯. Rahmatullah M. : Asian Land Transportation Development : Its Implications for Trade and Economic growth for Bangladesh, from Perspective on South Asian Cooperation, Pakistan Office of the German Friedrich Ebert Stiftung (FES), Friedrich Ebert Foundation, 1994.

১০. Sdasuk G. V. : States of India, << Misl >>, in Russian, Moscow, 1981.

১১. দৈনিক সংবাদ, ঢাকা ।

১২. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা ।

১৩. The Independent, Dhaka.

Floating Exchange Rates in the Developing World: The Bangladesh Context

Tarequl Hasan, M. Chowdhury*
Nitai C. Nag**

Abstract

We find that independent floating is not a viable option for least developed countries. During the last one decade, the number of countries with independently floating exchange rate declined significantly. However, developed countries, such as the USA, Canada, UK, Japan etc. have been consistent floaters. Many least developed countries went for independent floating, but failed to stick. Some also suffered damages in the process. Bangladesh belongs to managed floaters' group. However, Bangladesh's floating behaviour looks like an independent one. The result has been unpleasant. Our opinion is that Bangladesh's move toward floating has not been timely. To continue with floating, Bangladesh will have to exercise total independence at managing the float on the one hand and devote to developing such complimentary factors as are essential for floating to work.

Exchange rates are theoretically divided into two categories, namely, fixed and flexible exchange rates. There are, however, quite many variants of each of these categories. The fixed exchange system has about as many variants as has the variable system. Edwards and Savastano (1999) list as many as nine different exchange rate systems that prevailed in the world until 1999. According to IMF Annual Report 2005, the total number of variants [1] is eight. *Exchange rate arrangement with no separate legal tender*, and *independent floating* appear respectively in the first and last places of both the lists. Coexistence of many systems has, among others, turned the task of estimating their relative merits

Since Edwards and Savastano (1999) and the IMF use distinct terms to describe various systems we cannot determine if fonner details any particular system or some particular system vanished during the interval.

* Assistant Professor, Deptt. of Economics, University of Chittagong.
** Professor, Deptt. of Economics, University of Chittagong.

problematic. *The profusion of exchange rate systems and the blurred boundaries between many of them makes any attempt to empirically determine the merits of alternative regimes extremely difficult*—(Edwards and Savastano 1999, p.5).

Between 1988 and 1998, the number of countries having floating– a variant of the flexible exchange system— rose from just 38 to 101. The rush seems to have waned since. According to IMF Annual Report 2005, 86 countries out of a total of 187, were pursuing floating as of end April, 2005. Of them 52 were using *managed floating* and the rest pursued *independent floating*. At the other extreme, the number of countries with no *separate legal tender* is also on the rise. Between 1999 and 2004, the number of countries under the latter, in turn a variant of the fixed exchange rate system, rose from 37 to 41. The fact that an overwhelming majority of the world's countries, 127 out of 187 now belong to either extreme has also led some experts (e.g., Eichengreen and Hausmann, 1999; Fisher, 2001) to predict that the intermediate regimes will vanish, and as between the corner solutions, floating will dominate.

The bipolar view has been refuted by Velasco (2000), OECD (2001), and Williamson (1999). Velasco (2000) points out that, except for some extreme cases, neither currency boards nor a clean float of currencies seem appropriate for developing countries. Williamson (1999), for instance, sees equally admissible the possibility of countries reverting to intermediate regimes. Recent statistics too seem to provide credence to this possibility. The number of independent floaters, for instance, fell from 50 in 1999 to 34 in 2005. This might also go some way to dispel the IMF's foresight. It is the bipolar view that might rather fade away. Table-1 in the appendix shows how rapidly the numbers of countries affiliated to the various variants are fluctuating. There are instances of countries *hiring and firing* certain system in a span of just one year. Exchange rate system of the world, particularly, the developing one is seemingly passing the most turbulent of episodes ever.

This article is organized in the following manner. In section two, we prepare a short note on the prospect of floating by developing countries. In section three, there appears a perspective account of Bangladesh's move toward floating. Section four points out Bangladesh's problems and prospects with floating. Concluding remarks appear in the last section.

2. Floating by the Developing Countries

The job of determination of the relative advantage of floating exchange for the developing countries is complicated due to the very nature of the problem. As

Frankel (2003) notes, *The advantages and disadvantages of various exchange rate regimes – fixed* versus floating as well as various other places along the spectrum — are far too numerous to be readily captured and added up in a single model. Studies on floating by developing countries so far have remained almost confined with addressing the broad issue: whether a developing country should float or fix. Opinions, as usual, are divided. While the IMF is almost the sole advocate for floating by developing countries, other experts differ and seriously object to applicability of floating for them.

2.1 The IMF's Point

No single exchange rate regime is best for all countries in all circumstances (IMF, 2000). *Member countries continue to have scope to choose the type of exchange rate regime that best suits their needs, always with the proviso that the chosen regime must be credibly supported by policies consistent with the choice. ...While increased capital mobility has been leading an increasing number of countries to either end of the spectrum between firmly fixed rates (or monetary unification) and free floating, intermediate regimes are likely to remain viable and appropriate in many cases (IMF 2000, op. cit.).*

In the contemporary world, however, the IMF, in not quite keeping with this position, is found to put pressure upon those developing countries, which seek its help to switch to floating exchange system. To the sheer disregard for the arguments that highlight inappropriateness of floating system for the developing countries, more and more countries are allured to introduce it. "Fixed exchange rates pose significant challenges because they require much greater reliance on fiscal, monetary and structural policies to provide the flexibility needed in the economy" declares Anne Krueger, the managing director of the IMF (Krueger 2005).

Floating exchange system, thus, is supposed to overcome the necessity of excessive reliance by developing countries with fixed exchange system on fiscal monetary and structural policies for economic flexibility. Unfortunately, we will see soon how experts refer to the same fiscal, monetary, and structural matters to express reservations about appropriateness of floating for developing countries.

2.2 The Counterpoint

Number of countries belonging to independent floating declined from 50 in 1999 to 34 in 2005. Although, a few least developed countries, such as, Somalia,

Uganda, Sierra Leone, Papua New Guinea, Madagascar, continued to be in the independent floating group until 2005, they too may be expected to follow suit considering the observed trend. Ecuador, finding itself in ruins, abandoned floating after experimenting with it less than one year. Of the 50 countries, which belonged to independent floating group in 2000, only 24 remained in the same group in 2005. They are mostly the developed countries, e.g., the US, U.K., Canada, Japan, Australia etc. Floating exchange system initially evolved in those countries. That is, independent floating suits the developed countries.

In the absence of hard data on the outcome of floating in the developing countries authors until now concentrate on its theoretical aspects. These include issues on regional blocks, competition for world market for similar range of products, difficulty of defining floating proper for a developing country, likely volatility of exchange rate, uncertainty, and loss of confidence, fiscal and monetary weaknesses, adverse implications of combination of floating and international capital flows, potential negative impact on investment and debt service, etc.

Bénassy-Quéré and Coeuré (2000) have stressed upon the regional dimension of the debate on corner solutions. They argue that both pure floating and hard pegs make future regional cooperation more difficult. This is important in a world of regional trade blocs, which look for ways to intensify cooperation. A float is an inherently unstable regime for countries competing on world markets for a similar range of products and hence sets incentives for beggar-thy-neighbor competitive devaluation. Floating induces non-cooperative strategies, especially when the competing neighbors face a common shock

In the similar vein, Cooper (1999) points out prescriptions regularly extended to developing countries by the international community, including the IMF and the US Treasury, namely to move toward greater exchange rate flexibility and to liberalize international capital movements, may be in deep tension, even deep contradiction. *It is an open question whether a broad, diversified financial market based on the domestic currency can develop under floating exchange rates,* says Cooper (op. cit.), who also argues that jumping asset prices and absence of hedging instruments in underdeveloped countries could trouble lives under floating exchange system by hampering well-being and investment. Cooper concludes by noting that,

> *as time goes on flexible exchange rates will gradually evolve from being mainly a useful shock absorber for real shocks into being mainly a disturbing transmitter of financial shocks, increasingly troublesome for*

> *productive economic activity. Thus a cost-benefit calculation for flexible versus fixed exchange rates will gradually alter the balance against flexibility, even for large countries.*

This conclusion will look justified empirically since the number of independent floaters declined from 50 to 34 between 1999 and 2005 (see table-1). Table-1 also shows that number of managed floaters has almost doubled to 52 between 1999 and 2005. Edwards and Savastano (1999) asks if it is at all possible to distinguish fixed and flexible exchange rates in the context of the developing countries. To quote the authors,

> *to our knowledge, there have been no serious attempts at establishing an economically-based divide between a "flexible" and a "floating" exchange rate in developing countries. Moreover, given the dearth of episodes with floating exchange rates in those economies, it is not entirely clear whether such a distinction is even possible and, therefore, what countries or experiences outside the developing world should provide the yardstick for evaluating this* option. …

This argument notwithstanding, Edwards and Savastano (op. cit.), conclude,

> *Mexico's experience after the 1994 peso crisis provides an opportunity to gain some insights on behavior of floating exchange rates in emerging economies. Of course, it is not possible to extract general conclusions from a single episode, but in the absence of other experiences with anything that resembles a floating rate, analyses of Mexico's foray with exchange rate flexibility should prove very useful. ... Although preliminary, and based on only a few months of the floating exchange rate experiment, these results suggest that middle-income countries can have a reasonably well functioning floating exchange rate system.*

Likely volatility and uncertainty has been highlighted by Standard and Poors (Feb 15, 2002), which notes that in Mexico, foreign exchange rate dropped 24 percent in a week in Venezuela after the announcement of floating and that interest rates on commercial loans peaked near 100 percent.

> *"The high uncertainty prevailing in the economy and the loss of confidence are likely to drive the fx (foreign exchange) rate well over VB1000 per US dollar. While the sharp increase in interest rates should benefit intermediation margins, with banks able to get spreads as wide as 40 percentage points, the negative effect on asset quality will be more*

> *significant given the weak loan portfolios. High interest rates will curb customers' capacity to service their debts, driving problem loan ratios in the system up from the 7.1% (including restructured loans) reported at year-end 2001"* (see, Standard and Poors Feb 15, 2002).

OECD (2001) argues that corner solutions are not as crisis-free as is often maintained. The prospect of regional integration invalidates corner solutions as non-cooperative (float) and costly to exit (hard pegs), but it revives the intermediate exchange-rate regime (OECD, op. cit.)

Similar fate befell Guinea, which introduced floating on 1 March 2005. Guinean Franc has free-fallen, losing 38 percent of its value against currencies like the dollar, according to the IMF. Informal money-changers reportedly hawk on the streets of Conakry Guinean Franc.

About floating by least developed countries one can thus expect to witness repeating of similar events. It should be so because a host of fundamental issues remain unresolved in those countries. These, according to a list made by Joshi (2003), include

(1) Floating needs inflation targeting – a task quite beyond the capability a typical least developed country to handle successfully, due to, among others, dominance of fiscal policy there.

(2) These countries lack the financial infrastructure that is appropriate for floating exchange rates. Their financial and foreign exchange markets lack depth. This may amplify exchange rate fluctuations to enormous social costs. These thin markets are potentially subject to manipulation by hedge funds.

(3) Weak or fragile financial credibility of developing countries can arouse market fears of likely irresponsibility on the part of financial authority. This limits heavily flexibility of monetary policy, which, in turn is the main advantage claimed for a floating exchange rate.

(4) Developing countries cannot undertake local-currency-denominated foreign borrowing. Since domestic bond markets are also undeveloped, debt structure becomes over-dependent on unhedged external borrowing. This makes the national balance sheet vulnerable to large exchange rate changes.

Thus, even if floating can be useful for middle- and high-income countries, it might prove be highly volatile and destabilising in countries with underdeveloped financial markets, especially, in those whose banking sectors are weak. Also, in the absence of hedging instruments local companies would be exposed to

exchange rate risk and the already financially troubled state-owned enterprise sector might collapse. *Freely floating exchange rates are particularly harmful to developing countries with underdeveloped financial markets and highly open economies. Compared with the industrial countries, their exchange rates would be more volatile and the availability of financial instruments for hedging against exchange risks would be limited* (Kwan, 2000). The classic objection against floating is that it leaves the system bereft of nominal anchor. A new critique of floating rate is that the latter is volatile in the short term and thus potentially may inhibit trade flows (see, Bernanke, 2004). Bernanke (op. cit.) also note that historically, floating exchange rates emerged in countries where there existed no less worse alternatives.

IMF Annual Report 2005 shows that level of development plays no role at countries' becoming managed or independent floaters. Thus while countries like Somalia and Malawi are having independent floating systems, Singapore, Russia, and Czech Republic are managed floaters. Wickremasinghe (2004) refutes the validity of PPP hypothesis for Sri Lanka. Qayyum et al. (2004), find *a substantial undervaluation of the Pak-rupee vis-à-vis the US dollar* under the managed floating system that it introduced in 2000.

India did revert to managed-floating from independent floating in 2000. Sri Lanka belongs to independent floating regime, under which its economy has not done well. Inappropriateness of independent floating for underdeveloped countries has also been witnessed other countries too. Ecuador lost its sovereignty over a legal tender of its own; it has dollarized. Ghana, Guinea, Guyana, Mauritius, Mongolia, Angola, Indonesia, Zambia abandoned independent floating and moved to managed floating in 2001. Ghana qualified for debt relief amounting to $3,5bn under the heavily indebted poor countries initiative. It also recorded strong growth in foreign investment from $65,37m in 2002 to $88,6m in 2003. Congo and Eritrea abandoned independent floating and moved to some pegged systems.

According to IMF classification, Bangladesh belongs the group of countries whose currencies are subject to *managed* floating. This group is the largest one with, according to 2005 data, as many as 52 members. Its size rose from as low as 27 in 1999.

3. Bangladesh Floats Exchange Rate

On May 31, 2003 Bangladesh replaced its fixed peg arrangement against a single currency (see, IMF Annual Report, 2003) by floating exchange system.

Bangladesh now belongs to the 7th group in the IMF's categorization of countries into groups according to exchange rates in place. The system used by this group is called Managed Floating with no predetermined path for the exchange rate. On May 31, 2003, inter-bank market trading in foreign currency began in Bangladesh. Under the new system "the monetary authority attempts to influence the exchange rate without having a specific exchange rate path or target. Indicators for managing the rate are broadly judgmental (for example, balance of payments position, international reserves, parallel market developments), and adjustments may not be automatic. Intervention may be direct or indirect" (IMF Annual Report 2005).

Bangladesh's move to floating exchange rate system was not warranted by economic condition as such; it was one of the conditions that the IMF wanted GOB to meet in order for her to be able to borrow under PRGF. On May 31, 2003 Bangladesh introduced floating exchange rate. And in June 2003 the IMF's Executive Board approved Bangladesh's request for a three-year arrangement under the Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF). In order to qualify for funds under the PRGF the government had to prepare an Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP). While the latter was on progress the government also had to undertake a series of "belt-tightening" measures in the macro economy in order to qualify for loans under PRGF. *The government launched in June 2003 a comprehensive reform program based on a poverty reduction and growth strategy as set out in our Interim Poverty Reduction Strategy (I-PRSP). Monetary policy was tightened in the second half of FY03 to facilitate the transition to the float* (GOB, 2003).

Thus the development programs of the government were selectively shelved or curtailed to save foreign exchange and boost international reserves. The current account of the BOP was going negative for a couple years preceding the austerity phase; it began to show surplus during the years that followed. International reserves rose close to two billion US dollars. The government had to make fresh promises to the IMF about, among others, privatization of SOEs. The Adamjee Jute Mills was closed. International trade was liberalized further (see, Nag and Salimullah, 2005). Despite all these developments and an I-PRSP ready by April 2003, the IMF did approve loan under PRGF only after Bangladesh switched to floating exchange rate system on May 31, 2003. "The government has been negotiating with the IMF for a multi-million dollar *poverty reduction credit programme*, but the agency said it would only consider the request if the authorities floated the taka by June" (BBC news, May 29, 2003).

Floating system has not been a welcome phenomenon in Bangladesh; arguments opposed to the measure look both substantive and overwhelming. Interestingly, the finance minister himself has been quoted, prior to floating, as saying, "I do not have any rigid stand but the current exchange rate policy is serving us better at least for the time being … The depth and strength of our money market does not suggest that we should opt for a policy which we cannot handle and would create problem for us." *The Daily Star, January 03, 2003.* But it took the minister only a couple of months to change his stand. On April 22nd, 2003, - he said that the government was planning to introduce floating currency exchange rate shortly to promote export against the backdrop of "anti-export atmosphere" in the international arena. "We need it to support our export, which can't be done through subsidy anymore," he told reporters after a meeting with a visiting International Monetary Fund (IMF) mission at his secretariat office here (BSS, April 22, 2003).

A synthesis of the finance minister's statements will only reveal the government abandoned the exchange rate policy that was "serving us better" only because the IMF asked for it. Nothing untoward happened in the said couple of months to transform the international arena into an "anti-export atmosphere". Experts (e.g., Islam, 2003) opposed to Bangladesh's floating emphasize upon such factors as non availability of credible nominal anchor, absence of central bank's independence necessary for, among others, controlling fiscal deficits, absence of competent professionals necessary for predetermining inflation targets, absence of deep and competitive foreign exchange market, absence of sound banking system, low level of international reserves, etc. The government seemingly was not in a position to pay heed to such suggestions.

In June 2003, the IMF approved a loan to Bangladesh of over half a billion US dollars. The IMF got Taka floating; and the government got IMF money.

4. Float Starts to Bite

As mentioned, Bangladesh is a *managed* floater. Under the system Bangladesh can influence the exchange rate, considering such factors as balance of payments position, international reserves, parallel market developments etc. It may be noted that under managed floating system India managed her exchange rate so heavily that the system may be best described as *a "dirty crawl" (see Joshi, op. cit.).* Indian rupee-dollar exchange rate *has exhibited longish periods of stability, punctuated* by crawling depreciations in order to keep the real effective exchange rate roughly constant. A question thus arises as to whether Bangladesh has done

its *managing* right. Available data indicate that the economic agents –consumers and producers— almost did not feel any pinching of the new system until end calendar year 2004. Nominal exchange rate against US dollar showed a small depreciation. It rose from 57.9 to 60.3 between May 31 2003 and December 2004. The monetary authority even would claim credits to the effect that the very shift to floating had *stabilized* the exchange rate.

Since the beginning of the calendar year 2005 nominal exchange rate began to depreciate rapidly. In June 2005 nominal exchange rate rose to about 64; by December was above 66. Early months of the year 2006 saw further erosion of the exchange rate. Business people of late complain that they buy/sell US dollar for Taka 72 to as high as Tk. 74. Monetary authority no longer highlights its ***efficacy*** of having stabilized the exchange rate through moving to floating. Instead, they can now be found to preach that u3nder floating exchange system the government cannot control import prices via intervention in the foreign exchange market. They can also be found to glorify the ongoing depreciation of Taka by attributing to it larger export earnings and foreign remittances.

Neither of the claims, however, seems to be authentic. To quote the Government of Bangladesh, *Monetary policy was tightened in the second half of FY03 to facilitate the transition to the float. Treasury bill rates were raised and reserve money rose by only 4 percent, below program. Nonetheless, private sector credit remained robust, growing by 13 percent in FY03 and the exchange rate has been stable. Given this favorable environment, Bangladesh Bank (BB) began to ease monetary conditions in the first quarter of FY04 to better support growth … With a substantial increase in external assistance, gross official reserves rose by about $1 billion from June 2002 to $2.4 billion (worth three months of imports) by end-November 2003, well above our target* (GOB, 2003). Thus it was *the tightened monetary policy to facilitate the transition to float* and *a substantial increase in external assistance* ***not the movement to floating itself*** that helped the exchange rate to *stabilize* during the months that followed May 2003.

Available data also do not support the monetary authority's claim that the rising exchange rate helped Bangladesh to receive larger export earnings and higher foreign remittances. Table-2 shows that monthly average rate of growth of remittance declined from 2.76 in the pre float period to 2.42 in the post float period despite growth rate of number of persons going abroad rose from 2.42 to 2.55 in the same period. Table-3 shows that export growth rate went negative in 2002, to be followed by a positive single digit rate. During the latest year, 2005, export growth showed a decline. Although the most recent months of the current

fiscal year remittances grew considerably, experts wonder as to what could have caused it.

Course of events reversed during the years since the beginning of calendar year 2004. The Bangladesh Bank eased the monetary policy in the interest of growth as mentioned above. Growth of narrow money M1 and broad money M2, which were respectively 8 percent and 13 percent in 2002, rose to respectively 16.5 and 16.8 percent in 2005 (Table – 4). The government borrowed heavily from the central bank. During fiscal 2005, the government borrowed Taka 3500 from the central bank as against only Tk. 64 crore in preceding year. At the same time inflow of foreign aid fell. According to reports, during the current year Bangladesh received only US $ 500 million in foreign against the committed US $1.5 billion. Bangladesh received a total of US$ 488 million in foreign aid during July-December period of fiscal 2005-06, down from $ 815 million during the same period of the previous year Aid flow is declining gradually due to the government's failure to carry out the conditions imposed by the donors," (Financial Express, Mar 12, 2006). Naturally, floating had to bite. That is, exchange rate's depreciation has been but a consequence of the above events.

Unfortunately, the course of events would look very familiar among concerned observers. Internally, the public exchequer was having hard time consequent upon oil price shock. Administered price of oil has been raised on several occasions of late to public misery. The government wants to take time to raise oil price further. But the donors are stubborn.

It may be remembered that during the structural adjustment era the IMF would keep pressing the government to devalue Taka. Presently, by having compelled the government to go to floating exchange system it has secured one objective seemingly permanently. Devaluation is no longer its headache. The donors reportedly also opine that if the installments of loans are disbursed the government might abuse in the months prior to election. We wonder what else can be a more silly reasoning. The fact of the matter we believe is that even if the government fulfills all the conditions attached to foreign aid, the donors would in one or another pretext refuse to disburse committed funds timely. There are also instances of similar behaviours of donors. In another occasion, during early 1980s the IMF refused to disburse funds committed to Bangladesh despite Bangladesh fulfilled all the conditions attached (see, Matin, 1986). Studies (e.g., Nag and Salimullah, 2005) show that the poverty reduction strategy presently pursued by the government is only nominally different from the previous structural adjustment policies.

Although Bangladesh is entitled under the system of exchange rate policy it is pursuing to intervene according to the economy's priority, as mentioned, she is made to behave as if she belongs the so called independent floater's group. Had the donors disbursed timely the committed funds the country's external reserves, with other things remaining the same, could stand near four billion US dollars, in turn worth nearly five months import. Bangladesh could then be able to intervene properly in the foreign exchange market to the greatest interest of the country.

The ongoing episode, on the other hand, involves all the perils that one could imagine.

The hefty devaluation of the exchange rate will, theoretically, reduce output, employment through both supply and demand sides of the economy (see, Nag, 1990.) Real tax revenue will also tend to decline (see, Nag, 1999).

Aside from these, the de facto independent floating like behaviour of the country's currency will also cost the economy in terms of volatility of macro variables. Volatile exchange rates make international trade and investment decisions more difficult because volatility increases exchange rate risk. According to a study on small island developing countries (SIDS) (Vella, 2005) volatility of the macro economic variables showed considerably higher variations in those countries which floated exchange rates compared to those who did not float. In the appendix we quote from Vella (op. cit.) (Table-5) to compare volatilities of a set of macro variables (measured in terms of standard deviation) with those of the ones in Bangladesh economy. Table-2 compares the pre-float and post-float standard deviation of a number of macro variables of Bangladesh. We see that post-float standard deviations are consistently higher that the pre-float standard deviations.

Bangladesh and the developing countries in the sample in question have considerable amount characteristic similarities. All are price takers in the world economy and have very small share of world trade. Susceptibility to fluctuations of terms of trade is high for both SIDS and Bangladesh. Both have small market sizes and large numbers of small firms. These small firms do not enjoy any economy of scale, so any variability in exchange rate translates into costs. Lack of hedging instruments limits firms' potential efforts to insulate themselves from damages originating from exchange rate fluctuations.

Contents of tables 2, 3, and 4, can be compared with those of table-6 to have a guess about rates of growth in the pre-float and post float periods.

It may be observed standard deviations of interest rate, international reserves, exchange rate, price are higher under floating, reflecting higher volatility of the

variables. The implication is that the economy had to bear the costs. For example, there is a negative relationship between volatility of prices and GDP growth (see, Vella op. cit.). Exchange rate volatility hampers trade flows and thus overall economic activities. Now, the question remains whether the country deserved all these.

5. Concluding Remarks

Floating exchange system is truly a developed country's profligacy. Least developed countries are not viable floaters as of now. Total number of countries practising floating exchange rate has declined during the current decade. However, number of managed floaters has increased considerably. Bangladesh is a managed floater. But it has behaved like one with independent floating. The reason, we argue, is the IMF's influence over the country's economic policy. The consequence has been damaging. We are afraid, unless the country can exercise independence at management of it exchange rate system only more damages await it.

One question, of course, remains as to whether it has been wise to abandon the previous regime that, in turn, was serving the country better according the finance minister himself. Empirical data do not indicate any final location for any particular country, particularly a least developed one. Things at best are changing continuously. None can challenge a possibility of countries returning once again toward intermediate regimes – regimes that have shown signs of being vanished. Bangladesh, it may be remembered was having an intermediate regime prior to the present and also doing better.

References

Bénassy-Quéré, Agnès and Coeuré, Benoît (2000): "Big and Small Currencies: The Regional Connection", (available at http://www.cepii.fr/anglaisgraph/workpap/pdf/2000/wp00-10.pdf).

Bernanke, S. (2004): Remarks by Governor Ben at the Cato Institute 22nd Annual Monetary Conference, Washington, D.C. October 14, 2004.

Cooper, Richard, N. (1999): "Exchange Rate Choices", Harvard University (Available at - http://post.economics.harvard.edu/faculty/cooper/papers/frbb_full.pdf).

Edwards, Sebastian and Savastano, Miguel A. (1999): "Exchange Rates in Emerging Economies: What do we know? What do we need to Know?" Revised version of a paper presented at the Stanford University Conference on "Economic Policy Reform: What We Know and What We Need to Know," September 17-19, 1998.

Eichengreen B. and Hausemann R. (1999): "Exchange Rates and Financial Fragility", Working Paper No. 7418, NBER.

Fischer, Stanley (2001): "*Exchange Rate Regimes: Is the Bipolar View Correct*?" Lecture at American Economic Association Conference, January 6, 2001.

Frankel, Jeffrey (2003): "A Proposed Monetary Regime for Small Commodity-Exporters: Peg the Export Price ("PEP")", John F. Kennedy School of Government, Harvard University

Faculty Research Working Papers Series.

GOB (2003): Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, Dhaka, Bangladesh, December 18, 2003.

IMF Annual Reports, Various Years.

IMF (2000): "Exchange Rate Regimes in an Increasingly Integrated World Economy", An IMF Issues, Brief.htm (http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/062600.htm).

Islam, Mirza Azizul (2003): "Exchange Rate Policy of Bangladesh – Not Floating Does Not Mean Sinking", Keynote Paper presented at dialogue organized by Centre for Policy Dialogue, January 2, 2003

Joshi, Vijay (2003): "Financial Globalisation, Exchange Rates and Capital Controls in Developing Countries", Paper read at a conference organised by the Re-inventing Bretton Woods Committee, Madrid, 13-14 May, 2003.

Kwan, C.H. (2000): "Sayonara Dollar Peg: Asia in Search of a New Exchange Rate Regime", Working Paper, Center for Northeast Asian Policy Studies.

Krueger, Anne O. (2005): "At the Service of the Nations: The Role of the IMF in the Modern Global Economy", Keynote Address, 18th Australasian Finance and Banking Conference (available at http://www.imf.org/external/np/speeches/2005/121605.htm).

Matin, K. M. (1986): Bangladesh and the IMF - An Exploratory Study, *Bangladesh Institute of Development Studies,* Dhaka, Bangladesh.

Nag, Nitai C.(1999): "Macroeconomic Effects of Currency Devaluations: A Case Study of Bangladesh", *The Philippines Review of Economics and Business*.

Nag, Nitai C. (1990): "Tax Revenue Implications of Devaluations: A Case Study of Bangladesh", *The Philippines Review of Economics and Business*.

Nag Nitai C. and Salimullah A. H. (2005): "Structural Adjustment or Poverty Reduction? An Overview of Bangladesh's I-PRSP", *Asian Affairs*, Centre for Development Research, Bangladesh, 55, Dhanmondi R/A Dhaka, 1209 (forthcoming)

OECD (2001): Don't Fix, Don't Float, OECD Development Centre, Aug. 2001.

Qayyum, Abdul; Khan, Muhammad Arshad and Khair-u-Zaman (2004): "Exchange Rate Misalignment in Pakistan: Evidence from Purchasing Power Parity Theory*", The Pakistan Development Review, Volume* 43, Number 4 Part II, 2004**).**

Standard and Poors (2002): "Venezuela's Floating Exchange Rate Could Mean Trouble for Banks", (http://www.standardandpoors.com/europe/francais/Fr_news/Venezuela-Flloating-Exchange_15-02-02.html).

Velasco, Andrés (2000): "Exchange-rate Policies for Developing Countries: What have we learned? What do we still not know?", G-24 Discussion Paper No. 5, UNCTAD.

Vella, Stephanie (2005): "Exchange Rate Strategies for Small Island Developing States", *Bank of Valletta Review*, No. 32, Autumn 2005.

Wickremasinghe, Guneratne Banda (2004): "The Sri Lankan Rupee and Purchasing Power Parity during the Current Floating Period", (Available at - http://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpit/0406005.html).

Williamson, John (1999): "Are Intermediate Regimes Vanishing?", Speech given at the international conference on "Exchange Rate Regimes in Emerging Market Economies", Tokyo, Japan December 17-18, 1999.

Appendix

Table 1 : Number of Countries under different Exchange Rate Regimes

Exchange Rate Regimes	April 30 1999	Dec 31 1999	March 31 2001	Dec 31 2001	April 30 2003	April 30 2004	April 30 2005.
Exchange arrangements with no separate Legal Tender	37	37	39	40	41	41	41
Currency Board Arrangements	8	8	8	8	7	7	7
Other Conventional fixed-peg arrangements	44	45	44	41	42	41	42
Pegged exchange rates within horizontal bands	8	6	6	5	5	4	5
Crawling Pegs	6	5	4	4	5	5	5
Exchange rates within crawling bands	9	7	5	6	5	5	1
Managed floating with no pre-determined path for the exchange rate	25	27	33	42	46	49	52
Independently floating	48	50	47	40	36	36	34

Source: IMF Annual Reports, various years.

Table 2 : Mean and Standard Deviations of Macro Variables

Variables	Mean		Standard Deviation	
	Pre-float	Post-float	Pre-float	Post-float
Money (M1) (n=32)	231.61	314.35	15.01	40.00
Money (M2) (n=32)	935.35	1356.04	97.16	159.79
Domestic Credit Growth (n=31)	7.31	6.15	3.99	3.95
Forex Reserves (n=32)	1418.02	2750.88	241.48	262.03
Exchange Rate (Tk/USD)(n=32)	56.75	61.17	1.60	2.88
Exchange Rate (Tk/Pound) (n=32)	84.54	109.378	5.50	8.14
Exchange Rate (Tk/Yen) (n=32)	0.47	0.55	0.02	0.03
Exchange Rate (Tk/Euro) (n=32)	53.45	74.92	5.30	5.19
Export Earnings (Taka) (n=29)	2924.62	4010.68	384.80	820.15
Import Payments (Taka) (n=29)	3860.45	5561.83	657.57	1149.97
Export Earnings (USD) (n=32)	518.18	710.23	65.10	121.36
Import Payments (USD) (n=32)	684.06	934.27	111.98	143.18
Price Level (CPI) (n=23)	105.62	114.24	2.63	3.87
Interest rate on Commercial Lending (n=32)	12.59	10.82	0.55	0.64
Current Account Balance (n=19)	44.08	5.11	156.78	140.31
Remittances	209.70	314.69	43.82	50.37
Growth rate of Remittances	2.76	2.42	- -	
Growth rate of persons left for abroad	2.42	2.55	- -	
Call money rate	13.82	16.51	7.39	12.04

Source: Calculated by the authors' based on monthly data obtained from Economic Trends, Bangladesh Bank and International Financial Statistics (IFS).

Table 3 : Export Growth

Year	Export (Million USD)	Annual Growth
1998	5161.2	16.81
1999	5312.8	2.94
2000	5752.2	8.27
2001	6467.3	12.43
2002	5986.1	-7.44
2003	6548.4	9.39
2004	7603.0	16.10
2005	8654.5	13.83

Source: Bangladesh Bank.

Table 4 : Growth of money supply

Year	Money Supply (M1)		Money Supply (M2)	
	In Crore Taka	Growth	In Crore Taka	Growth
2000-01	22347.4	12.40	87174.1	16.60
2001-02	24161.1	8.12	98616.0	13.13
2002-03	26743.4	10.69	113994.5	15.59
2003-04	30500.2	14.05	129773.8	13.84
2004-05	35546.1	16.54	151588.5	16.81
2005-06	36559.6	15.39	158722.5	16.93

Source: Economic Trends, Bangladesh Bank. For 2005-06, M1 and M2 figures are seven months' (July to January) average and have been compared with the previous year's seven months' average to calculate the growth rates.

Table 5 : Indicators of Volatility (Standard Deviation)

	Hard Pegs	Soft Pegs	Floating
Terms of Trade	7.5	9.8	14.0
GDP growth rate	4.8	3.4	3.4
Export Growth rate	10.5	11.5	11.7
CPI	13.4	16.5	24.9
NEER	9.7	9.1	24.1
REER	5.2	4.1	9.4
Reserves	16.4	25.4	56.5

Source: Vella (2005)

Table 6 : Average Macroeconomic Performance (%) (1990 - 2002)

	Hard Pegs	Soft Pegs	Floating
GDP growth rate	2.3	3.0	3.1
Export Growth rate	5.1	5.7	3.1
FDI/GDP	9.2	3.0	5.3
Fiscal Performance/GDP	2.0	0.5	-4.2
Inflation rate	2.5	4.0	10.9
Money Growth rate	8.3	10.2	18.2
Interest rate	7.7	6.6	16.1
Unemployment rate	11.0	9.5	9.9
Current Account/GDP	-15.6	-5.1	-2.6
External Debt growth rate	11.0	7.0	3.0

Source: Vella (2005)

Export of Port Services and Private Port in Chittagong

Abul Kalam Azad*

During the days of Adam Smith, David Ricardo and Karl Marx, services were viewed as unproductive and the mention of trade in services was hardly found in economic literature. But those days are gone now. Things have changed dramatically since then. At present, services are recognized to constitute an important sector of the economy no less than agriculture or industry. Not only do services contribute significantly towards GDP and employment in both the developed and developing countries, the use of new technologies has made many services storable, transportable and consequently, tradable. Lately, a large proportion of the world economic transactions is taking place in the service trade[1].

Again, services may be divided into those consumed directly and those used as intermediate inputs. These input services play a much more complex and important role in the development process than is suggested by their direct contribution to GDP and employment-creation. This is reflected in the inter-linkages between services and the rest of the economy[2]. Production and export in agriculture, industry and services sectors require many infra-structural services like port, transport and storage, utilities, telecommunication besides banking and insurance. The lack of access to adequate and efficient services is considered as an impediment to economic development of the developing countries. National efficiency and international competitiveness of a country depend on the availability of adequate infrastructure services. This makes the efficient supply of services important in any economy. The efficient supply of services, in turn, is linked to production of and investment in services by government and private enterprises, both local and foreign. In this paper, we look at the importance of port services and of the Chittagong Port in the economy of Bangladesh; the latter's current and prospective uses; the organization of production and the cost of supply of port services in the Chittagong Port along with its impact on the economy and finally we suggest ways to improve the situation. We, however, begin with a brief historic profile of the Chittagong Port.

* Professor, Dpartment of Economics, University of Chittagong, Chittagong.

A Brief Historical Account of the Chittagong Port

It is difficult to say exactly how old the Chittagong port is. But it can be said without doubt that this port is as old as the land is. It is learnt from the writings of the Roman, Greek and Arab sailors and geographers that the Chittagong port was established about two thousand years ago. History testifies the fact that by age and prosperity, this port was one of the oldest elite ports of the world. Historians unanimously admit that since 200 B.C., the pre-Islamic Arabs of Yemen and Babylon dominated and conducted the international trade between Arab, Abisinnya (Ethiopia), Yemen, Assyria (Syria, Iraq, Iran) Greece and Rome in the West and China in the east through ports like Ceylone, Malabar, Kalikot, Java, Sumatra etc. including Chittagong. This domination of the Arabs on the sea route continued till the arrival of Portuguese in 1500 A.D. in Chittagong[3].

The Portuguese and the Arakanese established supremacy over Chittagong for some time before the conquest of Chittagong by the Mughals in 1666. The English East India Company made a failed attempt to capture Chittagong in 1685 when they were beaten back by the Mughal army. The English instead settled at Sutanati—the present Calcutta. They were however back to Chittagong in 1761 when it was conceded to them by Nawab Mir Quasim. Although Chittagong was the biggest port of Bengal, the English had invested a lot of time and resources by then in building Calcutta that was to become the capital of British India later on. In the following 200 years of English rule, the East India Company/British Royal Government favored Calcutta over Chittagong and the latter was developed, if at all, only as a 'second fiddle'. It was only after the partition of India in 1947 that the Chittagong Port was rebuilt and developed as the principal port of this country.

The short historical background of the Chittagong Port has been described above just to remind ourselves the fact that this port, more than two thousand years old, once enjoyed the status of an important international seaport linking the West and the East. It is a matter of great regret that the port that once served as the 'entreport' for the whole region now-a-days cannot even serve this country efficiently.

Importance of the Port Services and the Chittagong Port

Port or harbor services are directly related with the export and import trade of the country. Presently almost 99% percent of our export trade and more than 90% of our import trade are carried out by sea route and hence depend on port services[4].

Again, the trade-intensity index of our economy, given by the ratio of volume of trade vis-a-vis total GDP, increased over the years. This index was about 31%in the year 1999- 2000. This means that the port services are directly related with an amount of out put as large as almost the one third of our national output.

The Chittagong port, as the largest seaport of Bangladesh, handles 80% our import trade and 75% of our export trade[5]. Besides, the volume of cargo-handling in the Chittagong port shows a direct and positive correlation with the growth of GDP of the country. Between 1992-93 and 2001-2002, average annual growth of our real GDP was roughly 5% and average annual growth of cargo handling in the Chittagong Port during the same period was about 10% (Table I). This means that cargo-handling in the Chittagong Port grew twice the growth rate of GDP. So in the future, our drive to achieve higher growth rate will necessarily require larger and larger capacity of cargo handling in the Chittagong Port.

Thus we see that the port service plays an overwhelming role in our economy and the Chittagong Port plays the largest role in that act.

Present and Prospective use of the Chittagong Port

Presently the Chittagong Port and its services are used for handling our exports and imports only. While the service content of the Chittagong Port in our imports

Table 1 : Growth of Cargo in the Chittagong Port and GDP

Year	Volume of Cargo (Thousand M. Tons)	Year-to Year Growth	GDP (Million	Year-to-Year Growth
1992-93	7616	8.23	1455680	4.57
1993-94	7897	3.69	1515140	4.08
1994-95	10278	30.15	1589760	4.93
1995-96	10301	0.22	1663240	4.62
1996-97	10554	2.46	1752850	5.39
1997-98	11087	5.05	1844480	5.23
1998-99	13903	25.40	1934290	4.87
1999-00	15141	8.90	2049280	5.94
2000-01	16907	11.66	2155060	5.16
2001-02	17748	4.97	2258480	4.80

Source: Bangladesh Economic Survey 2002, Min. of Finance, GOB.

may beregarded as our domestic consumption, the same content in our exports may be viewed as our export, that is, export of port services.

But we can export this service of the Chittagong Port in at least two more ways:

Presently, we export this port service embodied in our exported commodities. But we can also allow other countries like Nepal, Bhutan, India, (particularly, landlocked seven sisters of north-east India) to use our port facilities on payment of service charges.

Alternatively, we can import commodities from other countries using our port facilities and re-export them to a different set of countries. In this way also we can export our port services in embodied form in commodities that are neither produced nor consumed by us[6].

But the use of port services in general and that of the Chittagong Port, in particular, for both domestic consumption and export purpose depends on the efficiency of service supply in the Chittagong Port.

Efficiency of Service supply in the Chittagong Port

If we look at the increase of revenue, expenditure and cargo volume, we find that all of them increased at roughly the same average rate per annum (revenue increased by 11.3%, expenditure increased by 11.2% and the volume of cargo increased by 10.1%) between 1992-93 and 2001-2002 (Table 2). Consequently, the staggering high operating cost/revenue ratio, instead of showing any declining trend as expected by some people, maintained an almost constant ratio. This is further reflected by the fact that the cost of handling per ton of cargo remained almost the same between 1992-93 and 2001-2002 (Tk. 188 per ton in 1992-93 and Tk. 184 in). To be more specific, the operating cost/revenue ratio never declined below 63% and went up as high as 77% between 1992-93 and 2001-2002. In input-output terms, this means that most of the value of port services was used up as costs of production of output.

However, from the national point of view, the cost of output of the Chittagong Port is even larger than what is actually incurred by the port. According to a study by Hossain, the illegal rent-seeking in the Chittagong Port was as high as 1.7 times the revenue earned by the Chittagong Port in the year 1999-2000[7]. In nominal monetary terms this means that the nation had to spend about Tk. 11352 million for producing an output of only Tk. 4204 million.

Table 2 : Revenue, Expenditure and Volume of Cargo

Year	Revenue (Million Taka)	Expenditure (Million Taka)	Volume of Cargo (Thousand M. Tons)
1992-93	1875.8	1434.4	7616
1993-94	2055.6	1571.3	7897
1994-95	2604.0	1963.2	10278
1995-96	3158.6	2234.6	10301
1996-97	3243.1	2133.3	10554
1997-98	3452.2	2427.2	11087
1998-99	3745.1	2621.7	13903
1999-00	4204.3	2983.5	15141
2000-01	4770.0	3022.8	16907
2001-02	4795.2	3258.9	17748

Source: Bangladesh Economic Survey 2002, Min. of Finance, GOB.

The Lost Production in the Chittagong Port

The principal activity of a port is connected with the 'loading' and 'unloading' of cargo from the ships carrying goods in and out of the country. It has been estimated that the average turn-around time for every ship visiting the Chittagong Port is at least 6 days which should be normally no more than 2 days. This means that if the port operation was run efficiently, the Chittagong Port could handle 3 times larger amount of cargo than what it handles presently.

Since, at present, the yearly output of the Chittagong Port is about Tk. 5000 million, so the lost output of the port due to higher turn-around time may be given as 5000X2 = 10000 million taka. The rent-seeking by the unscrupulous employees and workers has been estimated to be about 10000 million taka. So the total production loss of the Chittagong Port stands to be (10000 + 10000=) 20000 million taka annually.

If we add the total annual production-loss with the cost incurred by the Port Authority (4204 million taka in 1999-2000), the total national costs of output (services) of the Chittagong Port stands to be 20000 + 4204 = 24204 million taka. The total production-loss is paid, directly and indirectly, by all the users of the port. The total value of export and import in 1999-2000 was about 620000 million Taka. The national cost of port services for handling the total volume of export

and import was about 24204 million taka which is about 4% of the total value of export and import. So we can conclude that the price of both our exports and imports increases by at least 4% because of inefficiency in the Chittagong Port.

The exorbitantly high operating cost incurred in running the operation of the Chittagong Port (Table 3) naturally leaves very small net surplus. Table IV shows the amount of profit deposited in the Government treasury on the account of Chittagong Port in various years. Leaving all other investment on infrastructure aside, if we consider only the value of the total land area of the Chittagong port, the rate of return will be very insignificant. Simple bamboo-huts built on this land would have fetched more revenue as rent for the Government/country!

The reason for inefficiency of the Chittagong Port in terms of input-output, cost-structure and asset-return ratio may be looked into the organizational structure of the Chittagong Port as an individual production unit.

An Analysis of the Chittagong port as an individual Production Unit

Table 3 : Revenue, Expenditure and Operating Costs

Year	Revenue (Million Taka)	Expenditure (Million Taka)	Operating Cost Ratio
1992-93	1875.82	1434.40	.77
1993-94	2055.63	1571.30	.76
1994-95	2604.00	1963.20	.75
1995-96	3158.63	2234.60	.71
1996-97	3243.10	2133.30	.66
1997-98	3452.22	2427.20	.70
1998-99	3745.08	2621.70	.70
1999-00	4204.30	2983.50	.71
2000-01	4770.00	3022.80	.63
2001-02	4795.20	3258.90	.68

Table 4 : Profits Deposited by the Chittagong Port in the Govt. Treasury (million Taka)

Year	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02
Profit	50	200	200	200	350	400	-	00	500

Source: Bangladesh Economic Survey 2002, Min. of Finance, GOB.

Simple microeconomics says that an individual business firm producing goods/services will try to maximize its profits. Chittagong Port catering port services will be no exception to it. In a competitive situation, a firm not only tries to reduce costs of production by technical innovation and restructuring, it also resists any move by labors to raise wages and, thereby, costs. Again a firm can try to maximize its profits by raising price of its products/services or by reducing costs of production or by both. When a firm sells in a competitive market, its scope for raising the price of its product is limited because if it raises price, it risks losing customers. In such cases, the option left to the firm for maximizing profit is to reduce costs of production. And this is good for the producer as well as the consumers and the nation. The producer benefits from the increased margin of profit, the consumers benefit from the reduced price and the nation benefits from lesser use of resources for producing a given amount of goods/services.

But in the case of monopoly, the firm does not have to be afraid of losing customers. So it can go for raising prices if it wants to maximize profits. Not only to maximize profits but to avoid any erosion in profit margin also, the firm will raise price in response to any wage increase by the workers and employees.

This is how Scitovsky tried to explain inflation in his Market Power Theory[8]. According to him, producers with dominance or monopoly power in market find it more convenient to raise the price of product instead of resisting demand from workers for higher wages. Consequently, instead of traditional antagonism between the producers and workers (because of conflicting interest), we see an "unholy alliance" of the producers and workers who use their monopoly power to exploit the consumers and the nation.

And this is exactly what has happened in the case of Chittagong Port. But that is not enough. The situation, here, is even worse. In the case of private monopoly, the monopolist producer at least tries to maintain his own profit margin. But, since the Chittagong Port is a state monopoly, here the government does not prefer to raise the price of services supplied, instead it concedes its own share to the workers and employees. This is what reflected in the very little contribution made by the Chittagong Port to the national exchequer. Though the government as the owner of the port does not go for raising the price of port services, the workers and employees do not stop. They do not mind going after the users of the port for illegal rent seeking, taking advantage of the monopoly position of the Chittagong Port.

But, is the Chittagong Port a Perfect Monopoly?

No, it is not. Though the Chittagong Port has got some captive users, a lot of potential users are barred from using the port services because of its direct and indirect, legal and illegal high costs of services. Not only that, it may even lose some of its present users to its competitors, if things change. Who are the competitors of the Chittagong Port? We can think of at least two—-one within our border and another outside the border. Mongla Port in the south-west of our country could be a potential competitor for the Chittagong Port. But its small size and inefficient organizational structure (same as that of the Chittagong Port) prevent it from becoming a real competitor of the Chittagong port. The other rival of the Chittagong Port is the Calcutta Port. Chittagong Port could provide port services to producers and consumers of the nearly land-locked seven sisters of northeast India. Barring the government policies of India and Bangladesh, the factor that keeps the port-users of this region locked to the Calcutta Port is the inefficiency of the Chittagong port. And this may not be the end, things may turn even worse. If mismanagement, inefficiencies continue to rule the operation of the Chittagong Port and if the Indian government decides to seize the opportunity of allowing transshipment of cargo to Bangladesh through Calcutta Port, Chittagong Port may even lose many of its present users. And, no one will deny that it will spell disaster for our country.

The Way Out

In order to avoid the possibility of such disaster and undesired consequences, we need to reorganize the supply of port services and the present system and scope of operation of the Chittagong Port in order to increase its efficiency. The reorganization of the supply of port services in Bangladesh should be such that the Government should not be the sole supplier of this service. Both private and public sectors should supply port services. Next, the Chittagong Port should be allowed to cater the needs of not only the users from Bangladesh but also users from the entire region in the neighbourhood of Bangladesh.

The first measure to involve private sector in the supply of port services will be to encourage private investors to set up private ports in Chittagong at suitable locations (and also in Khulna). Besides, Mongla Port may be leased out to the private sector on a free, transparent and open auction basis. Next, while keeping the management of a number ‘jetties’/ terminals reserved exclusively for the Chittagong Port Authority (CPA), others may be leased out to private agencies. This will create an atmosphere of healthy competition between the private and

public suppliers, thereby increasing the efficiency of supply of the port services.

As for allowing the Chittagong Port to serve the users from outside the national boundary of Bangladesh, we may at least adopt the trading arrangement suggested by the present author in another article [6] if direct transit or transshipment of goods to and from other countries in the region through Chittagong Port is not desired. We should not for get the age-old adage of the international trade theory that 'some trade is better than no trade'.

It may be recalled here that when Chittagong was a 'porte Grande', Sutanati—-the present day Calcutta was mere a fishing village. The persisting inefficiency of the Chittagong Port goes only to the advantage of its competitor in Calcutta. Those who want to save the Chittagong Port by stalling the introduction of private port services in Chittagong should better realize that their actions help only perpetuate the inefficiency of the Chittagong Port and, thereby, will ruin it ultimately. Instead of trying to save the Chttagong port, they should rather be eager to ensure the uninterrupted and efficient production and supply port services in Chittagong for domestic users as well as users from the neighbouring countries. In the end, only will this make Chittagong the real 'porte Grande.The perpetuation of inefficiency in the Chittagong Port will only help its 'arch rival' in Calcutta.

So, we may conclude by saying that those who discover the 'Cronies of Clive'[9] among the supporters of private port in Chttagong should better be watching for the 'Chellahs' of Yagat Shett[10] among their ranks and files.

References

1. The international trade in services stood at nearly 1000 billion US dollar and accounted for about 20% of all international transactions in 1993. Vinod Reggie, *Business Guide to the Uruguay Round*, International Trade Centre, UNCTAD/WTO, 1995. pp. 255, 290
2. UNCTAD, 'Services and the Development Process', Document No. TD/B/1008/ Rev1, pp.1- 8.
3. Haq, Abdul, *Shahar Chhattagramer Itikota* (History of Chittagong City), Chittagong.1985, p. 42
4. Min. of Finance, GOB. *Bangladesh Economic Survey* 2002, pp.86,87,89
5. Ibid. p.87
6. Azad, A.K., "Converting Services trade between Bangladesh and India into Commodity trade: A Mutually beneficial Alternative", *Bangladesh Journal of Political Economy,* Vol. XVI, No.1, 2002.
7. Hussain, B. "Chittagong Port : Potentials, Performance and private Sector Participation in Globalized Situation", Working Paper No. 1, BIDS Millennium Series, Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka, November 2002.
8. Scitovsky, T. "Market Power and Inflation", *Economica*, Vol. XXXXV, No. 179, 1978, pp. 221-33
9. Unfortunately, the patriotic zeal and emotion on this controversial issue sometimes run so high that people opposing the privatization of Chittagong port even do not hesitate to compare the supporters of privatization scheme with the collaborators of British East India Company and its Commander Colonel Clive who engineered the demise of Independent Bengal in 1757.
10. Yagat Shett was one of the most infamous architect of the Plassey conspiracy that saw the sowing of seed of the British colonial rule in Bengal (later on in entire India) in 1757.

Globalization of Maritime Commerce: The Rise of Hub & Mega Ports and The Importance of Chittagong

Ataul Karim Chowdhury*

> *Globalization is the inexorable integration of markets, nation-states, and technologies to a degree never witnessed before-in a way that is enabling individuals, corporations and nation-states to reach around the world farther, ,faster, deeper and cheaper than ever before* ——— Sam J. Tangredi

Containerization, telecommunication, globalization and privatization are among the most important recent trends that have affected shipping & maritime trade.

Current trend & future look

In an era of economic globalization, ports are evolving from being traditional interfaces between land and sea to providers of complete logistics networks. The momentum of this trend is creating a port shakeout, leading to the development of a sharply delineated hierarchy on a global scale. Ports are being increasingly differentiated by their ability to handle the latest generation of container ships coming on stream. With the trend toward even bigger container ships, fewer ports are becoming capable of handling them. As a result, the flexibility of the world sea borne trade flow is becoming increasingly constricted-particularly in the event of a natural or man-made crisis or disturbance.

Trends in Maritime Transport and Port Development in the Context of World Trade Structural changes in international trade and the evolution of maritime transport have a direct impact on port growth and expansion. Therefore, these elements and their recent characteristics must be examined. These factors also determine future port development. Globalization, production, trade, and ports. Globalization, or the expansion of markets and hence of the economic prospects

Executive Director, HRC Shipping Ltd.

of societies, is taking place not only because of the supra-national nature of market, but also because of the flow of foreign investment and the strategies of multinational enterprises. These multinationals today account for two/thirds of global exports of goods and services and nearly 10% of domestic sales worldwide.

In this environment of increasing interdependence in the world, the international division Pf labor is changing as a result of structural changes in trade and unprecedented mobility of international capital. However, while the integration of goods and services and capital is progressing at a rapid pace, integration of the labor market is much slower. In addition, ever more sophisticated technologies are being disseminated, in a framework of spectacular streamlining in communications and telecommunications. The development of information technology has, in turn, boosted productivity and, in many cases, worker income. In general, electronic transactions and communications technology have been the necessary complement to full internalization and globalization and their major impact on production and world trade.

Fragments of maritime History

It is commonly claimed that the wheel is the greatest invention in history. Yet, common sense suggests that water transport was a reality before wheeled vehicles became important, something which is confirmed by archeology. Water transport with a history of more than 5,000 years is an integral part of civilization itself, and the world of shipping has a unique place in the history of mankind. Without it the world might have been nothing more than a quilt of isolated tribes confined to survive on whatever local resources they could find. It is difficult to even imagine that science and knowledge could develop very far in a world without water transport.

The first development of major sea routes on a regular basis took place during the Renaissance and expanded rapidly during the industrial revolution. The following quote from Sir Walter, Raleigh, succinctly sums up the prevailing view on shipping as the 17"' century began:

> *Whosoever commands the sea commands trade; whosoever commands the trade of the world commands the riches of the world, and consequently the world itself*

Shipping was not only for adventurers and traders. It attracted the interest of Kings and Emperors, of philosophers and intellectuals. What Adam Smith (1776) did for our understanding of markets and industry late in the 18th century, Richard Hakluyt (1589) had done for trade and shipping two centuries earlier. His

monumental *The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation* (1589-1600) was written to be useful to merchants and entrepreneurs and ~to-influence -the direction and nature of public policy and indeed played a significant role in 16"' century England.

Shipping was seen as much more than a means of transport, and was linked to broader concepts of technology and growth. Francis Bacon (1605) observed in *Advancement of Learning* "The proficiency in navigation and discoveries may plant also an expectation of the further proficiency and augmentation of all sciences". Almost three centuries later (1870), Emerson, the American poet and philosopher, expressed similar thoughts: "The most advanced nations are also those who navigate the most".

These fragments of maritime history remind us that there is something so profoundly fundamental about maritime transportation that it has no direct parallel in other industries. Shipping has shaped and formed, not only entire economies and world trade, but also cultures and cooperation between peoples. Merchant shipping developed and existed for centuries as a political, military and economic instrument.

After World War 11 there came a period when shipping appeared to be on the decline. Following tile introduction of commercial jet aircraft in the late 1950s, proud ocean liners were soon eclipsed by air travel. The merchant marines of most Western countries declined and as ports moved away from city centers, ships literally disappeared from view. Yet shipping was there all alone and rather than being displaced by the emerging globalization, it contributed in a major way to make globalization possible.

Shipping as an Agent of Change

Globalization is said to be the collapse of time and space. Today's communication systems allow instant contact between businesses around the world and intermodal transport has so reduced the importance of freight charges for manufactured goods as to practically eliminate the effect of distance.

As a result, major shifts have taken place in the global location of manufacturing. This trend accelerated with the opening of China and its Special Economic Zones in the 1980s. These zones are no longer called 'special' as practically all of China turns into one giant factory. The new industrial giant that China has become is often compared to 19" century United States. An almost inexhaustible supply of labor keeps wages low yet falling prices keep demand high and growing at the

present time there is even talk of the possibility of global deflation and invariably China's enormous industrial capacity is mentioned as an important contributing factor to that possibility.

The Economist of London has described today's world as 'as single machine' and goes on to say that "Rich countries worry that manufacturing is passing into the hands of poor countries." It concludes that this is indeed the case. World production of textiles is cited as an example. In 1975 China produced about ten percent of the world's textiles. By 1997 this share had increased to more than 20%. During the same period the United States went from being the top producer to being, second and saw its share of the total decline significantly.

Developing countries have gone from being exporters of raw materials and inexpensive handicraft to becoming major players in world markets for manufactured -goods. In 1980, 42% of merchandise exports from such countries in Southeast and East Asia were manufactured goods. By 1998, this share had nearly doubled to 82%, the same level as in high-income countries.

When Malcom McLean introduced highway containers in water transport on a limited scale in the 1950s, nobody could foresee the impact this would subsequently have on the structure of world trade. This new form of intermodal transport did much more than simply, change the way of carrying industrial goods. Starting in the 1970s, maritime containerization became a logistics tool that dramatically affected location of manufacturing industries around the world. What camels and clippers had done for silk and spices during the Middle Ages, and bulk carriers did for raw materials during the first half of the 2 01h century, container vessels are now doing for manufactured goods.

Historically, countries traded with their neighbors and only a small part of world trade was over long distances. Most goods could simply not justify the high cost of long distance transportation. Two developments have, contributed towards making long distance trade possible in manufactured goods on a large scale. First, value added marketing, the use of lighter materials and miniaturization of many products have resulted in higher product value per cubic foot or unit of weight. This is as true for cellular phones as for coffee pots.

Second, there has been a dramatic leap in the productivity of maritime transport services for manufactured goods. Containers now move 'seamlessly' from factory floor to port, across the ocean, and then inland at destination, continuing all the way to the customer's warehouse. This represents an enormously simplified operation compared with the old-fashioned break-bulk systems, which required individual packaging, handling, stowing etc. of each item shipped. Tile transition

from traditional break-bulk operations in pre-container times to multimodal through transport can be compared with the transition from forge to factory or from 'job shop' to 'flow shop'.

Not all regions and countries have benefited equally form globalization and containerized ocean transport. For both goods transport and telecommunications, *volume,* not distance is the key. The large container routes of the world are the (global highways - a true interstate system of the oceans - but these routes are limited to a few strategic corridors, which call generate enough traffic to support large capacity intermodal systems. Despite Marshall McLullan's catchy phrase about the global *village* it does not exist. Global highways favor regions of large concentrations of population, travelers and goods. Much remains to be done to facilitate access to global systems for regions that today are peripheral to the global highways.

There are important questions to be explored concerning the regional and local impact of containerization on trade and the world economy. This brings it's to questions of national shipping policy *and globalization.*

Changes in container terminal operators. With the expansion of the container industry, the structure and organization of terminal operations have changed. Today there are three categories of container terminal operators: (i) port authorities that have decided to become directly involved in handling containers, such as the public ports of Singapore and the Virginia Port Authority or the private ports of Felixtowe or Freeport. However, this category has been on the decline with the emergence of port corporations; (ii) private port terminal operating companies involved in a process 'of concentration, including stevedoring. The 15 main operators have expanded their activities outside of their ports of origin, associating themselves with large stevedoring groups (e.g. PSA Corporation, Hutchinson, ECT, P&O Ports, and SSA); and (iii) the shipping lines that have decided to control and manage their own container terminals. This decision was made for two main reasons. The first was for strategic reasons, because these global transporters are involved in hub and transshipment ports and therefore need to control their operations, including docking priority and guaranteed availability of equipment for use. The second was to reduce costs, i.e. for savings, based on economies of scale and better control of terminal expenses.

Bangladesh the historical perspective of regional integration. Prior to 1947, the -region comprising, the North East of India had substantial economic and social intercourse with the neighboring countries. East Bengal (later called East Pakistan

and ultimately Bangladesh) was well integrated with the North East. There is evidence that trade and migration into territories today comprising Tibet, Myanmar, Yunnan province of China, Nepal, Bhutan and Sikkim were important to the economy of the region.

However, partition and independence ended whatever remained of this intercourse. The partition transformed the region at the crossroad of emerging Asia, into a landlocked outpost of a large continental economy. The huge landmass comprising the seven states (Assam, Arunachal, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura), approximately 225,000 sq. km., was now cut off from its hinterland by the creation of Bangladesh. Linked by 37 km. wide Siliguri corridor with the rest of India, it soon lost its natural advantage as its integration with the economy in the south and the west was disrupted by trade and industrial policies pursued by independent India.

It needs to be emphasized that the physical infrastructure for facilitating trade and economic links between the North East Indian states and the neighboring countries is lamely absent. Indeed, one can argue that the links are weaker today than they were in 1947. The Stilwell Road is now a mere muddy track and the rail links with Bangladesh stand severed. Infrastructure bottlenecks and delays at border points add substantially to the transaction cost in international trade.

The environs of Chittagong & Mega port development

The role and significance of ports has changed dramatically during the past decade and today they have a much higher profile both economically and technically in maritime and international trade. Not only is the port a link in international transport chain, but also many of the major ports such as Rotterdam, Singapore and Hong Kong have become trading center.

The development of the free trade zone situated in the port environs offers to international entrepreneur a range of industrial and marketing benefits which are difficult to find elsewhere. These include: unrestricted international exchange of goods, free of Custom duty or examination until leaving the area, excellent distribution access to the Port's global/regional maritime services and overland infrastructure systems, low land

Rents and favorable tax breaks and availability usually of high-tech low cost labour and Immediate access to local and regional markets with less risk of trade impediments. Overall, the FTZ enables companies to import products/ components for assembly, Processing, labeling and distribution to neighboring markets or for dispatch to more distant ones.

The vision was rightly explained by Professor Mohammad Yunus as *"Mega-port at Chittagong is the key to making Bangladesh the cross-road of the region. With the economy of the region growing at a sustained high speed, demand for the access to a well equipped well managed port will keep on growing. A region, which includes two giant economies, will be desperately looking for direct shipping facilities to reach out to the world. Chittagong will offer the region the most attractive option. Evan today despite the problems of present Chittagong port, Kunming is requesting permission to utilize this facility.*

With global competition becoming more fierce shorter and shorter lead time for delivery will become magic formula to attract business. An efficient mega port at Chittagong will be in high demand. This port can be built and owned by national or international company with government participation in equity. It can contract out the management of the port to a professional port management company. "

Conclusion

A key effect of economic globalization is the continuing increase in maritime trade and traffic. While the new economy that helps fuel globalization is knowledge-based, the fact is that knowledge needs to be transformed into goods and services. These goods and services need to be transported internationally. While personnel may travel by air, most goods can travel economically only by sea. If globalization indeed results in an increase of world trade and cross-border networks and flows. it will necessarily result in an increase in maritime traffic.

In the coming years Bangladesh should strive for a surge of foreign private investment in power, as telecommunications services and ports. More reliable supplies of power. Gas, telecommunication, transportation and port facilities would support the accelerated growth of industry and agriculture. Private participation in these sectors is just starting and Bangladesh needs to provide credible assurances to investors that their efforts will not be thwarted by bureaucratic process, lack of adequate resolve in implementing declared policies or regulatory stranglehold. Quick, effective implementation of port reforms could help mitigate a major constraint for the export-led growth which Bangladesh wants to pursue.

Let's make Bangladesh the cross-roads of the region —- Professor Mohammad Yunus.

Notes

Professor Muhammad Yunus “Growing up with two giants” New Age, Feb 45.2006

Sushil Khanna “Economic opportune ities or continuing stagnation”11M Calcutta.

Carlos M. Gallegos. “Trend in Maritime Transport and Port Development in the context of World Trade”

Sam J.Tangredi “Globalization and Sea Power: Overview and Context”

হালদার মৎস্যক্ষেত্র ঃ বিপর্যয়ের মুখে একটি বৈশ্বিক উত্তরাধিকার

মু. সিকান্দার খান*

সারসংক্ষেপ

হালদা নদীর মৎস্যক্ষেত্র রুই কাতলার পোনা উৎপাদনের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু পোনা উৎপাদন ১৯৪০ এর দশকের তুলনায় এখন ১/২১ অংশে নেমে এসেছে। মৎস্য উৎপাদনেও ধস নেমেছে। নদীতে মাছ ধরতে কোন প্রকার আদায় দেয়া অথবা অনুমতিপত্র নেয়ার আইন বলবৎ না থাকলেও কার্যতঃ মৎস্যজীবীদের স্থানবিশেষে মাছ ধরার জন্য আদায় দিতে হয় সরকারী এবং বেসরকারীভাবে হালদা নদীর উপর অনেকবার হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু এর বিরূপ প্রভাব কোন পক্ষই বিবেচনায় আনেননি। হালদার মৎস্যজীবীরা বাংলাদেশের অন্যান্য আভ্যন্তরীন মৎস্যক্ষেত্রে নিয়োজিত মৎস্যজীবীদের মত সমাজের নিম্নস্তরের লোক এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রায় সম্পদহীন দরিদ্র। প্রথাগতভাবে সংরক্ষণ নিয়ম পালনে অনভ্যস্তনতুন একশ্রেণীর মৎস্যশিকারে আগমনে নদীতে ক্ষতিকর জাল ও যন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে গেছে। ঐতিহ্যবাহী জেলেদের মধ্যেও তা দ্রুত সংক্রমিত হচ্ছে। ডিম সংগ্রহকারীদের মধ্যে মাছের যত্ন এবং পোনা ব্যবসায়ে সততা উপেক্ষিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় হালদার মৎস্যক্ষেত্র ২০০২ সালে সংশোধিত ১৯৫০ সালের মৎস্য নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ দ্বারা পরিচালিত। আইন প্রয়োগে সরকারী আয়োজন ও ঐকান্তিকতার ঘাটতি এবং আইন প্রতিপালনে সংশিষ্ট পক্ষগুলির অমনযোগের ফলে হালদার মৎস্যক্ষেত্র আজ ধ্বংসের মুখে। কিন্তু হালদার মৎস্যক্ষেত্র পুণরুদ্ধার এখন সরকারের মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি উন্নয়ন লক্ষ্য। হালদার সকল স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের বিভিন্ন হ্রদ ও নদীতে পরিচালিত সমাজিক মৎস্য প্রকল্পের আদলে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানই এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সাফল্য বয়ে নিয়ে আসতে পারে।]

হালদা নদীর মৎস্যক্ষেত্র

নদী মাতৃক বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের একটি প্রধান নদী হালদা। উৎপত্তিস্থল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়নগরে। চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার আন্ধারমাণিক সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। মোটামুটি উত্তর থেকে প্রায় ৫০ কি.মি. এলাকা জুড়ে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে কালুরঘাটের নিকট কর্ণফুলি নদীর সংগে মিশেছে। উত্তরে ফটিকছড়ির কিছু অংশ পার হয়ে নদীটি একদিকে (বাম) রাউজান এবং অন্যদিকে (ডান) হাটহাজারী এবং সর্বশেষে চান্দগাঁও থানার কিছু অংশ জুড়ে বিস্তৃত। প্রতিবছর বর্ষায় উপরের পাহাড়ী অঞ্চলের প্রভূত জলরাশি সাগর সঙ্গমে বঙ্গোপসাগরে ধাবিত হয়ে এই নদীতে তীব্র স্রোতের সৃষ্টি করে।

অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

গতি পথের প্রায়বৃত্তাকার বিশেষ বিশেষ অংশে এ জলরাশির ক্ষুরধারা ঘূর্ণির আকারে প্রবাহিত হওয়ার ফলে মৎস্য প্রজননের জন্য এক প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় । হালদার সকল অংশ এবং সংলগ্ন অন্যান্য নদী (চানগালী, সাংগু, কর্ণফুলী) থেকে এ সময় এ প্রজনন ক্ষেত্রে মা মাছদের আগমন ঘটে । এপ্রিলের শেষাংশ থেকে জুন মাস অবধি বিভিন্ন সময়ে কয়েকবার এ নদীতে কার্প গোত্রীয় মাছেরা ডিম ছাড়ে । সেখান থেকে নিষিক্ত ডিম আহরণ করে নদীর ধারে বিশেষভাবে নির্মিত মাটির খাদে দেশীয় প্রযুক্তিতে মাছের রেনু পোনা ফুটানো হয় । প্রাকৃতিক উৎস থেকে ইন্ডিয়ান কার্প গোত্রের মাছের নিষিক্ত ডিম আহরণ ও পোনাফোটানোর ব্যবস্থা উন্মুক্ত পরিবেশে আর কোথাও আছে বলে জানা নাই । হালদা বাংলাদেশের বৈশ্বিক উত্তরাধিকার ।

এখানকার রেনুপোনা পুকুরে লালন করে স্থানীয়ভাবে মাছের অঙ্গুলী পোনা তৈরী করা হয় । তখন এ পোনা মৎস্য চাষের জন্য পুকুরে ছাড়া যায় । অতীতে হালদার পোনা বাংলাদেশ অঞ্চলের শতকরা আশি ভাগ মৎস্য চাষের চাহিদা মিটাত । কিন্তু ১৯৫০ এর দশক থেকে এ প্রজনন ক্ষেত্রটি বিভিন্নভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে । ফলে এখানকার পোনা উৎপাদন দারুণভাবে বিঘ্নিত হয় । একটি হিসাব অনুযায়ী উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৪৫ সালে ২৪৭০ কে.জি. থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০৫ সালে ১২০ কে.জি.তে দাঁড়ায় । মৎস্য প্রজনন ছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ও হালদার বিশেষ অবদান রয়েছে । বোয়াল, পাঙ্গাস, আইড়, পাবদা, টেংরা, গলদা, ফাইস্যা প্রভৃতি মাছের জন্য এ নদী নিকট অতীতেও প্রসিদ্ধ ছিল । কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে । (টেবিল -১) ।

টেবিল ১ ঃ দশক ওয়ারী দৈনিক মাথাপিছু ধৃত মৎস্যের পরিমাণ

পরিমাণ (কে.জি.)	১৯৭০-৮০	১৯৮০ - ৯০	১৯৯০ -২০০০	২০০০-২০০৫
১-২	০	০	৪	৩৪*
২-৫	৩	৩	১৪*	২
৫-৯	১	৮*	১০	৭
৯-১৪	৮*	৪	৮	১
১৪-২০	১	১	২	০
২০-৩৫	১	১	০	০
মোট	১৪	১৭	২৮	৪৪

টীকা ঃ ১ । তারকা চিহ্নিত সংখ্যার পর্যায়ক্রমিক পরিমানগুলি সংশ্লিষ্ট দশকের মৎস্য শিকারের প্রচুরক পরিমাণ নির্দেশ করছে ।

২ । ২০০০- ২০০৫ সালের মোট ৪৪ জন জেলের মধ্যে বিভিন্ন দশকে বিভিন্ন সংখ্যক মৎস্যশিকারী এ পেশায় নিয়োজিত ছিল বলে জরিপে দেখা যায় । তাই বিভিন্ন দশকের মৎস্য শিকারীর মোট সংখ্যা বিভিন্ন ।
৩ । মাছের পরিমাণের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর শ্রেণী ব্যাপ্তি করা হয়েছে । কারণ, স্মৃতিনির্ভর রিপোর্টিং এ বড় পরিমাণ মাছ ধরার সুনির্দিষ্ট হিসাব প্রদানে জেলেরা সংশায়পন্ন ।

*পাদটীকাঃ বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও অন্যান্য তথ্যগুলি একটি দ্রুত জরিপ ও দলীয় আলোচনার ভিত্তিতে সংগৃহীত । সর্তারঘাট থেকে কালুরঘাট পর্যন্ত অঞ্চলকে ৬টি অংশে ভাগ করে Stratified Random Sampling মাধ্যমে বাছাই করে ডিম আহরণকারী ৬৩ টি ও মৎস্য শিকারী ৪৪টি খানার মধ্যে এ জরিপ ২০০৫ সালের নভেম্বর - ডিসেম্বর মাসে পরিচালিত হয় ।

জরিপে দেখা যায় যে, ১৯৭০-৮০ দশক থেকে মাথাপিছু উৎপাদনের প্রচুরক পরিমাণ দৈনিক ৯-১৪ কেজির জায়গায় এ শতাব্দীর শুরুর দশকে ১-২ কেজিতে নেমে এসেছে।* অন্য একটি হিসাব মতে ১৯৭০ এর দশকে একজন জেলে যে পরিমাণ মাছ দৈনিক ধরতে পারত আজ সে পরিমাণ মাছ ধরতে ৮ জন জেলের প্রয়োজন।

এ রকমের উৎপাদন হ্রাস আরও প্রকট হয়ে উঠে যখন বলা হয় যে অতীতের চেয়ে বর্তমানের মাছ ধরার কৌশল অনেক বেশী পুঁজি-নিবিড় হয়ে গেছে। বিভিন্ন ক্ষতিকর সুতা দিয়ে ঘর গুলি প্রয়োজনমত হ্রাস বৃদ্ধি করে তৈরী জালগুলি এখন ব্যবহার করা হয়। এ জালগুলির ঘর খুবই ছোট যেখান দিয়ে ১ ইঞ্চি আকারের ছোট/শিশু মাছও গলিয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া, নদীর ধারে মাছের চারণ ক্ষেত্রও জাল পোতার জায়গা থেকে বাদ পড়ে না। এ সব জালের বিস্তৃতি খুবই ব্যাপক। জালের বিভিন্ন খন্ডগুলোকে জোড়া লাগিয়ে একটানা নদীর পুরো বিস্তার জুড়ে এ সব জাল ফেলে রাখা হয়। ফলে দিনে দিনে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। অনেক জেলে মাছ ধরার আয় থেকে জীবিকা উপার্জন করতে পারছেনা।

এককালে হালদা নদীর মাছ নদীর দুধারের বসতির প্রয়োজন মিটিয়ে বাইরেও সরবরাহ করা যেত। হালদার গলদা, পাবদা, টেংরা আইড় ও বোয়াল এ নদীর বিভিন্ন খালের মাধ্যমে দূরবর্তী লোকালয়ে ও ধরা পড়ত। সে সব খালের অনেকখানি মরে গেছে। যেটুকু আছে তাতেও মাছের আকাল। স্থানীয় বাজারে যে সব মাছ এখনও পাওয়া যায় সেগুলোর বর্তমান দামের সংগেও ১৯৯০ সালের দাম তুলনা করলে বাংলাদেশের যেকোন অংশের মত এখানেও মাছের আকালের একই দৃশ্য ধরা পড়বে যদিও এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এখনও হালদা প্রবহমান। (টেবিল -২)।

এ নদীতে এখনও কার্প জাতীয় মাছ ধরা পড়ে। তবে নানা কারণে স্থানীয় বাজারে সেগুলো বিক্রয় হতে দেখা যায় না। ভিন্ন জায়গার (ভারত, মিয়ানমার) একই প্রজাতির রুই কাতলা বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরের মত এখানকার বাজারেও নিয়মিত মেলে।

টেবিল ২ ঃ ১৯৯০ সালে ও বর্তমানে স্থানীয় বাজারে হালদার মাছ।

মৎস্য	কেজি প্রতি দাম (টাকায়)	
	১৯৯০	২০০৫
গলদা (১৫ টি / কেজি)	৮০	৪০০-৪৫০
চিংড়ি	১৫	-
পাবদা	৬০	৩০০
ফাইস্যা	৩৫	১২০
ট্যাংরা	৩৫	১২০
আঁইড/ বোয়াল	৩৫	১২০
বাইলা (ইধরষধ)	২০	১০০
পুঁটি	১৫	৬০
কাসকি (কধংশর)	১০	৫০
সিরিং (ঈযবৎরহম)	২০	১০০
টোডা লাখ্যা (চৎধহি)	২৫	২০০

হালদার ব্যবস্থাপনা

হালদা এককালে (১৭৯৩-১৯৪৭) ছিল জমিদারদের সম্পত্তি। ১৯৫০ সালের পূর্ব বঙ্গ সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও স্বত্ব আইনের আওতায় এ নদী সরকারের খাস জমিতে রূপান্তরিত হয়। তখন থেকে সর্বোচ্চ ডাকের বিনিময়ে নীলামে বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ এ নদীর ইজারা লাভ করেন। নদীর মাছ ধরার অধিকার চলে যায় তাদের হাতে। তারা কখনও ধৃত মাছের অংশ এবং কখনও নগদ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জেলে পেশার লোকজন দিয়ে মাছ ধরত। ১৯৮০ র দশকে নতুন মৎস্যক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা নীতির মাধ্যমে এ রকম নীলামে অংশ গ্রহণের অধিকার মৎসজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। কিন্তু এ নীতি এখানে চালু করা হয়নি। বর্তমানে এখানে যে কেউ মাছ ধরতে পারে। কাউকে কোন রকম খাজনা এ বাবদে দিতে হয় না। এক কথায়, এটি এখন উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার সম্পন্ন একটি সম্পদ। ফলে নদী ব্যবস্থাপনায় কার্যতঃ কোন স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারের কারণে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নদীর ভাগ্যে যে বিপর্যয় ঘটেছে তাকে tragedy of the commons বলেই বর্ণনা করা যায়। (১)

পুরণো মহাজন ইজারাদারদের কেউ কেউ এখনও নদীর অংশ বিশেষ (কুম) মাছ ধরার জন্য দরিদ্র পেশাদার জেলের নিকট ইজারা দেয়ার ব্যবস্থা বজায় রেখেছে। নদীর দু'ধারের বসবাসকারি ধানী জমির মালিকরা নিজ নিজ জায়গা বরাবর নদীর কিনারায় ঘিরা জাল পুতে মাছ ধরে। যে সব পরিবার তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল এবং মাছ ধরার মত ছোট কাজে নিয়োজিত হতে চায় না তারা তাদের অংশ অন্য কাউকে জাল বসাবার জন্য ভাড়া দেয় এবং পরিবর্তে উৎপাদনের অংশ আদায় করে। এতে আইন যাই বলুক নদীতে একধরণের বাস্তব (de facto) ব্যক্তি মালিকানার অস্তিত্ব খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। এ ভাবে নদীর খালগুলিতেও ব্যক্তিমালিকানা পাকাপাকিভাবে তৈরী হয়ে আছে। সমাজের প্রতিপত্তিশালীরা কাঁটা দিয়ে খালের বিভিন্ন অংশ দখলে রাখে। এ কাঁটাগুলি মৎস্য একত্রীকরণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্ঠি করে। দিনের পর দিন নির্দিষ্ট কাঁটাগুলি নির্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানায় থাকতে থাকতে সেগুলিতে ঐ সকল ব্যক্তির অধিকার স্থায়ী হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষও তা মেনে নিয়েছে।

নদীর প্রায়বৃত্তাকার অংশগুলির কোন কোনটি নদী ভাঙ্গনের কারণে বসতি এবং শস্যভূমির ক্ষতির কারণও হয়ে উঠে। এ ক্ষতি ঠেকাবার উপায় হিসেবে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় উদ্যোগে জলস্রোত সরল রেখায় প্রবাহিত করার জন্য খালকাটার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর ফলে এ রকম কিছু বক্র অংশ নদীর মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সে সব অঞ্চলে মৎস্য প্রজনন বিঘ্নিত হয়েছে। প্রজনন ক্ষেত্র স্থানান্তরিত হয়ে এখনও যেখানে বক্রাকৃতি অংশের ক্ষতি সাধন করা হয়নি সেখানে চলে গেছে। ডিম সংগ্রহ ও পোনা ফোটানোর পেশায় নিয়োজিত স্থানীয় সম্প্রদায় এভাবে নদীর মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র পরিবর্তন ও সংকোচনের বিষয়টি সাধারণ্যে ব্যাখ্যা করে থাকেন। উল্লেখ্য, প্রায় পাঁচটি এরকম অর্ধবৃত্তকার অংশের মধ্যে এখন মাত্র একটিই অস্তিত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এ ছাড়া গত শতকের আশির দশক থেকে এ নদীর অত্যন্ত সম্পদশালী ১২টি খালের মুখে স্লুইস গেইট নির্মান করেছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন সংস্থা। মৎস্য সম্পদের উপর এর প্রভাবের বিষয়টি উপেক্ষিত থাকায় এগুলো নির্মাণের ফলে মৎস্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে নিয়মিতভাবে গেইট খোলা এবং বন্ধ রাখার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় এর কোন সুফল এলাকার কৃষিতে পড়ে নি। সরকারের মৎস্য বিভাগের সংগে পানি উন্নয়নও কৃষি বিভাগের সমন্বয়হীনতার কারণে এখন প্রায় বিকল এই স্লুইস গেইটগুলি কারও উপকারেও আসছে না।

হালদার মৎস্যজীবি

হালদার দু'ধরনের উৎপাদনের সঙ্গে দু'শ্রেণীর মৎস্যজীবী সনাক্ত করা যায়। প্রথমটি ডিম সংগ্রহ রেনু ফেটানো, ও পোনা পালনের কাজ করেন এবং দ্বিতীয়টি মৎস্য শিকার করেন। যদিও এই দু'সম্প্রদায়ের অনেককেই উভয় কাজে অংশ নিতে দেখা যায় তবুও তারা এ দু'টির একটিকেই তাদের পেশা বলে উল্লেখ করেন। বস্তুতপক্ষে আমাদের জরিপে ডিম সংগ্রহকারী এক তৃতীয়াংশ খানার প্রধানগণ মৎস্যশিকারকে তাদের দ্বিতীয় পেশা এবং মৎস্যশিকারী অর্ধেক খানাপ্রধানগণ ডিম সংগ্রহকে তাদের দ্বিতীয় পেশা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হাটহাজারী ও রাউজানের থানা মৎস্য অফিসের দেয়া হিসাব অনুযায়ী অধিকাংশ পোনা উৎপাদনকারী হাটহাজারী ও অধিকাংশ মৎস্য শিকারী রাউজানের অধিবাসী। (টেবিল -৩)

আমাদের জরিপে অংশগ্রহণকারী ৬৩ জন পোনা সংগ্রহকারী হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভূক্ত এবং ৪৪ জন মৎস্যশিকারী মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত। (টেবিল -৪)

টেবিল ৩ ঃ হালদা নদীর জেলে ও পোনা আহরণকারী সম্প্রদায়

মৎস্য ক্ষেত্র	হাটহাজারী	রাউজান	মোট
পোনা আহরণ	৩৬৭ (৬৫)	২০০ (৩৫)	৫৬৭ (১০০)
মৎস্য শিকার	৩২৫ (৩০)	৭০০ (৬৭)	১০২৫(১০০)
মোট	৬৯২ (৪৩)	৯০০ (৫৭)	১৫৯২ (১০০)

টীকা ঃ বন্ধনীর মধ্যেকার সংখ্যা শতাংশ জ্ঞাপক।
সূত্র ঃ হাটহাজারী ও রাউজান থানা ফিসারিজ অফিস, নভেম্বর ২০০৫

উল্লেখ্য, বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরা মৎস্যশিকারে সাধারণত অংশ গ্রহণ করে না। অবশ্য, হালদায় তাদেরকে বড়শি (চিংড়ী) এবং টানা জাল ফেলতে দেখা যায়। নদীর পাড়ে তাদের বসতি। পুরুষ পরম্পরায় তারা একাজের সঙ্গে জড়িত এবং এ পর্যন্ত আহরণ ও পোণা ফোটানোর মত কাজগুলি পিতৃপুরুষের কাছ থেকে শেখা।

জরিপে অংশগ্রহণকরী খানার প্রধানদের বিপুল অংশ অল্পবয়সে একাজে এসেছেন বলে জানিয়েয়েছন। (টেবিল - ৫)

ডিম সংগ্রহে সকল সম্প্রদায়ই প্রাচীনকাল থেকে সম্পৃক্ত থেকেছেন। এক্ষেত্রে প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ১৯৫০ এর দশক বা তারও আগে থেকে একাজে এসেছেন। কিন্তু মৎস্য শিকারে শুধু ঐতিহ্যবাহী জলদাশ পরিবারই প্রাচীনকাল থেকে এ কাজে নিয়োজিত। (টেবিল-৬) মুসলমানদের এ ক্ষেত্রে আগমন ১৯৮০ দশক থেকে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ডিম সংগ্রহকারীদের তুলনায় মৎস্য শিকারীরা অনেক পিছেয়ে আছে। (টেবিল -৭)।

টেবিল ৪ ঃ মৎস্যজীবীদের পরিবার সমূহের খানা প্রধানের ধর্ম

পোনা আহরণকারী				মৎস্য শিকারী			
মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	মোট	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	মোট
২৪	২২	১৭	৬৩	১০	৩৪	-	৪৪
(৩৮)	(৩৫)	(২৭)	(১০০)	(২৩)	(৭৭)		(১০০)

সূত্র ঃ মাঠ জরিপ, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০৫ ।

টেবিল ৫ ঃ খানা প্রধানদের নিজ নিজ পেশায় প্রথম অংশগ্রহণের সময় বয়স

প্রথম অংশগ্রহণের সময় ও বয়স	১০-১৫	১৫-২০	২০-তদুর্ধ	মোট
ডিম আহরণকারীর সংখ্যা	৫১ (৮৪)	৮ (৯৩)	৪ (৭)	৬৩ (১০০)
মৎস্যশিকারীর সংখ্যা	২১ (৫৭)	১৮ (৪১)	৫ (০২)	৪৪ (১০০)
মোট	৭২ (৭০)	২৬ (২৪)	৯(০৬)	১০৭ (১০০)

টীকা ঃ বন্ধনীর মধ্যেকার সংখ্যা শতাংশ জ্ঞাপক ।

সূত্র ঃ মাঠ জরিপ, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০৫ ।

নিরক্ষতার হার ডিম সংগ্রহ ব্যাপৃত পরিবারের সদস্যদের (২২%) তুলনায় মৎস্যশিকারীদের (৪০%) মধ্যে বেশী । তুলনামূলকভাবে এদের মধ্যে পড়তে ও লিখতে পারে এমন সদস্য সংখ্যা (২০%) অবশ্য ডিম সংগ্রহকারীদের (১৪%) চেয়ে বেশী । কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এরা (৪০%) ডিম সংগ্রহকারীদের (৬৪%) চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে ।

লেখাপড়ার সকল স্তরেই মহিলারা পুরুষদের চেয়ে অনেক পশ্চাদপদ । মৎস্যশিকারীদের মহিলাদের

টেবিল ৬ ঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিবারের প্রথম অংশগ্রহণের দশক

মৎস্য		১৯৫০ দশক ও পূর্বে	১৯৬০-৭০	১৯৭০-৮০	১৯৮০-৯০	মোট
শিকারী	জলদাশ	৩৪ (১০০)	০	০	০	৩৪
	মুসলমান	০	১ (১০)	০	৯ (৯০)	১০
	মোট	৩৪ (৭৮)	১ (০২)	০	৯ (২০)	৪৪ (১০০)
ডিম সংগ্রহকারী	মোট	৫৭ (৯০)	৬ (১০)	---	---	৬৩ (১০০)

সূত্র ঃ মাঠ জরিপ, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০৫ ।

টেবিল ৭ ঃ পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

সদস্য	নিরক্ষর		পড়তে ও লিখতে পারে ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী				তদুর্ধ		মোট	
	ডিম সংগ্রহকারী	মৎস্য সংগ্রহকারী	ডিম সংগ্রহকারী	মৎস্য সংগ্রহকারী	ডিম সংগ্রহকারী	মৎস্য সংগ্রহকারী	ডিম সংগ্রহকারী	মৎস্য সংগ্রহকারী	ডিম সংগ্রহকরী	মৎস্য সংগ্রহকারী
পুরুষ	৪০ (১৯)	৫৭ (৩৫)	১৮ (৮)	৩৬ (২২)	১০৫ (৫০)	৬৪ (৪০)	৪৮ (২৩)	৬ (৩)	২১১ (১০০)	১৬৩ (১০০)
মহিলা	৪২ (২৬)	৭৪ (৫০)	৩৭ (২২)	২৫ (১৭)	৪৮ (৩০)	৪৬ (৩১)	৩৭ (২২)	২ (০১)	১৬৪ (১০০)	১৪৭ (১০০)
মোট	৮২ (২২)	১৩১ (৪০)	৫৫ (১৪)	৬১ (২০)	১৫৩ (৪১)	১১০ (৩৬)	৮৫ (২৩)	৮ (০৪)	৩৭৫ (১০০)	৩১০ (১০০)

মধ্যে আবার নিরক্ষরতার হার শতকরা ৫০ যা ডিম সংগ্রহকারীদের মধ্যে শতকরা ২৬ সে তুলনায় পুরুষদের নিরক্ষতার হার যথাক্রমে শতকরা ৩৫ ও শতকরা ১৯ ।

পরিবারের খাদ্য প্রাপ্তির অবস্থা পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে মৎম্যশিকারী সম্প্রদায় পোনা সংগ্রহকারীদের চেয়ে অধিক দুর্দশাপন্ন অবস্থায় দিনাতিপাত করে । (টেবিল - ৮) ।

তাদের কোন পরিবারেই উদ্বৃত্ত খাদ্য থাকে না এবং প্রায় ৬০ শতাংশ পরিবারে খাদ্য ঘাটতি হয় । তাদের মধ্যে আবার জেলে সম্প্রদায় অনেক বেশী দুর্দশাপন্ন ।

উপরের সকল সূচক থেকে এ ধারণা স্পষ্ট হয় যে আর্থসামাজিক অবস্থা বিচারে হালদায় মৎস্যশিকারীরা পোনা সংগ্রহকারীদের চেয়ে নিম্তর অবস্থানে রয়েছে । মৎস্যশিকারীদের মধ্যে জলদাস সম্প্রদায় আবার

টেবিল ৮ ঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিবারের খাদ্য প্রাপ্তির অবস্থা

	পোনা আহরণকারী পরিবার					মৎস্য শিকারী পরিবার				
উদ্বৃত্ত		ঠিক যথেষ্ট ঘাটতি	সময় সময় ঘাটতি	প্রায়শ	মোট	উদ্বৃত্ত	ঠিক যথেষ্ট	সময় সময় ঘাটতি	প্রায়শ ঘাটতি	মোট
১৪ (২২)		২৯ (৪৭)	১১ (১৭)	৯ (১৪)	৬৩ (১০১)	০	১৯ (৪৩)	৬ (১৪)	১৯ (৪৩)	৪৪ (১০০)

টীকা ঃ বন্ধনী মধ্যেকার সংখ্যা শতাংশ জ্ঞাপক ।

সূত্র ঃ মাঠ জরিপ ।

মৎস্য শিকারে ইদানিংকালে যোগদানকারী মুলমান জেলেদের চেয়ে অনেক পশ্চাদপদ। এই সম্প্রদায়ের সংগে গোটা বাংলাদেশের অন্যান্য অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে নিয়োজিত জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য অভিন্ন। এ ব্যাপারে শেষোক্তদের সম্পর্কে BARC-CIRDAP Workshop on Socio-economic Aspects of Fishing Community in Bangladesh এ মন্তব্য করা হয়েছে যে, এরা সামাজিকভাবে হীনতর এবং এদের বিপুল অংশ সম্পদহীন দরিদ্র। আমাদের জরিপেও ঐতিহ্যবাহী জলদাস গোত্রের পেশাজীবী জেলেদের হতদরিদ্র অবস্থার প্রতিফল দেখা যায়। এতে অন্তর্ভূক্ত জলদাস মৎস্যশিকারী ও অন্যান্য (মুসলমান) মৎস্যশিকারীদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান ।

এখানে উল্লেখ্য, মুসলমান সম্প্রদায় গত শতকের আশির দশক থেকে মৎস্যজীবী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধির তুলনায় অধিক হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধি এর প্রধান কারণ। এখনও এ সম্প্রদায়ের লোকেরা সমাজে নিজেদের জেলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করে। তা সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে তারা মৎস্যশিকারে অধিকতর জড়িয়ে পড়ছে। মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের এরকম দুর্দশাপন্ন জনগণ এবং জলদাস সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবীরাই হালদার উপর নির্ভরশীল। এরাই হালদায় মূল মৎস্যজীবী সম্প্রদায়। এদের বাইরেও হালদা পারের বহু লোক নিজেদের পরিবারের খাবার জন্য মাঝে মাঝে এ নদীতে মাছ ধরে। অন্য কিছু লোক আছে যারা তুলনামূলকভাবে ধনী। এরা ছিপ বড়শিসহ উন্নত অন্যান্য যন্ত্র দিয়ে মাঝে মাঝে মাছ শিকার করে। হালদার দক্ষিণাংশে গলদা চিংড়ি ধরার জন্য বড়শির ব্যবহার বেশ বিস্তৃত। চিংড়ি পোনা আহরণের মৌসুমে বাইরের ব্যবসায়ীরাও এখানকার জেলেদের নিয়োগ করে।

মৎস্য শিকারে হালে যোগদানকারী নবীন জেলেরা ঐতিহ্যবাহী জাল বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারে পারদর্শিতা নিয়ে এ কাজে যোগদান করেনি। উপরন্তু, ঐতিহ্যগতভাবে মৎস্যশিকারে জড়িত না থাকায় মৎস্য সংরক্ষনের সহায়ক কিছু কিছু বিষয়ে এরা অনভিজ্ঞ। এমতাবস্থায়, এদের যোগদানের ফলে নতুন ক্ষতিকারক জালের ব্যবহার যেমন দ্রুত বেড়ে গেছে তেমনি নদীতে মা মাছের সংরক্ষনের বিষয়টি উপেক্ষিত হচ্ছে। ছোট ছোট আকারের মূল্যবান মাছ সংগ্রহে কোন বাচবিচার করা হচ্ছে না।

বস্তুতঃপক্ষে নদীতে মাছের ভান্ডার হ্রাস পাওয়ার কারণে সকল জাতের সকল আকারের মাছ ধরার জন্য নতুন নতুন ভাবে জাল ও ফাঁদের (৪.৫ সি. মি. এর ছোট) প্রচলন হতে থাকে। এর অনেকগুলি আইনের চোখে অবৈধ। কিন্তু আইন প্রয়োগে শৈথিল্য এবং মৎস্যশিকারে ঐতিহ্যগতভাবে প্রতিপালিত সংরক্ষনমূলক ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে নবাগত প্রজন্মের মৎস্যজীবীদের অজ্ঞতা ও তা প্রতিপালনে অবহেলার কারণে হালদায় মৎস্য উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে। অত্যন্ত শঙ্কার বিষয় হল, ইদানিংকালে নবাগতদের দেখাদেখি ঐতিহ্যবাহী জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যেও ক্ষতিকর জালের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে। মৎস্য সংরক্ষণ বিষয়ে এ সম্প্রদায় কর্তৃক এতকাল ধর্মজ্ঞানে প্রতিপালিত প্রথাগুলি পালনে অনীহা দেখা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে তাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং পাশাপাশি অন্যান্যদের মৎস্য শিকারে ক্ষতিকর উপায় অবাধে অবলম্বন করার উদাহরণ উভয়ই দায়ী। উল্লেখযোগ্য, তাদের সংগে আলোচনায় জানা যায়, তাদের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে আইনের কড়াকড়ি প্রয়োগই অবৈধ উপায় অবলম্বনে এখন মূল প্রতিবন্ধক। বংশপরম্পরায় প্রতিপালিত সংরক্ষণ নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা তত বড় প্রতিবন্ধক নয়।

প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ও মৎস্য আইন

বাংলাদেশের নদীতে মৎস্য শিকার এখন ১৯৫০ সালের Protection and Conservation of Fish Act দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আইনটি ২০০২ সালে সংশোধন করা হয়। এতে নদী, মৎস্য কর্মকর্তা এবং মাছধরার জাল ইত্যাদির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে বিস্তারিতভাবে। মাছ ধরার জালের মধ্যে সকল তন্তু দিয়ে তৈরী সকল আকারের ঘর সম্পন্ন জালকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কারেন্ট জাল নামক আরেকটি জালকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে monofilament synthetic fiber দিয়ে তৈরী সকল আকারের ঘরসম্পন্ন জাল হিসাবে। আইনের ৪ ক ধারায় কারেন্ট জালের উৎপাদন, বয়স আমদানী, বাজারজাতকরণ, গুদামজাতকরণ, স্থানান্তর, পরিবহন, অধিকার, মালিকানা এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ৫ ক ধারায় এ জাল ধরা ও বাযেয়াপ্ত করার বিধান ও তা কার্যকর করার জন্য ৫ ধারায় মৎস্যকর্মকর্তাকে পুলিস কর্মকর্তার মত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। আইনে ৪.৫ সে. মি. এর ছোট ঘর সম্পন্ন সকল জালকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইনের এ সব ধারায় কোন ব্যবস্থা নেয়ার ঘটনা আমাদের জরিপে পাওয়া যায়নি।

এখানে উল্লেখযোগ্য, কারেন্ট জাল ছাড়া বর্তমানে হালদায় ব্যবহৃত অন্য কয়েকটি জালও ফাঁদকে এখানকার লোকজন ক্ষতিকর হিসাবে সনাক্ত করেছেন। এর মধ্যে ভাসান জাল, বড়শি ও ঘিরাজাল উল্লেখযোগ্য। কার্প জাতীয় মাছসহ খুব বড় আকারের মাছ শিকার করার জন্য এ গুলি ব্যবহৃত হয় এবং মূলতঃ এরকম জাল ব্যবহারের কারণে হালদা ক্রমাগতভাবে মা মাছ শূন্য হয়ে পড়ছে বলে স্থানীয়দের ধারণা। কিন্তু এ গুলি নিষিদ্ধ করে কোন আইন চালু আছে বলে জানা যায়নি। অন্যদিকে ঘিরা বা খোর জাল নামক জাল নদীর ধারে ধারে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে দেখা যায়। এর ঘরগুলি আইনে নির্ধারিত ক্ষুদ্রতম ঘর থেকে অনেক ছোট। এ গুলির ব্যবহারে নদিতে সকল প্রজাতির মৎস্য পোনার ব্যাপক ক্ষতি এবং ফলে উৎপাদন বিপুলাংশে হ্রাস পেয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু এ গুলি নিয়ন্ত্রণের কোন নিয়মিত প্রয়াস দেখা যায় না। এভাবে কোন ক্ষেত্রে আইনে নিষিদ্ধ নয় এমনজাল, আবার কোনক্ষেত্রে আইনতঃ নিষিদ্ধ অথচ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করা হয় না এমন জালের অবাধ ব্যাপক ব্যবহার হালদার মৎস্যক্ষেত্র ব্যবস্থাপনায় কোন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতির পরিচয় বহন করে না। কিন্তু বাস্তবে হালদা অঞ্চলে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠানিক (উপজেলা মৎস্যকর্মকর্তার কার্যালয়) উপস্থিতি সর্বজন বিদিত।

বর্তমানে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এসব কার্যালয়ের তৎপরতার মধ্যে প্রতিবছর মৎস্য সপ্তাহ উদযাপনের সময় এলাকায় ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। এর সংগে উপজেলা নির্বাহী কর্মমর্তার মাধ্যমে বিভিন্ন উপজেলার সকল কর্মকর্তাকে জড়িত করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানবৃন্দও জড়িত হন জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে। জনসভা অনুষ্ঠান ও লিফলেট বিলি করে আইনের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা হয়। হাটে ঢোল সহবৎ করেও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সর্বোপরি ঘোষণা দেয়া হয় যে আইনের অবমাননার জন্য শাস্তির বিধান করা হবে। কিন্তু এ বছরও, অন্যান্য বছরের মত, মৎস্য সপ্তাহে ঘোষিত কর্মসূচীর আরদ্ধ অনুসরণ (follow-up) করা হয়নি। কারণ হিসাবে, সরকারী বরাদ্দের অভাবের কথাই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রচার ও বাস্তবে তা অনুসরণে ফাঁক আইন প্রতিপালনে সাধরণ মানুষকে উত্তরোত্তর অমনযোগী করে তুলবে এ দেশের অন্যান্য খাতও অন্যান্য দেশের নজির থেকে এ ধারণা পাওয়া যায়।(৩)। এ ছাড়া, নদীতে আইনের যে ধারাগুলি লঙ্ঘনের নজির খোঁজার জন্য হালদা অঞ্চলে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না বা যেগুলি বাংলাদেশের সব জলাশয়ের মত এখানেও লঙ্ঘিত হয়ে আসছে সে গুলি হচ্ছে ঃ

(১) জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্প জাতীয় মাছের ৯ ইঞ্চি থেকে ছোট মাছ ধরা;
(২) নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত পাঙ্গাস মাছের ৯ ইঞ্চি থেকে ছোট মাছ ধরা;
(৩) ফেব্রুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত বোয়াল ও আইড় মাছের ১২ ইঞ্চি থেকে ছোট মাছ ধরা

আইনের এ সব ধারা বাস্তবে প্রতিপালন নিশ্চিত করা যতই জটিল ও ব্যয় সাপেক্ষে হোক না কেন আইনের প্রয়োজন যে রয়েছে সে সম্পর্কে কোন মতদ্বৈদতা নেই। আইন আছে এবং থাকা বাঞ্চনীয়। আইন প্রণয়ন ও আইন প্রয়োগের মধ্যে বিদ্যমান ফাঁক কমিয়ে আনার বিষয়টির প্রতি আশু দৃষ্টি কাম্য।

একবার আমাদের মাঠ পরিভ্রমণের সময় একজন উপজেলা কর্মকর্তাও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে সংগী হিসাবে পেয়েছিলাম। অজিমের ঘাট নামক জায়গায় দূর থেকে নৌকা দিয়ে জাল পাতার দৃশ্য দেখে আমরা কাছে গিয়ে তা সনাক্ত করার সিদ্ধান্ত নিই। চেয়ারম্যান সাহেবের অনুরোধে স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পের একজন কর্মকর্তা আমাদের সংগে যোগ দেন। আমাদের নৌকা জেলে নৌকার কাছাকাছি পৌঁছতে না পৌঁছতেই একটি নৌকা পালিয়ে যায়। অন্য একটি নৌকা আমরা জেলেসহ পেয়ে যাই। সে নৌকা থেকে ভাসান জাল পাতা হচ্ছিল। নৌকার গলুইয়ে আমরা কার্পজাতীয় মাছের বড় বড় আঁইস দেখতে পাই। উপজেলা কর্মকর্তা জালটি বাজেয়াপ্ত করেন। কাছাকাছি জায়গায় আরও একটি জাল পাতা ছিল। সেটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। আইনের কোন ধারায় ভাসান জাল নিষিদ্ধ তা জানা যায়নি। তবে জালটি যে ক্ষতিকর এটি নিশ্চয় জেলেরাও সম্যক বুঝে। একজন জেলের এ রকম পালিয়ে যাওয়া এবং অন্যজনের আত্মসমর্পন থেকে ধারণা করা যায় যে জাল ক্ষতিকর হলে স্বীকৃত ব্যবহারকারী আইনের ফাঁকফোকরের সুবিধা নেয়ার কথা মনেও আনে না। ভবিষ্যতে হালদা ব্যবস্থাপনায় যে কোন উদ্যোগের জন্য একটি এক ভাল খবর।

আশার রূপালি রেখা

হালদার সুষ্ট ব্যবস্থাপনার অভাব, মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের দুর্বলতা ও অবক্ষয় এবং সংরক্ষনের ক্ষেত্রে আইনী বেষ্টনীর শৈথিল্য হালদার মৎস্যসম্পদের ক্রমাবনতির জন্য দায়ী। তা সত্ত্বেও এ অঞ্চলের মৎস্যজীবীসহ সকল স্বার্থগোষ্ঠী, প্রশাসন, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং সমাজিক নেতৃত্বের সংগে হালদার পুনরুদ্ধার বিষয়ে মতবিনিময় ভবিষ্যতের হালদা সম্পর্কে পুণঃরায় আশাবাদী হয়ে উঠতে সাহয্য করে। এখানে উল্লেখ্য, সরকারী উদ্যোগে এ ব্যাপারে কিছু কার্যক্রম গ্রহণের খবর এলাকায় বেশ উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। সকল শ্রেণীর মৎস্যজীবী নিজ নিজ ভূমিকা পালনের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। বৃহত্তর স্বার্থাগোষ্ঠী (stakeholder) সমাজ হালদার পুণরুদ্ধারের মধ্যে তাদের উজ্বল ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পায়।

সাধারণ মানুষ হালদার এতকালের অবক্ষয়ের জন্য সরকারী ভুমিকার অনুপস্থিতিকে বেশী করে দায়ী করে। তাদের মতে সরকার চাইলে সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে হালদার ক্ষতিকর ব্যবহার ঠেকানোর জন্য স্বেচ্ছায় স্থানীয় উদ্যোগ গড়ে উঠবে। এ ব্যাপারে স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সংগে ব্যাপক মত বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা নিশ্চিত করা যায়। সরকারের স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক প্রতিনিধিবৃন্দ, স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় স্বার্থগোষ্ঠীসহ সমাজের সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের প্রতিনিধিদের যৌথ উদ্যোগই এ সমস্যা মোকাবিলার প্রকৃষ্ট উপায়। মূলতঃ মৎস্য অধিদপ্তরের অধিনে পরিচালিত উদ্যোগে যারা মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারেন মানের

(rank) ক্রমানুসারে তাদের চিহ্নিত করা যায় । ১ । ইউনিয়ন পরিষদ নেতৃবৃন্দ, ২ । উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ৩ । স্থানীয় মৎস্যজীবী নেতৃত্ব, ৪ । স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ, ৫ । ও. সি., ৬ । আনসার/ভি. ডি.পি., ৭ । উপজেলা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ৮ । সমন্বয়কারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ।

যে ধরণের পদক্ষেপ এ ব্যাপারে প্রারম্ভিক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

১ । প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন অথবা প্রণয়ন সাপেক্ষে বর্তমান অবস্থা মোকাবিলার জন্য ক্ষতিকর সকল জাল বা যন্ত্র অবৈধ ঘোষণা;

২ । প্রজনন কালে মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ আইনসহ ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই সকল আইন রবাস্তবায়ন;

৩ । এ সময় নদীতে প্রয়োগের জন্য গৃহীত সকল বিধি নিষেধ প্রতিপালন নিশ্চিত করণ;

৪ । নদীর প্রায় বৃত্তাকার অংশ (খড়ড়ঢ়) ধ্বংসের সকল বেসরকারী হস্তক্ষেপ নিধারণ;

৫ । সরকারী উদ্যোগে নদীর পাড়ে উন্নত হ্যাচারী তৈরীর মাধ্যমে মাঠির খাদ ব্যবহার বন্ধে উদ্বুদ্ধকরণ;

এখানে উল্লেখ্য, বছরের একটি বড় অংশ জুড়ে মৎস্যশিকার নিষিদ্ধ করা এবং অন্যান্য সময়ে অনেকগুলি (ক্ষতিকর) জাল নিষিদ্ধ করার ফলে পেশাজীবী মৎস্যজীবীরা জীবিকাহীন হয়ে পড়বে । এদের অনেকেই হালদার উপর নির্ভরশীল । পেশাজীবী জেলেদের জন্য আগে থেকেই বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা ভেবে দেখতে হবে ।(৪,৫) । যতদিন এ রকম কোন উপায় বের করা সম্ভব না হয় ততদিন পর্যন্ত তাদের জন্য খাদ্য রেশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে । আমাদের জরিপে এ রকম পরিবারের সংখ্যা ৪০০ (চারশ) । বিকল্প কর্ম সংস্থানের জন্য স্থানীয় এন. জি. ও দের সাহায্যে জরিপে সমাজিক বনায়ন, মৎস্যচাস, হাঁস মুরগী পালন, যানবাহন এবং নদী থেকে বালি উত্তোলন প্রভৃতি খাতগুলি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে । এসব নতুন কর্মক্ষেত্রে একটি বড় জনগোষ্ঠী কে আস্তে আস্তে সরিয়ে নেয়া সম্ভব হলে হালদার মৎস্যক্ষেত্র পুনরুদ্ধার হবে একটি বাস্তবায়নযোগ্য দীর্ঘকালীন লক্ষ্যবস্তু । এর বাস্তবায়নে সকল স্বার্থগোষ্ঠীকে সমন্বিত করে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন । (৬) । বাংলাদেশের পশ্চিম অঞ্চলের অশ্বনুরাকৃতি হ্রদে যৌথ ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন নদীতে সম্প্রদায়ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে অনুকরণীয় উদাহরণ হতে পারে ।

References

1. Hardin, G. 1968. The tragedy of the commons. *Science* 162:1243-1248.
2. BARC-CIRDAP Workshop on Socio-economic Aspects of Fishing Community in Bangladesh.
3. Ida Siason, 2004. The Effect of C0-Management Processes on Enforcement and Compliance with Fisheries Regulations, WFC, Dhaka.

   Bangladesh. ICLARM, Dhaka.
4. CODEC, 1997. Identification of Non- Capture Fisheries I Options for the ESBN Fisheries of Coastal Bangladesh, Chittagong.
5. COFCON, 2003. Identification of Alternative Income and Employment generation Activities for the Costal Fisher-Folks of Bangladesh, Dhaka.
6. M. S. Khan and N. A. Apu, 1998, Fisheries Co-Management in the Ox bow Lakes of
7. P. Thompson and M.Ahmed, 2004, Lessons from CBFM1, WFC, Dhaka.

সমুদ্র সম্পদে চট্টগ্রামঃ অর্থনৈতিক ব্যবহারে সমস্যা ও সম্ভাবনা

মুহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম*

ভূমিকা

ভৌগোলিক ও কৌশলগত অবস্থান (geo-strategic postion) বিচারে বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের তুলনায় চট্টগ্রাম রয়েছে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে। এছাড়াও চট্টগ্রামের রয়েছে প্রাচীন ও বহুমুখী সম্ভাবনাময় একটি সমুদ্র-বন্দর এবং গভীর-সমুদ্র-বন্দর প্রতিষ্ঠার বাড়তি সুবিধা। চট্টগ্রামের অনন্য বৈশিষ্ট্য এর সমগ্র পশ্চিম উপকুল জুড়ে সমুদ্রের বিশাল বিস্তার। সমুদ্র চট্টগ্রামকে শুধু সৌন্দর্য মন্ডিত করেনি। একে করেছে সম্পদশালীও। সমুদ্র-বন্দরের জন্যই প্রাচীনকাল থেকে চট্টগ্রামের এত সমাদর। একে বলা হতো "প্রাচ্যের প্রবেশদ্বার" (gateway to the East)। চট্টগ্রামে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বকারী সর্বশেষ কন্সাল চট্টগ্রাম ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে বলেছিলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের সম্ভাবনা সিঙ্গাপুরের চেয়ে হাজারো গুন বেশী। এছাড়াও বেশ কিছুদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন খ্যাতনামা পন্ডিত ব্যক্তি চট্টগ্রাম এসে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন যে, " নতুন সৃষ্টির ঐতিহ্য রক্ষা করে চট্টগ্রাম হয়তো একদিন সারা বিশ্বকে পথ দেখাবে"। গ্রামীণ ব্যাংকের কথা বিবেচনায় নিলে তাঁর এ আশাবাদ ইতিমধ্যে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর

ক্রমিক অবহেলার কারণে এক সময়কার " প্রাচ্যের রাণী " খ্যাত চট্টগ্রাম কতক ক্ষেত্রে রূপকথায় বর্ণিত "ঘুঁটে কুড়ানিতে" পরিণত হলেও বৃহত্তর চট্টগ্রাম এলাকা এখনও এ দেশের সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম সমুদ্র-বন্দর এখনও পর্যন্ত চট্টগ্রাম তথা সারা দেশের সর্বাধিক সম্ভাবনাময় কৌশলগত সম্পদ । ১৯৯৪ এ জাইকা পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে চট্টগ্রাম বিভাগের ও চট্টগ্রাম পৌর এলাকার মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের জাতীয় গড় মাথাপিছু আয়ের যথাক্রমে ১.২২ ও ১.৪৯ গুন।

ঐতিহাসিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পটভূমি

চট্টগ্রাম বন্দরের লিপিবদ্ধ ইতিহাস খ্রীষ্ট জন্মের ৪০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। নবম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত চট্টগ্রাম পরিচিত ছিল "সেতগাং" (Shetgang) নামে। এটি একটি আরবী শব্দ, যার অর্থ

---

* লেখক একজন সমাজকর্মী, কলাম লেখক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা পরিষদের সাবেক গবেষণা কর্মী এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও ১৯৭৬-৭৯ কর তদন্ত কমিশনের সাবেক গবেষণা কর্মকর্তা।

"গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ" । ইতিহাস বলে, এই প্রাচীন সমুদ্র -বন্দরের মাধ্যমে প্রচুন পণ্য আনা-নেয়া হতো এবং এখানে বাণিজ্য বহর আসতো মধ্যপ্রাচ্য, চীন এবং বিভিন্ন দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশের বন্দর হতে । ওমান এবং ইয়েমেন হতে বণিকরা আসতে শুরু করে নবম শতক থেকে । ষোড়শ শতাব্দীতে আসে পর্তুগীজরা । চট্টগ্রাম বন্দরের তারা নামকরণ করে "Porte Grande" বা Grand Port" । বর্তমান অবস্থানে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে ১৮৮৭ সালে । ১৯১০ সালে ছিল এর বাৎসরিক ৫ লাখ টন পন্য খালাস (Handling) ক্ষমতা সম্পন্ন ৪টি জেটি । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা ছিল এই অঞ্চলের মিত্র শক্তির প্রধান সৈন্য ও অস্ত্র অবতরণ ক্ষেত্র (dumping station) । বছর আটেক আগে বিবিসির এক অনুষ্ঠানে দেখানো হয় চট্টগ্রাম বন্দরে আনীত অস্ত্র মায়ানমারের (তৎকালীন বার্মা) মধ্য দিয়ে চীনের পশ্চিমাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় সরবরাহের জন্য যে রাস্তা ব্যবহৃত হতো তার বর্তমান চিত্র । ১৯৮৮ হতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবস্থাপনার যৌথ দায়িত্বভার অর্পিত ছিল Port Commissioners I Port Railway -র উপর । দ্বৈত প্রশাসন পরিহারের উদ্দেশ্য ১৯৬০ এর জুলাই মাসে Port Trust এর উৎপত্তি । স্বাধীনতা উত্তর কালে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের বৃহত্তর উপযোগিতা ও দ্রুততর উন্নয়নের স্বার্থে ১৯৭৬ সালে চিটাগং পোর্ট অথরিটি অর্ডিন্যান্স জারী করা হয় । এবং তখন থেকে এ যাবত একজন চেয়ারম্যান ও অপর ৪ সদস্য বিশিষ্ট চিটাগাং পোর্ট অথরিটি (CPA) চট্টগ্রাম বন্দরের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে আসছে । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌ বা শিপিং মন্ত্রনালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সিপিএ একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান । বাৎসরিক ১২ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় সিপিএ নৌ মন্ত্রানালয়ের পূর্ব-অনুমতি ব্যতিরেকে করতে পারে । ১৯১০ সালে যেখানে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটির সংখ্যা ছিল ৪টি ও পণ্য খালাস ক্ষমতা বাৎসরিক ৫ লাখ টান বর্তমানে বার্থ ও মুরিং-এর সংখ্যা উন্নীত হয়েছে (অভ্যন্তরীণ জাহাজের জন্য ১৯টি সহ) সর্বমোট ৫১টি ও পণ্য খালাস ক্ষমতা (অভ্যন্তরীন ৩০ লক্ষ টন সহ) সর্বমোট ২ কোটি ৮০ লাখ টন । ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে চট্টগ্রাম বন্দরের কর-পূর্ব মুনাফার পরিমাণ ছিল ৩৩০.১৩ কোটি টাকা । নির্মাণাধীন নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল (সেপ্টেম্বর, ২০০৬এ যার যাত্রা শুরু প্রত্যাশিত) বন্দরের পন্য খালাস ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে উল্লেখ যোগ্য ভাবে । একটি সূত্র মতে, বর্তমানে বাস্তবায়াধীন বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ২০১৫সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পণ্য খালাসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে চট্টগ্রাম বন্দর ।

চট্টগ্রাম বন্দরের সমস্যা ও সম্ভাবনা

এক কথায় বন্দরের সমস্যা হলোঃ শ্রমিক রাজনীতি, দূর্নীতি, অদক্ষতা, জাহাজ জট, পণ্য স্তুপীকরণ, পন্য চুরি বা খোয়া যাওয়া ইত্যাদি । স্বাধীনতার পর যতগুলো সরকার এসেছে কম-বেশী সবাই বন্দর শ্রমিকদের ভোট-বাক্স এবং রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উপায়-উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে এবং নিজ দলীয় লোকদেরকে বন্দর শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে বসিয়েছে । বর্তমানেও দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের ব্যানারে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুসারী শ্রমিকদের ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন রয়েছে । সময়-ক্ষেপন ইত্যাদি অনেক কারণে অনেকেই চট্টগ্রাম বন্দরকে বিশ্বের (অন্যতম) প্রধান ব্যয়বহুল সমুদ্র বন্দর হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকেন । আবার অনেক আমদানীকারক শুল্ক-হার বৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক কারণে বন্দর থেকে পণ্য সরবরাহ নেয়ায় বিরত থাকেন যা বন্দরে 'জট' সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ । পূর্বের মতো কথায় কথায় ধর্মঘট ডাকা না হলেও নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে সম্প্রতি উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে । বর্তমান বিশ্বায়নের প্রবণতায় বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া তথাকথিত

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে কাম্য এবং শ্রমিকদের অযৌক্তিক দাবীর মুখে কিছুটা কাঙ্খিত হলেও দক্ষ পরিচালনার নামে বিশেষ শ্রেনী বা কোটারী স্বার্থে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বিসর্জন কতখানি যুক্তিসংগত তাও বিবেচ্য। এ যেন অনেকটা মাথা-ব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলার মতো। যুগপৎ জনস্বার্থ রক্ষা ও দক্ষতাবৃদ্ধির জন্যে যে সার্বিক সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন তার উপযুক্ত প্রচেষ্টার অভাব বন্দরের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে দেশের অপরাপর অর্থনৈতিক উদ্যোগ বা ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও দেশ প্রেম, সুনীতি ও সততার অভাব প্রকট। দেউলিয়া রাজনীতিও এর জন্য বড়ো পরিসরে দায়ী। এ ব্যাপারে পরবর্তী পর্যায়ে আরও আলেচনা করা হবে, সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচারে। এক কেন্দ্রিক সরকারের একটি প্রধান সমস্যা হলো সিদ্ধান্ত গ্রহনে বিলম্ব আর রাজনীতি ও প্রশাসন উভয়ই যখন দূনীর্তিগ্রস্ত হয় রাজনৈতিক স্বৈরাচার ও অর্থনৈতিক স্বৈরাচার দ্রুত পরস্পর সহায়ক হয়ে উঠে যা বন্দরের মত একটি বৃহৎ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে মন্দভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এটি চট্টগ্রাম বন্দরের ক্ষেত্রেও সত্য। অথচ চট্টগ্রাম বন্দরের রয়েছে প্রায় অপরিসীম সম্ভাবনা। পার্শ্ববর্তী দেশগুলো কেবল নয়, দূরবর্তী নেপাল, ভুটান, এমনকি চীনের বা তিব্বতের দুর্গম এলাকাগুলোকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দিতে পারলে তা এদেশের অর্থনৈতিক উল্লম্ফনে (economic take-off) একটি সুদুর প্রসারী ভূমিকা রাখতে পারে। আর সেই সাথে এশিয়ান হাইওয়ে হয়ে যদি আমরা মধ্য এশিয়ার সিল্ক রুটের সাথে নিজেদের সংযুক্ত করতে পারি তাহলেতো সোনায় সোহাগা। এশিয়ার প্রায় পুরো মূল ভুখন্ডকে তখন দেয়া যেতে পারে চট্টগ্রাম বন্দরের সুবিধা। ২৫ জুলাই, ২০০৫ইং তারিখে প্রথম আলোয় এসেছে, সম্প্রতি চীনের কুনমিং (ইউনান প্রদেশের রাজধানী) চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের জন্য সড়ক সংযোগ চেয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চীন অনেক আগে থেকেই তার কৌশলগত সম্পদের অর্থনৈতিক ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। চীনের আন্তঃসীমান্ত মহাসড়ক ভারতীয় উপ-মহাদেশে তার অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০০৫ সালে চীন তিব্বতের লাসা ও নেপালের কাঠমুন্ডুর মধ্যে বাস চলাচল শুরু করেছে। নিয়েছে রেলপথ সম্প্রসারনের উদ্যেগও। একসময় দেখা যাবে ত্রিদেশীয় চুক্তির মাধ্যমে এই সড়ক ও রেল যোগাযোগ উত্তর ভারত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে গেছে। অন্যদিকে পাকিস্তান ও চীন গিলগিট ও কাশগরের মধ্যে নতুন পরিবহন সংযোগ স্থাপনের ঘোষনা দিয়েছে। বিপরীতে তথাকথিত নিরাপত্তার কথা বলে যেমন আমরা নব্বই-এর দশকে নিখরচায় সাবমেরিন ক্যাবল লাইনের সংযোগ না নিয়ে (বিচারপতি হাবিবুর রহমানের মতে যা আমাদের সমুদ্র-সীমার মধ্য দিয়ে ভারতে গেছে) এখন প্রায় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সংযোগ নিচ্ছি তেমনি কার্যত ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা না দেয়ার উদ্দেশ্যে আমরা এশিয়ান হাইওয়ে হতে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছি। আমাদের জন্যে সুবিধাজনক যে রুটটা- মায়ানমার ও থাইল্যান্ডের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত চীনে পৌঁছানো- তাতে মায়ানমার, চীন বা থাইল্যান্ড কাউকেই আমরা আমাদের পক্ষে টানতে পারিনি। আমাদের প্রচেষ্টা শুরু করেছি আমরা অনেক দেরীতে, যদিও এশিয়ান হাইওয়ের প্রস্তাবনা সেই ষাটের দশক হতে। এদিক থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের যে সম্ভাবনার কথা আমরা ভাবছি তার রূপায়নে সর্বাগ্রে প্রয়োজন যে দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা তা এদেশে প্রকটভাবে অনুপস্থিত। অথচ চট্টগ্রামকে মুক্ত-বন্দরে পরিণত করার বিষয়টি নিয়েও আমরা ভাবতে পারতাম। পাকিস্তান আমল থেকে আমরা যে গভীর সমুদ্র-বন্দরের কথা শুনে আসছি তা এখনও সম্ভাব্যতা জরীপের সীমারেখা অতিক্রম করতে পারেনি। অথচ ইতোমধ্যে মায়ানমার দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ও থাইল্যান্ড আন্দামানের কাছে গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের আয়োজন প্রায় সমাপ্ত করে ফেলেছে। কিছুদিন আগে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় একটি উদ্বেগজনক খবর এসেছিল। সেটি হলো, মায়ানমার ও ভারত কোনাকুনিভাবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সমুদ্র-সীমার (যা উপকূল হতে দক্ষিণে

সোজাসুজি ২০০ নটিকাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত) প্রায় অর্ধেক নিজেদের সমুদ্র সীমার মধ্যে নিয়ে নিয়েছে। একটি নিদিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে ভারত ও মায়ানমারের প্রকাশিত ম্যাপের বিরোধিতা না করলে বাংলাদেশকে তার সমুদ্র-সীমার অর্ধেকটাই চিরতরে হারাতে হতে পারে। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা এবং প্রশাসনিক সততা ও নিষ্ঠার অভাবের এ এক উৎকট দৃষ্টান্ত। যে কোন বন্দরের সাফল্যের জন্যে এ যুগে যা প্রথমেই প্রয়োজন তা হলো সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দরে যে পরিমাণ কন্টেইনার বয়ে নিয়ে আসে প্রায় সে পরিমাণ কন্টেইনার যাতে তারা ফিরতিতে নিয়ে যেতে পারে তা নিশ্চিত করা। কাজেই চট্টগ্রাম বন্দরের সম্প্রসারণের তথা চীনের মতো আমাদের ভূ-কৌশলগত সুবিধাকে অর্থনৈতিক সুবিধায় রূপান্তর করার যে স্বপ্ন আমরা দেখছি, প্রতিবেশী বা দূরবর্তী দেশকে চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবহার-সুবিধা দেয়ার জন্যে সমর্থক রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে, এই বিপুল সম্ভাবনার স্বপ্ন শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য।

অপরাপর সমুদ্র-সম্ভাবনা

সমুদ্র বায়ু চট্টগ্রামের আবহাওয়াকে করেছে চমৎকার। সমুদ্র না থাকলে হয়তো উষ্ণ মন্ডলীর এ এলাকা হয়ে পড়তো উষর মরুময়। সমুদ্র আমাদের দিচ্ছে অনেক। মাছ, লবণ, শুটকি থেকে শুরু করে মুক্তা পর্যন্ত। কিন্তু সমুদ্রের সুবিশাল সম্পদ-সম্ভারের তুলনায় এ অতি যৎসামান্য। শুধু চট্টগ্রাম বা বাংলাদেশ

এক ঘন মাইল সমুদ্র জলে মিশ্রিত খনিজের আনুমানিক পরিমাণ

ক্রমিক নং	দ্রব্যের নাম	পরিমাণ (টন)
০১.	সোডিয়াম ক্লোরাইড (সাধারণ লবণ)	১২,৮০,০০,০০০
০২.	ম্যগনেসিয়াম ক্লোরাইড	১,৭৯,০০,০০০
০৩.	ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৭৮,০০,০০০
০৪.	ক্যালসিয়াম সালফেট	৫৯,০০,০০০
০৫.	পটাশিয়াম সালফেট	৪০,০০,০০০
০৬.	ক্যালসিয়াম কার্বনেট (চুন)	৫,৭৮,৮৩২
০৭.	ম্যগনেসিয়াম ব্রোমাইড	৩,৫০,০০০
০৮.	ব্রোমাইন	৩,০০,০০০
০৯.	ষ্ট্রনটিয়াম	৬০,০০০
১০.	বোরোন	২১,০০০
১১.	ফ্লুওরিন	৬,৪০০
১২.	বেরিয়াম	৯০০
১৩.	আয়োডিন	১০০ হতে ১২০০
১৪.	আর্সেনিক	৫০ হতে ৩৫০
১৫.	রুবিডিয়াম	২০০
১৬.	রূপা	৪৫ টন পর্যন্ত
১৭.	সোনা	২৫ টন পর্যন্ত
১৮.	ইউরেনিয়াম	৭ টন
১৯.	তামা, সীসা, ম্যাঙ্গানীজ ও দস্তা	১০ হতে ৩০ টন

নয়, সারা বিশ্বের জন্যে সমুদ্র এক অফুরন্ত সম্পদ-ভান্ডার, যার খুব কমই মানুষ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। জোয়ার-ভাটার অবিশ্রান্ত নিয়মে সমুদ্রই জীবনের মৌল উপাদানগুলো পৌছেঁ দিচ্ছে স্থলভাগে। মানুষের অস্তিত্বের জন্যে মহাশূণ্য (outer space)- এর চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ এই অন্তর্গত শূণ্য (inner space)। সমুদ্র-সম্পদের সঠিক আবিষ্কার ও ব্যবহার একদিন ভূ-গোলকে ম্যালথাসীয় তত্ত্বকে ভূল প্রমাণিত করবে অনায়সে। ওয়াকিফহাল ব্যক্তি মাত্রই জানেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্টের অংশগ্রহন মিত্র শক্তির জয়লাভের প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছে। আবার যুক্তরাষ্ট্রের এই যুদ্ধ জয়ের সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে জার্মানীর পূর্বেই যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সমুদ্রজল হতে ম্যাগনেসিয়াম তৈরীর প্রযুক্তি আবিষ্কার ও ব্যবহার। সমুদ্রের পানি থেকে নিষ্কাশিত ধাতব ম্যাগনেসিয়াম বিপুলভাবে ব্যবহৃত হয় আগুনে-বোমা ও আলো -প্রভা সৃষ্টিকারী বোমা বানানোর জন্যে। সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সাধারণ লবণ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্রের পানি থেকে আহরণ করছে ম্যাগনেসিয়াম ও ব্রোমাইন। দশ লাখ পাউন্ড পরিমাণ সমুদ্রজলে মিশে থাকে প্রায় এক হাজার পাউন্ড ম্যাগনেসিয়াম। মোটামুটিভাবে এক ঘন মাইল পরিমাণ সমুদ্রের পানি পরিশোধন করে পাওয়া যেতে পারে নিু ছকে উল্লেখিত খনিজ দ্রব্য গুলো।

এক ঘন মাইল বিরাট ব্যাপার। মোটামুটিভাবে ২৬ মাইল দীর্ঘ, ১০ মাইল প্রশস্ত ও ৩.৩ ফ্যাদম বা ১৯.৮ ফুট গভীরে পরিসরে যে পরিমাণ পানি ধরে তাকেই বলা যেতে পারে এক ঘন মাইল পরিমাণ পানি। উপরে বর্ণিত তালিকার প্রথম ৫টি আইটেম দেখলেই বোঝা যাবে কি বিপুল পরিমাণ ধাতব পদার্থ সমুদ্র জলে মিশে আছে। মহেশখালি ও কক্সবাজার উপকুলে কেবল সাধারন লবণ তৈরী করছি আমরা। তাও আবার মান্ধাতার আমলের প্রযুক্তিতে। আর কিছু না হোক অন্ততঃ মিঠা পানির প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমাদের অচিরেই হাত বাড়াতে হবে সমুদ্রের দিকে। উল্লেখ্য, চট্টগ্রামের কেবল রপ্তানী বাণিজ্য প্রক্রিয়াকরণ এলাকাতেই রয়েছে প্রায় সোয়াশ'র মতো গভীর নলকূপ যা আশ-পাশের এলাকায় প্রচন্ড পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গভীর নলকূপ স্থাপন ও ব্যবস্থাপনায় যে সামগ্রিক বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার সাথে আরও কিছু যোগ করে পরিকল্পিত উপায়ে সমুদ্র জল পরিশোধনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম শহরে পর্যাপ্ত পানি সরবারহ নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সমুদ্র নিয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রয়েছে। এক সময় গাওয়া হতো Rule Britania, Rule the Waves। তারও অনেক আগে প্রাচীন মিশরীয়, ফিনিশীয়, স্ক্যানডিনেভীয়, ভারতীয়, চীনা ও আরবীয়রা সমুদ্র পথে দেশে দেশে পণ্য ও জ্ঞান আহরণ ও সঞ্চার করেছে। যে শূণ্য বা 'জিরো' আবিস্কৃত না হলে আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞান অনেকাংশে 'জিরো' হয়ে যেত তা যুগপৎ স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করেছিল প্রাচীন ভারতীয় ও রেড ইন্ডিয়ানরা। প্রাচীন আরবীয়রা 'জিরো'র ধারণা ইউরোপ নিয়ে গেলে প্রথমে তারা তা গ্রহন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। (রোমান সংখ্যায় এখনও শূণ্যের ব্যবহার নেই)। সমুদ্র পথে ভারতে আসার উপায় আবিষ্কারের নেশায় আমেরিকার সুবিশাল 'নতুন ভুবন' আবিস্কৃত হয়েছে এবং শেষাবধি ইউরোপ উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছে। এখনও যে জাতি যত বেশী সমুদ্রচারী তথা সমুদ্র-সম্পদ আহরণে অগ্রণী সে জাতি তত বেশী সম্পদশালী ও পরাক্রমশালী। এক সময় বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিভাগের লোকদের জাহাজী হিসাবে বেশ সুনাম ছিল। চট্টগ্রামের হালিশহরে তৈরী হতো কাঠ নির্মিত পালতোলা সমুদ্রগামী জাহাজ, যাকে স্থানীয়ভাবে বলা হতো 'শরের জাহাজ'। জাহাজ তৈরীর 'অর্ডার' আসতো ইউরোপ-আমেরিকাসহ সারা দুনিয়া থেকে। আমরা ভুলে গেলেও ইউরোপের অনেক স্থানে এখনও চট্টগ্রামের তৈরী কাঠের জাহাজ ভাসমান যাদুঘর হিসেবে সংরক্ষিত রয়েছে। চট্টগ্রামের স্থানীয় অনেকেরও ছিল এ ধরনের সওদাগরী জাহাজের মালিকানা যে গুলো ইউরোপ পর্যন্ত যেতো বাণিজ্য-সওদা নিয়ে। আরবীয়দের হাতে যেমন সমুদ্র-বিদ্যার পরিপুষ্টি-লাভ ঘটে তাদেঁর উৎসাহেই

তৎকালে চট্টগ্রামে জাহাজ নির্মান শিল্প বিকাশিত হয়। হালিশহরের ঈশান মিস্ত্রির হাট যাঁর নামে সেই ঈশান মিস্ত্রি ছিলেন একজন নামকরা শরের জাহাজা নির্মাতা। কালের চক্রে ষ্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর লোহার পাত নির্মিত জাহাজের প্রচলন শুরু হলে পৃষ্ঠপোষকতায় অভাবে ও নবতর প্রযুক্তি লাভের ব্যর্থতায় চট্টগ্রামের জাহাজ নির্মান শিল্প পরিবর্তিত পরিসরে বিকাশ লাভের পরিবর্তে মূখ থুবড়ে পড়ে। একই প্রযুক্তি হস্থান্তরজনিত কারণে চট্টগ্রামের জাহাজীরাও তাদের ঐতিহ্যগত পেশায় পিছিয়ে পড়ে। হালিশহরস্থ নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ন্যায় আরও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে উপযুক্ত পরিকল্পনা ও পরিপোষনের মাধ্যমে অসংখ্য বেকারের হাতকে আমরা সম্পদ সৃষ্টির হাতিয়ারে পরিণত করতে পারি শুধু সমুদ্র জয়ের মাধ্যমে। সমুদ্র-সম্পদের রয়েছে আরও বহুতর সম্ভাবনা। চট্টগ্রাম সহ সারা দেশের উপকুল জুড়ে যদি উপকুল রক্ষা বাঁধের সাথে সাথে তার উপরে তৈরী করা যেতো সড়ক নেটওয়ার্ক তাহলে সমুদ্র-সম্পদের বর্ধিত অর্থনৈতিক ব্যবহার তথা সমুদ্র-নির্ভর শিল্প ও পেশার বিকাশ ঘটিয়ে সারা দেশে সৃষ্টি করা যেতো (অর্থনৈতিক) উত্তরণের এক সুবিশাল, সুবর্ন সম্ভাবনা। শুধু মৎস্য আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, শুটকি বা লবণ তৈরী, মাছের ঘের, জাহাজ-ভাঙ্গা বা জাহাজ নির্মাণ শিল্প নয়, সমুদ্রের শামুক-গুগলি থেকে শুরু করে শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদ (যা কয়েকশ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে) রপ্তানির মাধ্যমে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারি। দেশের জন্য প্রয়োজনীয় ইস্পাতের প্রধান যোগানদাতা জাহাজভাঙ্গা শিল্প বিকাশ লাভ করেছে একমাত্র চট্টগ্রামেই। আবার এই শিল্পে বিনিয়োগ হতে উদ্ভুত লাভ পুনঃ বিনিয়োগ করে গড়ে তোলা হয়েছে ঢেউ টিন, সয়াবীন তেলসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মৌলিক শিল্প। চট্টগ্রাম বন্দর বছরে যে পরিমাণ কর-পূর্ব মূনাফা অর্জন করে থাকে জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্প হতে প্রায় সমপরিমান রাজস্ব আয় করে থাকে সরকার। দেশের অপরাপর শিল্পের তুলনায় সর্বাধিক সংযোগ-সম্পর্ক (Linkage effect) বিশিষ্ট এই শিল্প কিন্তু অদ্যাবধি শিল্প হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি পায়নি। আমাদের মানব-সম্পদকে সমুদ্র নির্ভর শিল্পে নিয়োগ করে আমরা আরও বেশী সম্পদ সৃষ্টিকরতে পারি। সমুদ্রের উদ্ভিদ এতই পুষ্টিকর যে তা আমাদের খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যার সমাধানে বিরাট ভুমিকা রাখতে পারে। কক্সবাজারের ' পিংক পার্ল' বা গোলাপী মুক্তা ইতিহাস খ্যাত। সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম, ইতিহাসবিদ আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে কক্সবাজারের গোলাপী মুক্তার কথা উল্লেখ করে গেছেন। কুতুবদিয়া থেকে টেকনাফের উপকূল জুড়ে মুক্তার চাষ করে ফি বছর কেবল তা থেকেই ১০০ কোটি টাকার সমপরিমান বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। আর কক্সবাজারের আকরিক বালিতো রয়েছেই। অথচ মহেশখালির অদূরে পরিকল্পিত গভীর সমুদ্র বন্দর থেকে শুরু করে কক্সবাজারের বেলাভুমি হতে আকরিক বালি আহরণ এখনও কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। আমাদের সমুদ্র তলদেশে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেলের (সম্ভাব্য) বিপুল আধার। বলা হয়ে থাকে পুরো চট্টগ্রামই তেল ও গ্যাসের উপর ভাসছে। আর আমরা যদি সমুদ্র তরঙ্গের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি তবে তা হবে আমাদের জন্যে অফুরন্ত শক্তির উৎস। প্রস্তাবিত সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে সাথে যদি দূরবর্তী দ্বীপগুলোর সংগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো যায় তাহলে পর্যটন শিল্পেরও প্রভূত প্রসার ঘটবে। মোদ্দা কথা, পরিকল্পিত উপায়ে সমুদ্র-সম্পদ ও শক্তির সদ্ব্যবহার আমাদের অর্থনীতিতে আনতে পারে এক যুগান্তকারী বিপ্লব।

সমস্যা

কান টানলে মাথা আসার মতো সম্ভাবনার সাথে জড়িয়ে আছে নানাবিধ সমস্যাও যেগুলো আবার সামগ্রিক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সাথেও জড়িত। বায়ু-নিরোধক পৃথকীকরণ (air-tight

division) সম্ভব না হলেও প্রধান কিছু সমস্যার প্রতীকি উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। এগুলো হলোঃ

১. জনসংখ্যা বিস্ফোরন, দারিদ্য, বেকারত্ব, সন্ত্রাস, মাদক, ও মাফিয়া বা সিন্ডিকেট বাণিজ্যের প্রসার, সামাজিক অস্থিরতা, আন্তর্জাতিক সমস্যার প্রভাব ইত্যাদি।

২. অর্থনৈতিক পণ্য ও সেবার অর্থনৈতিক মূল্য ও প্রচলিত মূল্যের মধ্যে বিদ্যমান বিপুল পার্থক্য।

৩. দূনীতি, অদক্ষতা, অপচয় ও অদূরদর্শিতা; প্রজ্ঞা, সততা, নিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা, দায়বদ্ধতা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের অভাব; রাষ্ট্রীয় নীতি ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে সমন্বয় হীনতা।

৪. অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও অজ্ঞতা।

৫. শাসককুলের অযোগ্যতা, অদূরদর্শিতা ও নীতিহীনতা।

৬. প্রায় সকল আদর্শিক আন্দোলনের হোতা ও নেতারুপ মধ্যবিত্ত শ্রেনীর অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত হওয়া।

৭. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাইরের চাপ ও স্বার্থান্ধতা।

৮. অর্থনৈতিক সম্পদের অসম বন্টন; বিশেষ গোষ্টি বা শ্রেণীর হাতে সম্পদ ও ক্ষমতার কুক্ষিগতকরণ; শোষন ও বঞ্চনা ইত্যাদি।

এসব সমস্যার সমাধান আলোচনা এ নিবন্ধে সম্ভব নয়। এমনিতেই লেখাটির পরিসর ভীতিকরভাবে বেড়ে গেছে। তবে এটুকু বলা যায় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে কখনোই কেবল সেতু, দালান ইত্যাদি নির্মাণ করা নয়, যদিও উন্নয়নের জন্যে এসব অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে বিশেষ একটি গোষ্ঠি বা শ্রেণীর উন্নয়নও নয়। তবে আমরা যখনি যাই করিনা কেন সামগ্রিক সামাজিক আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ (social cost-benefit analysis) করেই তা আমাদের করতে হবে। এদেশে আমরা এমন একটা গাড়ী বন্ধুর সড়কে চালাতে চাচ্ছি, যে গাড়ীর একটি চাকা হয়তো গোলাকার হলেও অপর তিনটির একটি আয়তাকার, একটি বর্গাকার ও অপরটি ত্রিভুজাকার।

উপসংহার

প্রকৃতিতে তিমি মাছের মস্তিষ্ক সবচেয়ে বড়ো বলে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন- ভাগ্যিস তিমির দুটো হাত নেই, নইলে তিমিই হয়তো প্রকৃতিতে রাজত্ব করতো, এমনকি মানুষের উপরও। আমারদের অপরিসীম সম্ভাবনাকে সমস্যার পাহাড় সরিয়ে দিয়ে কাজে না লাগালে সেগুলো বরাবর সম্ভাবনাই থেকে যাবে, বাস্ত বে রুপ নেবেনা। সে জন্যে চাই অনিসন্ধিৎসু মন ও পরিবর্তনের সুতীব্র আকাঙ্খা, তারও আগে প্রয়োজন সার্বজনীন সচেতনতা সৃষ্টি ও দূরদশী নেতৃত্ব। একজন ব্যক্তি তার ভবিষ্যতের জন্য ১ সপ্তাহ বা ১ মাসের প্রয়োজনের কথা পূর্বেই ভেবে রাখতে পারে। একটা পরিবার ভেবে রাখতে পারে ১ বা ২ বছরের ভবিষ্যত প্রয়োজনের কথা। কিন্তু একটা জাতি বা দেশকে ভেবে রাখতে হয় কমপক্ষে ৩০০ হতে ৫০০ বছরের ভবিষ্যত প্রয়োজনের কথ। বর্তমান সরকার চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন বা সম্প্রসারণের জন্যে যে উদ্যোগগুলো নিয়েছেন তার প্রশংসা করেও বলতে হয়, এসবই যথেষ্ট নয়। কবি রবার্ট ফ্রষ্টের অনুসরণে তাই বলতে হয়, আমাদের "যেতে হবে বহুদুর, যেতে হবে বহু বহু দূর"।

তথ্য সূত্র

১. Chittagong Port Authority; Chittagong Port: An Overview; 2005.

২. Pacific Consultants International Nippon Koei Co. Ltd. (on behalf of Japan International Co-operation Agency (JICA) and Board of Investment, The People's Republic of Bangaldesh); The Study on Industrial Development of Chittagong Region in the People's Republic of Bangladesh (Progress Report II); December 1994.

৩. John W. Chanslor; Treasures from the Sea; Navigational Information Service Division, Defense Mapping Agency Hydrographic Center; Washington, D.C.

৪. সি রাজা মোহন (অনুবাদঃ মিজানুর রহমান-ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস হতে); কুটনীতি এখন মহাসড়কে; প্রথম আলো; ২৮ মার্চ ২০০৬ ।

৫. মুহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম; চট্টগ্রামের সমুদ্র সম্ভাবনা; চলমান চট্টগ্রাম, ভোরের কাগজ; ৩০ এপ্রিল ১৯৯৮ ।

৬. চট্টগ্রাম কি আসলেই চলমান; চলমান চট্টগ্রাম, ভোরের কাগজ; ২৮ আগষ্ট, ১৯৯৭ ।

৭. চট্টগ্রামে জাহাজ ভাঙ্গাঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা; চলমান চট্টগ্রাম, ভোরের কাগজ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ ।

৮. চট্টগ্রাম নিয়ে আসলে হচ্ছেটা কি? দৈনিক পূর্বকোণ; ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ ।

৯. আপনি চট্টগ্রাম সর্ম্পকে কতটুকু জানেন? আলোকিত চট্টগ্রাম, প্রথম আলো; ২০ জানুয়ারী, ২০০০ ও ২৭ জানুয়ারী, ২০০০ ।

Institutional Framework for Halda Fisheries: Drawing Lessons from CBFM Experiences[1]

Mohammed A. Rab*

Abstract

River fisheries in Bangladesh is characterized as "open-access" and the history of administrative and legislative measures bear "contradiction and dilemmas " in resource extraction. The 1950 Fisheries act, the proclamation of 1973 that restricted lease to the registered fisher cooperatives and the experimental New Fisheries Management Policy (NFUP) of 1986 could not contribute to devolve into any participatory institution to introduce sustainable fisheries management. Because of persistent "commons dilemmas", increasing fishing pressure and other anthropogenic reasons, the River resources degraded substantially. Over the past ten years, the Department of Fisheries (DOF) in collaboration with NGOs has been implementing community based fisheries management (CBFM) approaches with the technical assistance from the World Fish Center. The principal goal of the approaches is to provide access rights to the fishers through organizing poor fishers and the community to introduce sustainable fisheries management in beels, floodplains and River sections. The CBFM experiences suggest that management and institution building process in River sections is complex, and require participation of all concerned stakeholders including local government institutions and administration. CBFM-2 river fisheries management has broad based institutional framework to include the community at large and ' the local government along with the direct beneficiaries and resource users..4 positive feature of such institutions is its ability to facilitate flow of information among agents, which is a key to maintain solidarity within and across group s. 1n this paper, an institutional framework is suggested to manage the Halda Fisheries. that can be debated and refined.

---

1 Submitted for presentation in the regional seminar organized by the Bangladesh Economic Association, Chittagong Chapter. This paper is based on CBFM project documents, monitoring reports and field observations of World Fish staff and partners. Author acknowledges the contributions of project partners and World Fish staff for their effort in Collecting and documenting project interventions and output. However, the author alone is responsible for the views expressed in the paper, World Fish Center or any partner of the project do not bear any responsibility for any of the Views or comments.

* Scientist (Resource Economist), World Fish Center, Bangladesh and South Asia Office, Banani, Dhaka

1. The River Fisheries in Bangladesh: The "Commons Dilemma" Persists

The open-access river fisheries in Bangladesh resembles the characteristics of "common-pool resources" where property rights are not clearly defined as to who can use these resources and who can regulate it. The history of administrative and legislative measures since 1950 bears a "contradiction and dilemma in government policies.[3] that could not contribute to devolve into effective participatory institution at the resource user level. The Fisheries Conservation Act of 1950 provided management responsibilities to the Ministry of Land (MOL) and enforcement of fisheries law to the Department of Fisheries (DoF) without adequate power of convicting the offenders. Nevertheless, the Act mainly focused to protect few important species like carps and hilsha fish from premature catch rather than focusing on the modem fisheries conservation and management that can protect other indigenous species and the fish habitats. The gear restriction provisions provided by the Act cannot keep pace with the innovations in using gears that are more destructive.

Since 1950, the MOL managed these resources with the objective of raising revenue by providing short-term access rights to the highest bidders through auction, not necessarily to the fishers. The proclamation of 1973 restricted the lease to the registered fisheries cooperatives without changing the revenue-focused strategy. The introduction of the experimental New Fisheries Management Policy (NFMP) in selected 270 water bodies in 1986 could not yield intended result to restrict open-access through issuing license to the "genuine" fishers. Under the NFMP, the DOF and a few NGOs joined hands in fisheries management. One of these projects was the "Improved Management of Open water Fisheries" (IMOF) implemented by the DOF in collaboration with four NGOs with the financial assistance from the Ford Foundation. The World Fish Center (formerly known as ICLARM) provided technical support to the project. Experience of the project suggest that although licensing provided limited gains in achieving equity (Aguero and Ahmed (1989), most of the benefits were diverted to the ex-leaseholders who in many instances were able to retain control by advancing funds to pay license fees (Pomeroy and Viswanathan 2003). The new policy contributed to grow a class of rent seeking powerful non-fishers who managed to procure the licenses and created a type of "patron-client" relationships in which real fishers lost their traditional access to the resources. In

[3] Pomeroy and Viswanathan, 2003. Fisheries and Co-management in Southeast Asia, In "The Fisheries Co management Experience: Accomplishments, Challenges and Prospects" eds. D.C. Wilson, J.R. Nielsen and P. Depbol, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London.

1995, government abolished the licensing system and continued to rely on the revenue-oriented policy. Therefore, dilemma of the commons accumulated over the years and continues to persist and the result is over fishing. In addition, increasing fishing pressure due to exploding population growth, anthropogenic causes, siltation and trans-boundary water sharing problems aggravated the resource degradation. Its productivity has been declining every year; many of the indigenous species are either extinct or nearly extinct. Declining catch from open waters has made the livelihoods of the poor fishers worse. this paper is an attempt to review the experiences of project base alternative management approaches in river fishery and how these experiences are useful in designing institutional framework for management.

2. Commons Dilemma: Melting the Ice

The most important characteristic of the common-pool resources is the "subtractabilty of resourceunits once extraction occurs"[4]. That is ones harvest from the resource unit subtracts from the amount left at any point in time that creates rivalry in consumption among the resource users. Another feature of these resource systems is the impossibility of excluding beneficiaries once improvement of any set of resource unit had been made. This is the classic case of "free ridee, problem in collecting revenues once a public good is provided. Experimental psychologists and game theorists explain this individual behaviors by playing one shot Prisoner's Dilemma game with the assumption that each individual in the society pursue his self interests, that is competing with each other, and the end result is over extraction of resources or "tragedy of commons" as emphasized by Hardin (1968) in his celebrated article "The Tragedy of Commons". Implications of this theoretical development had been to establish private property rights in the resource system and the obvious solution was the introduction of leasing system. This made the government defacto owner and manager of the common resources. History of resource management until late 1990s echoed the one shot prisoners' dilemma game, which could little solve the commons dilemma.

Throughout the 1970s and 1980s, social scientists, experimental psychologists examined the factors that influence cooperation across a range of social dilemmas

4 Dietz, T., Dolsak, N., Ostrom, E., and Stem, P.C. 2002. The Drama of the Commons, In "The Drama of the Commons", eds, Ostrom, E, Dietz, T., Dolsak N., Stem, P.C., Stonich, S., and Weber, E.U. National Academy Press, Washington, DC.

including commons dilemma (Olson,1965); Kelley and Stahelski, 1970; Kelley and Grezlak, 1972; Dawes, et al., 1977)*. These, theoretical developments suggest that the individuals' decision not only determined by his self interested motives but also by social motives and "altruism", that is individuals take others' welfare into account. Kelley and Stahelski (1970) identified two types of personalities using repeated prisoners' dilemma game "cooperative" and "competitive". Now the baffling question is how and under what circumstances the "competitive" individuals become motivated to extend cooperation. Experimental research suggests that cooperative behavior may be achieved through a "payoff structure" that will provide rewards and punishment (Van Lange et al., 1992). Gatcher and Fehr (1999) moved beyond the economic rewards to examine the effects of social approval on people's willingness to participate in cooperative games. Social approval yields optimum results when participants in the resource units have the opportunity to interact over time and the participants belong to group. This emphasizes the importance of communication within group members that enhances group solidarity, elicits commitments to cooperate (Kopelman et al., 2003).

Empirical research provides evidences of successful resource management in different parts of the world that devised community-based management or co-management institutions applying the above theoretical developments over the past two decades. Reviewing the stories of implementation of co managed institutions all over the world, Agarwal (2003) concluded that successful institutions are those "that last over time, constrain users to safeguard the resource and produce fair outcome". This means that the common property arrangements can result in efficiency, equity and sustainability, but all these come at a cost. The features of sustainable common property institutions can be summarized below:

- Information sharing and communication
- Networking of stakeholders
- Equal participation (homogeneity of identities and interests)
- Shared norms
- Built-in incentive structure both moral and material
- Appropriate leadership/democratic values
- Interdependence among group members and group solidarity
- Accountability and transparency in financial management and decision making

3. CBFM Experience in Bangladesh

3.1. Background

The experience of IMOF project that was implemented to support the NFMP provided important insights about the importance,~ of collaboration between NGOs and DOF, and only NGOs has the capacity to organize effective participatory institutions of fishers for collective management. This led to a more flexible community-based approach, which strengthened NGO involvement through the CBFM Projects phase I and 2. The World Fish Center has been playing a vital role by providing technical and research support. The phase I was initiated in late 1995 and continued until July 1999. It worked in 19 widely scattered water bodies (10 rivers and 9 beels and baors) with the support from three NGOs and the DOF worked as the implementing agency. The project worked to empower fishing communities to become co-managers of these fisheries, and to ensure a more equitable distribution of benefits from fishing.

Although the CBFM-I proved effective in establishing participatory management of fisheries and providing equitable distribution of benefits, sustainability of the community organizations and its coordination across extensive inland floodplains and appropriate CBFM models for various social and environmental conditions remained unanswered. The CBFM-2 was designed in response to these lessons, needs and policy issues with funding from Department for International Development (DFID). The goal of the CBFM-2 project is to improve livelihoods of the poor people dependent on inland aquatic resources through testing and assessing arrangements for user-based (community-based) fisheries management across the diversity of inland fisheries in Bangladesh, and by informing and facilitating appropriate changes in policy. The CBFM-2 is being implemented through a partnership of Department of Fisheries (DoF), World Fish Center and I non-government organizations (PNGOs). The project has been successful in mobilizing fishers and communities for fisheries management and capacity building over the last four years. It has covered 117 water bodies including 14 CBFM- I sites spread over in 47. Upazillas of 22 districts. In addition, 17 water bodies have been selected as control to assess the impact of CBFM approaches and interventions.

The project is testing three institutional approaches for fisheries management. Fisher managed approach is being largely implemented in government khas water bodies that involves lease payment to the* government revenue department. Beneficiaries and management committee members are absolutely fishers who

were selected based on project set criteria. Community led approach is mostly applicable in flood plains where most of the lands are belong to private owners and therefore, support from all concerned including the larger community is essential in establishing fisheries management. The water body management committee includes all stakeholders although much weight is given to fishers who have fishing as their primary occupation. The third approach involves women as the dominant stakeholders although other stakeholders are eligible to participate in either the management committee or the advisory committee as members. The overall leadership belongs to the women members and the poor women have the access to project support such as training and credit.

3.2. Institutions and Fisheries Management

Community Based organizations (CBOs) are in place in all the project water bodies and receiving continued support from the PNGOs to enhance their capacity in fisheries resources management, leadership development, financial management and alternative income generating activities, etc. As part of providing legal status, 117 out of total 136 CBOs have been registered with the relevant government entities (Department of Social Welfare or Department of Cooperatives). Forty-nine CBOs constructed community centers with the partial assistance from the PNGOs; CBOs donated land and the PNGOs provided construction costs of the structure. Cluster management established in 13 clusters covering 80 water bodies. The CBOs and the beneficiaries received trainings to enhance their management skills and income generating activities. The project has so far organized 23,096 poor fisher families around rivers, closed beels, open beels and floodplains. In addition, the project provided indirect benefits (secondary and tertiary) to 113,029 beneficiaries.

The project has made significant contribution in fisheries management and habitat restoration in the working water bodies. Project beneficiaries and the community are practicing sustainable fisheries management by creating sanctuaries, protecting illegal and destructive fishing, stocking indigenous fish that are extinct and banning fishing during spawning season. The project has successfully established fisheries management principles in 117 water bodies. The project efforts enabled community leaders and local government officials to resolve problems and conflicts. One hundred sixty four sanctuaries have been established in 81 project water bodies. Conservation measures such as 3 months' ban period in each year, restriction of harmful gear, prohibition of kuas and kathas (fish aggregation devices) in floodplains are also being implemented. Substantial

progress has been made in disbursing micro-credit for alternative income generating activities (AIGAs) to the beneficiaries. Almost 93% of the principal amount has been disbursed and evidences (in the form of case studies) show that there is a link between AIGAs and reduction of fishing pressure.

3.3. Institutional Sustainability

Sustainability of the CBOs has been an issue since the beginning of the CBFM-2 project. The only way to assess the sustainability of the CBOs is to withdraw project support from the water bodies. The project severed from the CBFM-1 water bodies (14) during August- September 2005. These water bodies are under periodic monitoring about their performance. Monitoring results suggest that almost all the CBOs are performing well and a sense of self-dependency has been created across the CBO leaders and beneficiaries. They are conducting regular meetings, keeping meeting minutes and financial records. NGO workers have limited activities that are confined to credit. CBOs are maintaining linkages with the local elites and local government agencies and they are happy about the cooperation they are receiving from the DOF and other local government agencies.

To strengthen the scope of CBFM institutional framework the project organized CBO networking committees both at the regional and national levels. All the committees are still ad hoc. A draft constitution for the CBO networking national committee has been drafted with the help of BELA. The national committee will be registered with the social welfare department of the government of Bangladesh. The registration process is being held up as the government temporarily stopped new registration.

3.4. Impacts

The project is not yet prepared to provide conclusive results on its impacts. Full four year cycle of monitoring data are now available and are being analyzed. We are expecting to provide conclusive results on impacts of CBFM once the impact survey is completed. However, partial analysis of catch monitoring and gear survey data of 22 water bodies until 2004 provides good indications about productivity and biodiversity increase in the project water bodies. Preliminary analysis show that fish production increased by 132% and 40% in closed water bodies and river systems as compared to the base period 1997, and the same increased by 45% and 72%, in semi-closed and floodplains, respectively as compared to the baseline year 2002. A difference in productivity is also observed

between project and control water bodies. Average fish production per man hour in the closed, open, floodplain water bodies and river system during 20032004 showed 0.51, 0.40, 0.56 and 0.44 kg/man-hour for the project sites and 0.28, 0.31, 0.27 and 0.34 kg/man/hour for the control sites, respectively. Species diversity also increased compared to baseline year.

Although improving the livelihoods of the beneficiaries is the major objective of the project, the project impact on livelihoods is not straightforward. Pathways of impacts on the livelihoods follow building of capable institutions to establish access rights and to introduce fisheries management that will enhance production. Benefits to the poor fishers will follow through the establishment of access rights and distribution of increased production. Provisional results on the livelihood impacts based on income expenditure and consumption monitoring data until 2004 and few interim surveys and case studies suggest that 68% of the project fishers' income has increased, and the magnitude of the increase in income is 26%. Forty four percent of the control fisher indicated that their income increased by 14%. Similarly all other indicators including the food security and basic necessities showed improvement, and the rates of improvement were higher for the project fishers.

3.5. Partnership and Linkages

The basic strength of the CBFM-2 project lies with the solid foundation of partnerships between government agencies, NGOs and the "WorldFish Center. This partnership provided the opportunities to learn from core strength of each other. Nine out of I NGOs have been implementing the CBFM-2 project activities at the field level directly working with the communities. Between the two specialized PNGOs, FemCom. is responsible for providing media and message dissemination support. BELA, a legal NGO provides legal support to the project and project beneficiaries and to DOF/MOFL to frame new laws. World Fish Center has three types of roles: overall coordination, research, monitoring and capacity building support. Role of DOF in the project is to ensure government revenue collection from the leased water bodies, providing and facilitating local administrative support to protect the fishers' user rights, and providing technical advice to communities for sustainable fishery management.

Although the project partnership has much strength, it has many weaknesses and challenges. Field level DOF staff lacks resources and time to provide their full potential in CBFM activities. As member of government bureaucracy, in addition to their normal departmental duties they have to maintain local administrative

protocols and have to participate in local level administrative duties assigned by the Thana or district administration. Therefore, it is hard for them to keep up with the project activities. Nonetheless, the quality of partnership at the field level very much depends on quality and perception of the individual. In some instances, the project could not realize enough support the District and Thana level officers. As a result, the project had to drop four water bodies in 2005.

Similarly, field level implementation of CBFM activities and establishing better links with local administration and community at large to minimize shocks and conspiracy of the vested interests are to some extent depend on the personality, character and capacity of the assigned NGO worker. Politicization of NGOs has made the field level implementation worse in few cases as the local elites/leaseholders take advantage of the politically week position of the NGOs. In such situation, local level administration is also reluctant to take any positive action when something becomes too political. Despite weaknesses, the CBFM-2 project has accomplished most of its objectives through this partnership.

4. CBFM Experiences in River Fishery Management

As the River fishery is open-access public property, resource appropriation is not subject to revenue payment. Mobility of the fish resources and heterogeneity of the stakeholders in the River system have made management and institution building process complex, and require participation of all concerned stakeholders including local government institutions and administration. The most prominent beneficiaries (also stakeholders) of the river system are the poor fishers (dependent on fishing); rich fishers who can afford most efficient but destructive fishing gears, katha/kua owners (mostly rich and influential) and the subsistence fishers (only fish for consumption). Implementation of any fisheries management in river sections should have built-in incentive structure that motivates agents to introduce fisheries management through collective action. A flexible and inclusive institutional framework allows actors with diverse interests to come into a common platform to pursue their common goals. Actors/agents in such institutions are able to negotiate their interests and expected to reach to an agreement that is close to Pareto Optimal. A positive feature of such institutions is its ability to facilitate flow of information among agents, which is a key to maintain solidarity of the group.

CBFM-2 river fisheries management follows this inclusive and broad based institutional framework to include the community at large and the local government along with the direct beneficiaries and resource users. However, the

institutional building process is somewhat painful and long that requires a motivated driver (NGO) who carefully selects the beneficiaries and stakeholders, provides motivational (moral incentive) and awareness trainings. Probability of building a resilient institution is much higher if the institution building process involves this multi-stage processes. However, given the nature of the resource system, management of the river sections becomes challenging when it is implemented in a section of a flowing river. It is hard to motivate the stakeholders to invest in fisheries management like establishment of sanctuaries, observation of ban period etc., as the benefits are spilled over to the whole river system. In such a situation, drivers and the implementing agencies have to show the positive results through investing public resources in fisheries management. In most instances CBFM-2 has positive results where fish production and biodiversity have shown a positive trend although not conclusive yet.

CBFM-2 has been implementing CBFM approaches in 39 river sections of which the Fatki River consist of 15 sections (30 km long) located in Magura and Shalika Upazila under Magura district. Although management responsibility is vested with the river section management committee, the project developed an institutional mechanism for linkages and coordination among the river section management committees. This was necessary because resources are linked and the downstream beneficiaries have the incentive to "free ride" as they are in a position to -get positive externality benefits from the upstream management interventions. Discrete management of one river section will not be effective in improving fisheries resources and the lives of fishers dependent these resources. The adjacent floodplains that are also linked with the river system and share resources were included under the same institutional framework. In the river sections, 5 Cluster Committees have been formed taking 3 closely located river sections in each cluster, and one Cluster Committee has been formed in 3 floodplain beels. The nested structure of this institutional framework began with the election of 87 fisher groups or village committees. Next level committees are River Section Management Committees (RMSC) that are formed with elected/selected representatives from the village committees and the cluster committees are composed of 15 members elected from the RMSCs. A 23-member Apex Committee has been formed with the representatives of 17 water-body level management committees. The Cluster Committees and Apex Committees proved effective in minimizing conflicts across the water bodies and in establishing linkages and coordination with the district and Upazilla level government officials, politicians and other stakeholders.

5. Institutional Framework for HaIda Fisheries Management

The 80 km long, River Halda passes through four Upazillas (Fatickchari, Rauzan, Hathazari and Chandgaon) to join the tidal River Karnaphuly. A number of streams also feed the River in its course from watersheds that carry nutrient materials from rather large catchments (Khan and Azadi 2006). Recently it has drawn attention of the government and policy makers due to the alarming decline in spawn production, which is the major supplier of genetically pure broods and spawns of Indian major carps and Galda. One can mention many reasons from anthropogenic causes to excess fishing pressure for the degradation of the River resources, but these entire boil down to the basic question- how is it managed. The management history of the River is not isolated from the big picture scenario of the country. Whatever the official policy to manage this River fishery, evidences suggest that commons dilemma exists. Although there is no official provision to secure license to have the right to fish, there are many instances that the old auctioneers/leaseholders sublease the right of fishing to the ignorant poor fishers using their social power and influence. There are also evidences that the fishers and the community living along the riverbank have established a kind of proprietorship over a segment around their homesteads. Every family sets a Ghira Jal, katha or kua in the edge of the* river adjacent to their homesteads or paddy lands. In some instances, this right is transferable (Khan and Azadi 2006). Thus along with the open access nature of resource extraction a class of people have grown over the years who claim proprietorship in some segments of the River. Once fishing was the profession of a selected Hindu caste called “Jaladasa”. Over the years due to explosive population growth new entry in to the fishing occupation occurred mostly from the Muslim community. These new entrants have more capital to afford technologically superior destructive gears that contributed to the over fishing (Khan and Azadi 2006).

Along with these commons dilemmas, human interventions both government and private aggravated the resource degradation. The private interventions occurred to straighten the loops to protect the nearby inhabitants from river erosion. Over the past decades, government also constructed flood protection dams and sluice gates for irrigation purposes. Once there were five loops that facilitated carp spawning, now only one loop is left which is also in the process of straightening. Sluice gates interrupted fish movement to the rich nutrient areas that was otherwise fish habitat. Restoration of the Halda fisheries require immediate intervention to stop cutting of last remaining loop and regulated use of the sluice gates, in addition to fisheries management measures such as enforcing ban period, restricting harmful

gears, sanctuary declaration, etc. These fisheries management measures have implications on the livelihoods of the poor fishers dependent on the River resources. In this respect government safety net programs can be extended during ban period and Public support such VGF Effective enforcement during ban period government support.

Enforcement of fisheries management rules as developed by the community will require a broad based consensus among the diverse stakeholders through careful designing of an institutional framework. However, given the vastness of the river area and heterogeneous stakeholders, institution building is not an easy task and it has high transaction cost. In this regard, CBFM experiences may provide necessary guidelines, but the institutional framework should satisfy the scale of the resource unit and heterogeneity in resource users. The River flows through four Upazillas, connected with many streams of canals and seasonal floodplains. The institutional framework should cover all the River catchments to be able to introduce meaningful fisheries management. Again, stakeholder characteristics are diverse and in many instances, their interests are opposing to each other as their livelihoods are mostly related to it. Any intervention to support one group affects another group. In these circumstances, co-managed institutions can provide division of responsibilities between government and the resource users through delegation of responsibilities to the community based resource user groups. Government has a key role to set the initial conditions or rules that will provide incentives to the parties to come together and as a co-manager, it has dual role as sponsor and stakeholder. As a sponsor, government can play a vital role by providing technical support, credit, marketing support, safety nets to the vulnerable groups of fishers during ban period and protective legislation. Government is also a stakeholder as it has relationship with many affected actors and the government itself also affected by the outcome, i.e., government might have to forgo revenue and incur costs while participate. The resource users are unorganized, scattered, and lack capacity. They need support, which can be provided by competent NGOs. These shared responsibilities can be described as integration of both vertical and horizontal institutional models.

With these notes above, ‘ an institutional framework (Fig. 1) has been suggested as a starter that may be improved and refined through debate and at the implementation stage. The framework suggests dividing the river into several sections and each river section will include existing fish habitats and streams. Within river sections, each village will form a group in which among others, fishers, farmers and fish traders will be member. River Section Management

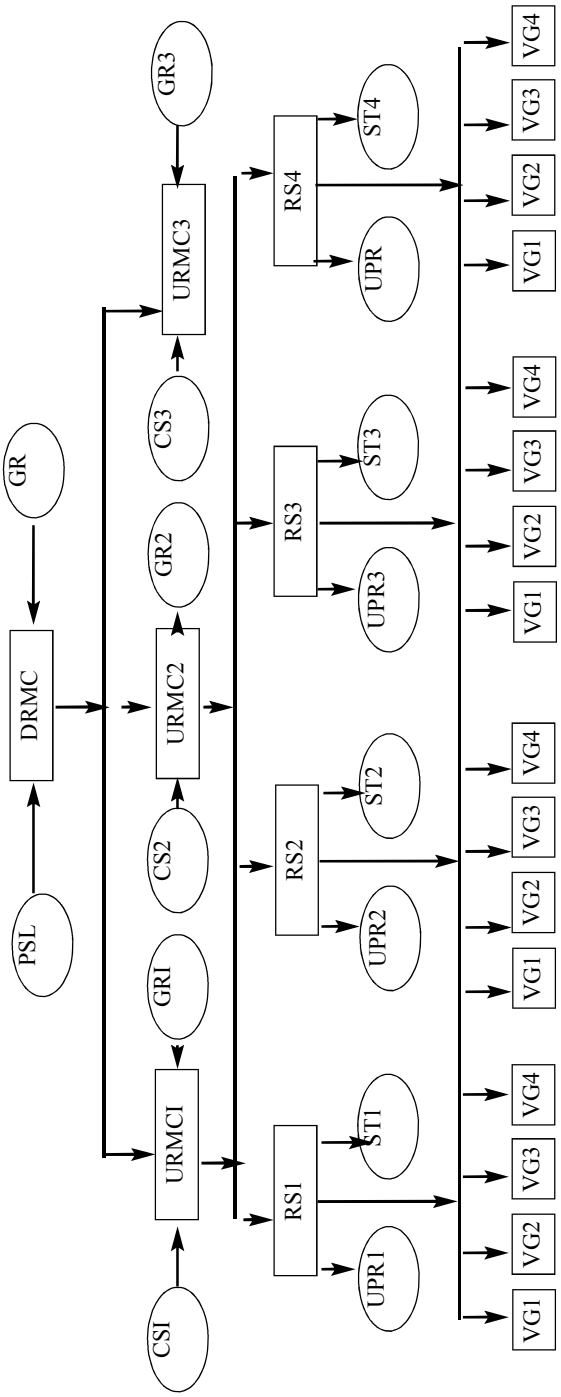

Figure 1: Institutional Framework for Halda Fisheries Management: A Proposed Scheme

Committee (RSMC) will be formed with four representatives (at least two fishers) from each village. Union Parishad Chairman and two members will also become member of the RSMC. RSMC will elect an executive committee through democratic process. Each RSMC will also create a surveillance team to guard against illegal and destructive fishing. At the Upazila level, Upazila River Management Committee (URMC) is suggested but its formation will be little bit different from the lower level institutions. The Upazila Nirbahi Officer will be the Chair and the Upazila Fisheries Officer will work as member secretary. Representatives from the RSMC and selected line ministry representatives/officers at the Upazila level will be the members of the RSMC. Similarly, District River Management Committee will be formed at the District level. Thus, in the institution building process government officials will be integrated in a nested institutional framework. This will provide more power to provide incentive and sanctions, the important element of effective fisheries management.

6. Conclusion

It is easy to dream about an institutional framework but, hard to implement. The implementation process is painful and requires time. It is not an easy task to change peoples' age-old behavior, it requires continuous motivation, skill development and awareness building. Folk songs and Folk Theater may be the important tool to motivate and raise mass level awareness among the resource users along with training and workshops. We have to think about the costs and benefits of introducing fisheries management through co management institutional framework. Major costs are related to institution building, awareness raising and ensuring compliances, most of which are one shot. Benefits may not be limited to the restoration of degraded resources; it may have prospects of developing eco-tourism in the Halda River. If it is possible to restore its spawn, brood stocks and fish production to its previous peak without affecting genetic purity, we can easily brand the product and market it both nationally and internationally.

References

Aguero, M., and M. Ahmed. 1989. Economic rationalization of fisheries exploitation through management: experience from the open-water fisheries management in Bangladesh, pp. 747-750. In R. Hirano and L. Hanyu (eds). The Second Asian Fisheries Forum, Asian Fisheries Society, Manila, Philippines.

Agarwal, A., 2003. Common resources and institutional sustainability. In The Drama of the Commons, Ostrom. E., T. Deitz, N. Dolsak, P.C. Stem, S. Stonich, and E.U. Weber, eds., National Academy Press, Washington, DC.

Dawes, R.M., J. McTavish, and H. Shaklee. 1977. Behavior, communication, and assumptions about other people's behavior in commons dilemma situation, Journal of Personality and Social Psychology 33(l).

Dietz, T., Dolsak, N., Ostrom, E., and Stem, P.C. 2002. The Drama of the Commons, In "The Drama of the Commons", eds, Ostrom,

E, Dietz, T., Dolsak N., Stem, P.C., Stonich, S., and Weber, E.U.National Academy Press, Washington, DC.

Gatcher, S., and E. Fehr. 1999. Collective action in social exchange. Journal o f Economic Behavior and Organization 39(4):341-369.

Halls, A. S., M.G. Mustafa, and M.A. Rab. 2005. An Assessment of the Impact of the CBFM Project on community-managed fisheries in Bangladesh. Report to the World Fish Center, Bangladesh, July 2005,67pp.

Hardin, G. 1968. The tragedy of the commons. Science 162:1243-1248.

Kelley, H.H., and J. Grezlak. 1972. Conflict between individual and common interests in an N-person relationship, Journal of

Personality and Social Psychology 21(2): 190-197.

Kelley, H.H. and A.J. Staheleski. 1970. Social interaction basis of cooperators' and competitors' beliefs about others. Journal of

Personality and Social Psychology 16(l): 66-9 1.

Khan, M.S., and M. Azadi. 2006. Studies and management strategies to revive and sustain the fisheries in the River Halda (Draft

Report), Bangladesh Shrimp and Fish foundation, Dhaka

Kopelman, S. M. Weber, and D.M. Messick. 2003. Factors influencing cooperation in commons dilemma. In The drama of the commons, Ostrom. E., T. Deitz, N. Dolsak, P.C. Stem, S. Stonich, and E.U. Weber, eds., National Academy Press, Washington, DC.

Pomeroy and Viswanathan, 2003. Fisheries and Co-management in Southeast Asia, In "The Fisheries Co management Experience:

Accomplishments, Challenges and Prospects"', Wilson, D.C., J.R. Nielsen and P. Degnbol, eds.,Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London.

Van Lange, P.A.M., W.B.G. Liebrand, D.M.. Messick, and H.A.M. Wilke. 1992. Social dilemmas: The state of the art. In Social

Dilemmas: Theoretical Issues and Research Findings, W.Leibrand, D. Messick. And H.Wilke, eds., Oxford: Pergamon Press.

মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ঃ "হালদা" সমস্যা ও পরিত্রাণ

মনছুর এম. ওয়াই চৌধুরী*

উৎপত্তি

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে শুরু হয়ে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রাউজান ও হাটহাজারী উপজেলাকে ২ ভাগে বিভক্ত করে এটি মোহরা কালুরঘাট হয়ে কর্ণফুলীর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এই নদীর অনেকগুলো শাখা খালও রয়েছে। কেউ কেউ এই হালদা নদীকে দেশের আমীষ জাতীয় খাদ্যের খনিও বলে।

দেশের একমাত্র রূপালী সম্পদের খনি তথা দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র মিঠাপানির প্রাকৃতিক বৃহৎ মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র (প্রায় ২৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে) আজ হুমকীর মুখে পতিত, যার নাম "হালদা নদী"।

পরিচালিত এক জরিপ সূত্রে (স্থাণীয়ভাবে) দেখা যায় কী কী কারণে আজ হালদা এখন ধ্বংসের মুখে। এর প্রধান কারণগুলো ঃ

১. ডিম ছাড়ার মৌসুমে "মা মাছ" শিকার।
২. রিভার জংশনে বিরাট আকারে চর জেগে উঠা।
৩. ইঞ্জিন চালিত নৌকার অবাধ চলাচল ও পানি দূষণ।

হালদার উপর পরিচালিত অর্থনৈতিক জরিপে প্রকাশিত হয় যে, হালদা থেকে এক বছরে আহোরিত ডিমের পোনার মূল্য প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা (সরকারী ভাবে) আর বেসকারীভাবে বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয়দের মতে এই পোনার মূল্য পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশী। যা জাতীয় অর্থনীতিতে এক বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে।

এই তথ্যের সত্যতা যাচাই-এর জন্য জানা যায় যে, ৮০ দশকের আগ পর্যন্ত এই হালদা নদীতে পোনা উৎপাদন ছিল ৪,১১১ কেজি। কিন্তু দূর্ভাগ্য হলে সত্য যে বর্তমানে এই পোনা উৎপাদন ১০০ কেজি বা তারও কম। যা আমাদের জন্য বা সমগ্র জাতীর জন্য একটা হুমকি স্বরূপ।

দেশের মৎস্য আইনের মধ্য মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত সাড়ে তিন মাসকাল মাছের ডিম ছাড়ার মৌসুম হিসাবে আখ্যায়িত করে মৎস্য নিধন বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হালদা নদীতে ফেব্রয়ারীর প্রথম থেকে, সাংগু, চাদখালী, মাতামুহুরী ও কর্ণফুলী থেকে প্রবেশ করে মিঠা পানির শত শত ডিম সম্ভবা "মা

* কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার, চট্টগ্রাম।

মাছ" ডিম ছাড়ার জন্য এবং এক বা একাধিকবার ডিম ছাড়ে। এই সময়কালে নদীর দুই পাড়ের কিছু সংঘবদ্ধ মৎস্যজীবিরূপী সন্ত্রাসী গ্রুপ নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে যথা- ডোমখালী, আজিমের ঘাট, রামদাশ হাট, সর্তার ঘাট, গড়দুয়ারা প্রভৃতি স্থানে জাল পেতে অবাধে "মা মাছ" শিকার করে স্থানীয় কিংবা শহরের বড় বড় বাজারে বিক্রী করে থাকে। বর্তমানে এমনও অবস্থা দেখা যায় যে বড় বড় ডিমওয়ালা "মা মাছ" বাজারে এন কেটে বিক্রি করে আরো বেশী মুনাফা অর্জনের জন্য এক শ্রেণীর ক্রেতা আবার বড় মাছের এবং ডিমের স্বাধ পেতে চড়া দামে এসব মাছ কেনে। স্থানীয় প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর বিভাগ এই দীর্ঘ সময় নীরব ভূমিকা পালন করে। এতে করে মনে হয় কিছু সংখ্যক লোভী মানুষকে প্রশাসন আরো বেশী উৎসাহ দিচ্ছে। এর একটি যথাযথ বিশেষ সমন্বিত প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন। নয়তোবা অচীরেই এই প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র "মা মাছ" শূন্য হয়ে পড়বে।

এখানে উল্লেখ্য যে, দেশের স্থানীয় মৎস্য চাষীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে হালদা নদীতে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মাছের পোনা দ্রুত বর্ধনশীল যার এৎড়ঃিয জধঃব- এ দেখা যায় হালদা নদী থেকে আহরিত পোনা বছরে দেড় থেকে দুই কেজি ওজনের মাছ হয়ে থাকে এবং মাছের স্বাধও আলাদা। অন্যদিকে কৃত্রিমভাবে প্রজননকৃত পোনা সুষম খাদ্য দিয়ে বছরে দুইশত পঞ্চাশ গ্রাম থেকে সাড়ে তিনশত গ্রাম পর্যন্ত বর্ধন হয়ে থাকে। এরই প্রেক্ষিতে কিছু অতিলোভী পোনা ব্যবসায়ী কৃত্রিম প্রজননকৃত পোনাকে হালদার পোনার সাথে মিশ্রিত করে হালদার পোনা বলেও বিক্রি করে।

এদিকে রিভার জংশান চর জেগে উঠায় হারদা নদীর স্রোতের গতিবেগ আশংকা জনক হারে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। চর পরার পূর্বে নদীতে স্রোতের গতিবেগ ছিল ৪৭% ভাগ, আর চর পরার পর তা বর্তমান নদীর স্রোতের গতিবেগ এসে দাড়িয়েছে ২৯% ভাগ। এই রিভার জংশনে চরের জন্য দায়ী মূলতঃ মূল নদীর কিছু বাঁক কেটে দেয়া এবং হালদার সংযোগ খালে সেচ সুবিধার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড বারটি স্লুইসগেইট নির্মাণ করা, এই সব খালে স্লুইসগেইটের কারণে অন্যান্য ছোট মাছেরও অবাধ বিবরণ বাধাগ্রস্থ করেছে যা স্থানীয় মৎস্যজীবিদের আয়ের উৎস প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। তদুপরি নদীর উপর স্থাপিত পিলার সেতুর কারণেও পানি প্রবাহ বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, এতে করে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ কমে যাওয়া নদীও ভরাট হয়ে যাচ্ছে। যাতে করে মিঠা পানির "মা মাছের" নিরাপদ আগমন প্রবলভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। প্রাকৃতিক বাঁক কেটে দেয়ায় "মা মাছের" অবাধ চলাচল ও সীমিত হয়ে যাচ্ছে।

নদীর উপর অবাধে ইঞ্জিন চালিত নৌকা ও পানি দূষণে "মা মাছের" অবাধ চলাচলের উপর বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা প্রজননের জন্য এক বিরাট হুমকী।

এই ব্যাপারে পরিবেশবাদী ও মৎস্য বিশেষজ্ঞরা সোচ্ছার হয়ে সতর্কবাণী জানিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রজননের প্রতিকুল পরিবেশ রক্ষা করার জন্য। এখনই যদি এই ব্যাপারে সঠিক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয় তবে অচীরেই এই মিঠা পানির একমাত্র রূপালী মৎস্য খনি ধ্বংস হয়ে যাবে। যা একসময় শুধু ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে।

সরকার বিভিন্ন সংগঠনের এবং মৎস্য বিশেষজ্ঞদের সতর্কবাণী শেষ পর্যন্ত অনুধাবন করে এবং একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননের কথা বিবেচনা করে দেশের মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য গেল বৎসর চট্টগ্রামে মৎস্যপক্ষ উপলক্ষ অনুষ্ঠানে হালদা নদীকে 'মা মাছের' অভয়াশ্রম করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। এ ব্যাপারে মৎস্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প "হালদা নদীর প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র পুনরুদ্ধার" নামে একটি প্রকল্প অনুমোদন করে যার মেয়াদকাল ২০১০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। যার মধ্যে রয়েছে নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে ২০টি অভয়াশ্রম স্থাপন।

নদীর উজানে ভরাট হওয়া অংশ ও নদীর প্রাকৃতিক কুয়া/ কুর/ কুম জাতীয় অংশ (যেখানে "মা মাছ" ডিম ছাড়ার পূর্বসময় বিশ্রাম গ্রহণ করে) খনন ও পুনঃ খনন। প্রকল্পে আরো কিছু পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। যেমন- হালদা থেকে সংগৃহীত ডিম ফুটানোর জন্য নদীর কিনারার অংশে ২০টি সিস্টান ও পাঁচটি এক হাজার গ্যালন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ওভার হেড ট্যাংক স্থাপন। নদীর পরবর্তী এলাকায় পুকুর ভাড়া নেয়া, তীর সংলগ্ন রাস্তা সংস্কার, নদীতে যন্ত্রচালিত চলাচলের নৌযান সমূহের চলাচলের নিয়ন্ত্রন ও সময়সূচী বেধে দেয়া, নদীর তীরবর্তী ক্ষতিগ্রস্থ প্রকৃত মৎস্যজীবিদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও পূর্নবাসন সহায়তা, প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের জন্য কমিউনিটি সেন্টার স্থাপণ ইত্যাদি।

মন্ত্রণালয় বা সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে সাধুবাধ জানাতেই হয়, যদি তা সঠিক ভাবে পালিত হয়। এই প্রকল্পের কাজ সমূহ এই বৎসর থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে এর কোন কার্যকর পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখনো শুরু করেনি। যার ফলে এখনো অবাধে মৌসুমী "মা মাছ" সহ ছোট বড় মাছগুলো শিকার করে স্থানীয় হাট বাজার কিংবা শহরস্থ বাজারে অবাধে বিক্রি হচ্ছে। এবং অবাধে চলাচল করছে ইঞ্জিন চালিত নৌযানগুলো।

বিশেষ করে স্লুইসগেইটগুলোর এবং পিলার সেতুর ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। কারণ মৌসুমের প্রবল বর্ষণের সময় পাহাড়ী ঢল বাধাগ্রস্থ হয়ে জল জটের সৃষ্টি করে।

হালদাকে বাঁচিয়ে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি এবং "মা মাছের" নিরাপদ আগমন, অবাধ বিচরণ ও সংরক্ষণের জন্য, রিভার জংশনের চর অপসারণ, স্লুইসগেইট এর ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ, সর্বোপরি নদীর তীরবর্তী মৎস্যজীবিদের মাঝে ব্যাপক জনসচেনতা সৃষ্টি করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই হালদা আবার তার সেই প্রাকৃতিক প্রজনন পরিবেশ ফিরে পাবে। সকলের কাছে এই আশা করা যায়।

তথ্য সূত্র

১। মৎস্য অধিদপ্তর।
২। দৈনিক আজাদী।
৩। দৈনিক পূর্বকোণ।

Local Resources of Chittagong Hill Tracts
Present Status and Prospects

Zahirul Alam*

1. Introduction

This paper attempts to review the present status and prospects of local resources of Chittagong Hill Tracts and prepared based on personnel experience, visits, and information collected both from primary and secondary sources.

The Chittagong Hill Tracts (CHT) is a 13,295 sq.km region of hills consisting of Bandarban, Rangamati and Khagrachair districts located in the south-east of Bangladesh. As per the Population Census 2001, the total population of CHT is 1,325 million, of which about 52 percent are tribal people. Thirteen different tribes with different languages and cultures live in the CHT. Historically the Chittagong Hill Tracts enjoyed the status of a self-governing territory and administered by Hill King until the British East India Company annexed Bengal in 1787. The Chakma Raja (King) then signed an agreement after a long armed conflict, under which Chakma territory became a British tributary on the payment of 20 tons of cotton per annum. This was later extended to other parts of CHT. In 1860, the British formally annexed CHT and upgraded its status to a full-fledged district. Subsequently, regulations were promulgated in the form of CHT Manual to regulate administrative affairs of the region in 1900. The current civil, revenue and judicial administration of the CHT substantially draws on the spirit of these regulations.

The major events of CHT history in next phases are (1) construction of 666 meters long and 43 meters high hydro-electric dam of Kaptai in 1957-62 which caused submergence of 54,000 acres of arable land, hardship and out-migration of local population; and (2) the CHT Peace Accord between the Government of Bangladesh and PCJSS (Parbotto Chattagram Jono Sanghati Samity) which provided decommissioning of areas, formation of Land Commission to settle local land disputes and decentralization of authority to the CHT local government.

* Executive Director, Integrated Development Foundation

Chittagong Hill Tracts was very rich in forest resources till the dam was built in Kaptai on Karnafully River. As an impact of creation of lake, population growth, conflict between the PLJSS and the Government, illegal and un-planned cutting of trees from the forests and lack of re-plantation have made many hills barren. The area was also endowed with various fruits and bamboos. But it was very difficult to market them due to very poor communication system.

2. Local Resources

The major local resources of Chittagong Hill Tracts are reviewed in this paper. These are (1) Land, (2) Agriculture, (3) Forest, (4) Kaptai Lake and fisheries, (5) Tourism and (6) Bamboo.

2.1 Land

The whole CHT can be divided into four specific divisions by valleys formed by the rivers Karnafully, Sangu, Matamuhuri and Feni and tributaries. These valleys are the Chengi, Kasalong, Rankhyang, Sangu and Matamuhuri. The hills surrounded by these valleys ranges from 30 meters to 915 meters. The hills, valleys and cliffs are covered with dense bamboos, trees and creeper Jungle. The hills are located along the boundary with Tripura and Mizoram states of India in the North and East and with Myanmar in the southwest. The terrain is the largest mountainous region of the country. It covers 1.32 million hectare, which is about 10% of the total area of the country. Approximately 90% of the area is hilly to mountainous. The mountains are steep and difficult to ascend. Valleys and steep

Table 1 : Categorization of Land

Category-	Nature-	Area-	%
A-Suitable for cultivation-		76,466	3.24
B-Located at the edges of hills, and mountain can be cultivated by preparing terrace		67,871	2.88
C-Located at the edges of hills; and mountain can be cultivated by preparing terrace		3,66,622	15.53
C-D-Located at the top of the mountains, and can be made suitable for agriculture	32,024	1.36	
D-Not suitable for cultivation, afforestation is possible in this area		1,816,930	76.99
	Total	2,359,913	100.00

hills restrict the mobility and impede movement of essential utilities to remote areas. Visibility is also restricted due to hills and dense shrubs.

The total area of CHT is about 3.26 million acres, of which 75% are not suitable for cultivation. A survey undertaken in May 1966 covered about 2.36 million acres of land which are categorized in the following ways:

The major rules for land administration and management as per CHT Manual 1900 are described below:

Rules-10: The Deputy Commissioner acts both as Deputy Commissioner and District Judge;

Rules-12: Transfer of land in any form, mortgage etc. must be registered;

Rules-20: Deputy Commissioner or his representative will act as Registration Officer;

Rules-34: Rules on Lease transfer and sublet of Government Land is as follows:

A (i) A maximum of 5.00 acres of land can be allotted to a hilly or non-hilly family as lease Deputy Commissioner. An additional amount of 5.00 acres grove land could be leased out to the same family. The Deputy Commissioner could also provide additional 5.00 acres of grove land if he finds the activities of the family are satisfactory. But the amount of total allotment of grove land must not exceed 10.00 acres.

A(ii) Grove land shall be approved by the Deputy Commissioner and shall remain tax-free in first 3 years and this type of land could be classified as 3rd class land and later could be charged tax accordingly. Grove land

The mountainous land comparatively with low altitude and suitable for orchard or other plantation/gardens.

34 (1) No lands either agriculture or grove land can be leased out (allotted) to non-residents of CHT.

34(1)(b)(i): For establishing commercial rubber or other plantation or gardens, Deputy Commissioner can provide long term lease of maximum 25.00 acres, while this limit is maximum 100.00 acres in case Commissioner. Approval from the Land Ministry is required if the amount exceeds 100.00 acres.

34(1)C(i) The Deputy Commissioner can lease out maximum of 10.00 acres outside municipal area and 5.00 acres within municipal area for establishing industry to either permanent or non-permanent residents. The non-permanent residents will pay 100% and permanent residents will pay 50% of market price as lease money for this land.

C (ii) The amount of tax to be paid per year is 0.5% of the market price of the land.

D(i)(ii) The Deputy Commissioner can also lease out for residential purpose in the same way. But the family is not required to pay lease-money if the land is in rural area. The annual tax in this case is 0.25% of the market price of the land.

D(iii) The Deputy Commissioner can not lease out for residential purpose more than 0.30 acres in urban area without permission of the Ministry.

Rules-37: All the lands except reserve-forest will be divided into "Mouza". The area of Mouza will be demarcated by the Deputy Commissioner.

Rules-40: Administrative Authority of Circle Chief and Headman:

Mouza headman is responsible for mitigating all disputes in the Mouza as per their law. He can fine maximum of Tk. 25.00 and can force to return theft goods. In such a case circle chief can fine maximum of Tk. 50.00.

Circle Chief & Headman:

In 1900, CHT was divided into 4 circles. These are- (i) Chakma Circle, (ii) Bomang circle, (iii) Maung circle and (iv) government Reserve Forest. The Rajas of each Circle is Circle Chief. He is assisted by Mouza Chief who are called Headman. Headman are assisted Karbari and Roaja at Para level.

Rules 41: Control of Jhum Cultivation: The Deputy Commissioner controls the Jhum cultivation. He can stop the Jhum cultivation.

Rules 41(A) Headman is responsible for the maintenance of resources and wealth of the mouza.

Rules-42: Every Jhum cultivator shall pay tax for Jhum land to headman.

42(A) Headman will maintain a registrar on Jhum related information.

42(12) Headman shall submit the Jhum register to Circle Chief on 1st June of every year and Circle Chief shall submit them to Deputy Commissioner on 1st August of every year.

Rules-48: The Deputy Commissioner shall appoint and dismiss Headman in consultation with Circle Chief.

Rules-50(1) Headman can allot a maximum of 0.30 acres of Khas land to a hilly person in his Mouza in rural area.

At present, clearance from District Council is also required for the transfer and registration of any land in Chittagong Hill Tracts.

The majority of the people particularly poor tribal poor are not aware of land ownership and the process of getting land from the government on lease. As a result majority of them do not own land. However, they take land from the headman for Jhum cultivation as mentioned earlier.

We found in some places that the government rehabilitated tribal families with 5.00 acres of land, but most of them sold them out and became landless again. This was mainly because the programme did not immediately provided rehabilitation support (financial & technical). Another great problem in the CHT with land is proper demarcation of land. Most cases the area mentioned in the ownership title does not match with the possession. There are cases that some influential people possess land without ownership title.

Therefore, a total extensive survey of land is very important. This will not only help to resolve many local land related conflicts, but also will help to rehabilitate displaced families through proper distribution of land.

2.2 Agriculture

There are mainly 4 types farming in the CHT. These are, (i) Jhum cultivation; (ii) Cultivation at the hill-side plains; (iii) Cultivation in Lake-side land; (iv) Fruits and vegetables in high and mountains land.

Jhum Cultivation

The main profession of tribal people in CHT was agriculture, and Jhum was the only system of agriculture production. The tribal people of CHT has been cultivating land through this system since old days. In Jhum system, the farmers cut the shrubs, small trees and branches of big trees and just leave them at the sites. They burn them into ashes when they dry. They believe that ashes increase

the fertility of the land. They sow seeds of deferent crops in one pit, just before the rains start. They can harvest these crops one after another beginning from end of July.

Cultivation at the Hill-sides Plain

The cultivation at the hill sides plains started by non-tribal people with plough sometime in 1865. Subsequently, this system spread throughout Chittagong Hill Tracts. The farmers now use improved technology in this system.

Lake-side lands

People of Lake-area can use this land in dry season only when water-level in Kaptai Lake goes down for one crop only. The total area available from the lake during dry season is about 13,552 Rectors. People produce paddy, watermelon, vegetables etc. in this land. Crops production affects here when there is early rain or emergence of land from lake in late.

High and Mountainous land

People use their land of this category to produce vegetables and various spices and fruits. People produce verities of fruits in this type of land. These mango, jam, jack fruits, pineapple, orange, cashew-nuts, banana etc. The production of Jackfruits, pineapple and banana are huge. The production can even be increased by several folds. The people face serious problem during the season in marketing their products which bring down the price very low. A plenty of such land are un-utilized & under utilized which could be developed for more production.

For getting optimum returns from this land, the following measures can be considered.

- Land survey and specific demarcation of land;
- Land Reform;
- Creation of outlets for marketing of products;
- Preservation facilities like cold-storage;
- Financial and technical support to the farmers;
- Establishment of fruits and food processing plants.

2.3 Forest

Chittagong Hill Tracts was enriched with forest resources even 50 years ago. A majority of population of this area were directly or indirectly dependent on forest for their livelihood. Forest resources were damaged severely due to Kaptai Lake and abnormal situation prevailed in the area for the last 3 decades. In many places,

the deep green forest became barren. Population growth, unemployment and lack of appropriate planning and its implementation also contributed in deforestation process. Many people think deforestation started from the day when government forest management and control system established about 150 years ago due to mainly corruption of the people involved in the system. Due to Kapatai dams, not only submerged a large part of the cultivable area but also of about 46,76 acres of reserve forest had also to de-reserved for the rehabilitation of displaced people which also damaged a large area of forest. Burning of forest for Jhum cultivation also damages the forest to a great extent. Deforestation had severely affected economy, ecology and bio-diversity of the area.

Chittagong Hill Tracts was once the safe-heaven of wildlife. This area was inhabited by various species of animals. There were about 75 species of mammals, 100 species of birds, 25 species of reptiles and 7 species of amphibians. But these animals are diminishing gradually in this area due to un-planned Jhum cultivation and rapid deforestation.

The expansion of Jhum cultivation due to increase in population has led to un-planned Jhum cultivation causing low productivity. The new settlements and habitation are also contributing to deforestation to a great extent. On the other hand, the government also does not have plan for aggressive afforestation programme. The government must take the following measures in order to protect the destruction of forest.

- Stop illegal occupation of forest land;
- Rehabilitation of Jhumia
- Jhum cultivation in a planned way without destroying forest and bio-diversity.
- Take necessary action to stop smuggle of timber from the forest
- Afforestation in barren hills and mountains should immediately be started on participatory basis involving the local poor families.
- The Development Organizations including MFIS can be involved in the afforestation programme.

2.4 Kaptai Lake and Fisheries

Kaptai Lake is an artificial lake created in 1961 due to establishment of Dam in River Karnafully. The average size of water body is 58,300 hectors with average depth of 9 meter. Kaptai Lake is very rich in local fish diversity. There are 76 types of species of fishes in Kaptai Lake of which 42 species are raised harvested commercially.

The capacity of fish production of Kaptai Lake as per its size is about 31,360 metric tons. But as per statistics of Landing Station of Fisheries Department at the Lake the amount of marketed fish per annum are about 6000 metric tons, which is about 20% of the capacity. The main problems in achieving the target are as follows:

- there was not suitable plan for fish cultivation during the creation of Lake;
- the bottom of the lake is not suitable for harvesting fish;
- the depth of the lake is very high which is not favorable for fish production.
- gradual damage of hatching place of Rue at the upper part of the lake-due to situation;
- use "current net" by the fishermen for catching fish;
- lack of supervision and protection pirates;
- illegal fishing;
- lack proper storage facility and lack of knowledge of packaging;

Measures

(i) improvement in management and planning;
(ii) facilities for exporting fish directly from Rangamati should be created.
(iii) quality control, processing and cold storage facilities should be created;
(iv) plant for producing improved dry fish in scientific way, which can also be exported.
(v) dredging of lake in required places.

2.5 Tourism

The Chittagong Hill Tracts is a beautiful and strange piece of land with rocks, hills forests, lakes and colorful tribal life & culture. It is really beautiful combination water, hills forests and plains which easily attracts tourists both from country and abroad. The whole Chittagong Hill Tracts can be developed and decorated to make one of the most attractive tourist resorts of the world. People from Europe, America and other continents will come here to spend their holidays once we can ensure law and order safety.

2.6 Bamboo

Chittagong Hill Tracts is enriched with bamboo resources. CHTs contributes major portion in bamboo production of the country, and most of them are natural. However, there are no conservation plots or reserves bamboo forest.

Quality of the bamboo products are gradually decreasing mainly because of (i) burning of hills for Jhum cultivation; (ii) lack & complication of supervision from the forest department and (iii) irregular felling/harvest.

The government should declare reserve Bamboo sanctuaries in three hill districts and proper felling policy should be formulated in order to get good and quality harvest. The current demand and supply of bamboo estimated around 810 and 750 million respectively. The shortfall alarmingly increases by the year 2008 in 1013 due to expected large-scale death of a major forest bamboo species (Melocanna baccifera). Bangladesh Bamboo has good international market particularly in Middle East and Pakistan.

3. Conclusions & Recommendations

The Chittagong Hill Tracts is endowed with enormous resources, which is decaying day by day due to lack of proper planning, management and lack of agreement between the tribal leaders and the government on the strategy of the overall development of the area. The agreement between the Government and tribal leader on goals, objectives and strategy are very important for the development of the area.

A long-term strategic plan indicating present weaknesses and strengths, list of actions required for the development of the area and a detail action plan would be very helpful. Both government and tribal policy and decision makers should be involved in the process of preparation of the strategic plan. Some issues which I think would be helpful in designing strategic plan of Chittagong Hill Tracts are presented here.

3.1 Land

- implement land survey and have specific demarcation of land as in the plan land
- implement land reform and distribution of land to displaced families with support services and follow-up for its proper utilization.
- the land distributed to the displaced families shall not transferable.
- the poor and landless people of CHT should ;make aware on the process and importance of land ownership.

3.2 Agriculture

- Land survey and specific demarcation of land;
- Land Reform;

- Creation of outlets for marketing of products;
- Preservation facilities like cold-storage;
- Financial and technical support to the farmers;
- Establishment of fruits and food processing plants.

3.3 Forest

- Stop illegal occupation of forest land;
- Rehabilitation of Jhumia
- Jhum cultivation in a planned way without destroying forest and bio-diversity.
- Take necessary action to stop smuggle of timber from the forest
- Afforestation in barren hills and mountains should immediately be started on participatory basis involving the local poor families.
- The Development Organizations including MFIS can be involved in the afforestation programme.

3.4 Kaptai Lake and Fisheries

(vi)improvement in management and planning;
(vii)facilities for exporting fish directly from Rangamati should be created.
(viii) quality control, processing and cold storage facilities should be created;
(ix)plant for producing improved dry fish in scientific way, which can also be exported.
(x) dredging of lake in required places.

3.5 Tourism

- ensure law & order and security;
- ensure cleanliness and environment friendly public transport;
- undertake beautification scheme ;
- encourage private sector to establish holiday resorts with all possible amenities.

3.6 Bamboo

- Rehabilitation of Jhumia
- Jhum cultivation in a planned way without destroying bamboo forest.
- Supervision and maintenance of bamboo forest by the Government

References

1. UNDP and Government of Bangladesh, "Joint GOB/Donor Risk Assessment Mission Report on the Chittagong Hill Tracts", UNDP, Dhaka, August 2002.
2. Elated by Dr. Jafar Ahmed Khan, "Rangamati Baichitrer Oikkatan", Rangamati, Zila Proshashan, Rangamati, April, 2004.
3. IDF Annual Report 2004, Dhaka, 2004.
4. Raihan "Report on the Survey of Bamboo Resources and their utilization in Bangladesh" (mimeo), Chittagong, January 2005.
5. Hill Tracts Manual 1900.
6. AusAID, "Building Capacity for Sustainable Development in the Chittagong Hill Tracts", AusAID (mimeo), Dhaka, August, 1999.

Government Expenditure Composition- Impacts on Growth of the Economy[1]

Mohammad Altaf-Ul-Alam*

Introduction

Fiscal policy could play pivotal role for stabilization and growth in developing countries which are thriving to eradicate poverty. If fiscal policy helps to facilitate private sector then it is better for the country rather than replacing private sector activities. Government should provide or spend on only those goods and services which private sector cannot produce due to the non-exclusion principle and free rider problem of public good. Government spending comprises government consumption, investment, transfers, subsidies and interest payments. Only eulogistic role of private sector cannot enhance the development of a country. Public sector has greater responsibility to ensure a sustainable and high growth rate. The impact of fiscal policy on growth depends on two indicators (1) the expenditure/GDP ratio and (2) Composition of government expenditure. The first one indicates the size of the government. The second one is also very important but was always neglected by economist during policy making. Composition of expenditure is not well thought out during the preparation of fiscal policy. Although in macroeconomics there are lot of research regarding the impacts of total government expenditure, a few research has been done on the composition of government expenditure. In this article our objective is to discuss the impacts of the change of government expenditure composition starting from an initial position and to sort out pertinent fiscal policy.

We want to describe here 1) Impacts of the change of government expenditure composition according to economic classification on income, growth and stabilization 2) Impacts of the change of government expenditure composition according to sector wise classification on growth and stabilization. The discussion is for a developing country perspective with certain assumptions.

Related theory and literature review is presented first. Then we assumed a model developing country with some assumptions. After that Government expenditure

1 The views expressed herein are those of the author and do not necessarily reflect the views of the Finance Division

* Senior Assistant Secretary, Finance Division, Ministry of Finance, Government of Bangladesh

composition according to economic classification is discussed. Then sector wise government expenditure composition is explained especially the way of calculating the priority sector.

Theory and Literature Review

Theoretically, output and price level is determined by the intersection of aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand and aggregate supply is determined by various variables. Government expenditure and government revenue are only two of many variables which determine aggregate demand. These two variables also can affect aggregate supply if structural reforms are done. Here we start from explaining the relationship between aggregate demand and growth and then explain the impact of government expenditure composition on growth. Aggregate demand management policy can ensure sustainability if there is internal or external imbalance in the economy. Three major types of internal imbalances are (1) when aggregate demand is greater than potential output (2) when fiscal deficit is monetized (3) when aggregate demand is less than potential output (Green, 2006). In all three cases government is capable of doing something to overcome the problem derived from imbalance, although in case (2) government may not be capable when monetary authority is completely independent to take its decision (Sergent and Wallace, 1981). Internal imbalance is also linked to external imbalance. Major external imbalance happens due to current account deficit. Heavy external debt service burden also creates external imbalances. These internal and external imbalances are also interrelated as we know that in short-run,

$$S-I=(Sg-Ig)+(Sp-Ip)=CAB=(X-M)+Yf+TRf$$

where S and I are national savings and investment, Sg and Ig are government savings and investment, Sp and Ip are private savings and investment. CAB is the current account balance.

The imbalances we have so far talked create problem for the economy such as high inflation and sluggish growth. Government can apply stabilization and structural policies as remedy for these imbalances. Two major stabilization policies are 1) Adjustment using AD which is called the expenditure reducing (augmenting) policies 2) Ensuring that relative prices in the economy gives appropriate signal through change in exchange rate which is called the expenditure switching policy. (Green, 2006). There are economic theories which prove the rationale for stabilization measures. Many economists believe that sustainable economic growth requires establishing reasonable price stability and a viable external position (Hemming et.al. 2002). We can also reduce imbalance

by adjusting AS. These are called structural policies and are long-term policies like price adjustment and liberalization, reforms in tax structure/rules, privatization etc. Again Aggregate Demand could influence aggregate supply in both short-term and long-term. Such as government investment on building roads, bridges or schools help to increase the aggregate supply. Aggregate demand increases the productive capacity and thus the ability of the economy to supply full employment level of production.

Keynes is the pioneer in explaining demand side effects of fiscal policy. He starts with basic assumptions 1) price rigidity 2) Excess capacity and 3) consumption as a function of current income. With these assumptions Keynes explains that, if a government spends more, then AD will increase and it will increase income. However how much aggregate demand will increase for a certain amount of government expenditure increase depends on various factors like change of interest rate, price level etc. Extension of simple Keynesian model allow for crowding out through induced change in interest rate and exchange rate i.e. explained by the IS-LM framework (Hemming et.al. 2002). The extent of crowding out affects the size of fiscal multiplier. So if there is less crowding out then output effect is high but high crowding out limit the performance of fiscal policy. The amount of crowding out depends on different types of relationship between investment, current income, interest rate, money demand and national income.

In an open economy, extent of crowding out depends on the system of exchange rate and capital mobility. In case of price flexibility crowding out happens with greater complexity. In an open economy with flexible exchange rate, there is scope that exchange rate is adjusted with domestic prices. If the domestic price responds rapidly with exchange rate then competitiveness of domestic goods are not hampered and exports are not reduced or imports are not increased. Now it is easily understandable that in case of fixed exchange rate and flexible price crowding out is higher.

Aggregate demand increase acts as the driving force for growth in short-term. Increased aggregate demand compels government to prepare deficit budget. So there are plenty of literatures on government budget deficit and its impact on growth. John Maynard Keynes first states theoretically the idea of budget deficit and included it in macro economic model as a variable. During that time the notion of cyclically balanced budget was developed as a norm for fiscal behaviour. Pre-Keynsian presumption was that in peacetime the budget should generally be balanced or even in surplus to pay off the government debt generated by wartime deficits. Keynes said that the aggregate demand depends on the budget deficit or fiscal policy (Fischer and Easterly,1990). But the concept of

balance budget multiplier shows that deficit is not the only measure of the effect of fiscal policy on aggregate demand. The theoretical development of life cycle and permanent income theories of consumption by Franco Modigliani and Milton Friedman is a deviation from standard Keynesian analysis on the effects of fiscal policy. Barro-Ricardo equivalence proposition is also an important contribution about consumption behaviour and thus has effect on aggregate demand. Although this theory was later rejected by Ricardo, Harvard professor Robert Barro have developed more sophisticated variations on the same idea particularly using the theory of rational expectations. Sargent and Wallace (1981) in their article "An unpleasant monetarist arithmetic" says about the coordination of monetary policy and fiscal policy and assumes that fiscal authority moves first. If fiscal authority has the dominance, monetary policy cannot restrain inflation. Because if the fiscal authority's deficits cannot be financed by new bond sales (i.e. less demand for bonds) then the monetary authority is forced to finance the deficit with additional seigniorage which creates inflation.

All the above discussions are on total amount of government expenditure and how aggregate demand could be a driving force for economic growth in short-run. Now we want to dissect composition of government expenditure which is suitable for growth in short-term and long-term. Theoretically we cannot mention any approved shape of total government expenditure. Because, initial condition of the fiscal variables are very important, when we want to predict the impact of government expenditure. The economy could be highly indebted and thus external imbalance could be very high. In 1960s economists gave emphasis on finding out the relationship between fiscal policy and economic growth. In their model Arrow and Kurz (1970) assumed that consumers utility increase by private consumption as well as public capital stock. and all government investment are productive. Barro's work on endogenous growth has generated a model linking public spending and long-term growth rate of the economy. He takes government expenditure to be complementary with private consumption. Barro (1990) and many other economist were emphatic on segregating the role of public goods and services that enter into families utility function and those that complement private sector production. That is he differentiates public expenditure between the expenditure that facilitates private consumption and that which complement private sector production. Related literature regarding productive and unproductive government spending are Landau,1983; Aschauer, 1989; Barro 1990,1991 etc. One of the relevant literatures regarding our topic is by S.Devarajan et.al.(1996) presents a theoretical model and also have done empirical analysis. His model is on a strict assumption that budget is always balanced. He proves that a shift in composition to increase the growth rate depends both on the productivity of the components and also the initial share of

the components. His empirical results suggest that expenditures which are normally considered productive could become unproductive if there is an excessive amount of them. So the belief that capital expenditure always increases growth may not be true and it might be unproductive if the share of capital expenditure is high. The reduction of domestic financing during contraction has better effect than the reduction of foreign financing. The empirical evidence reinforces the active role of expenditure composition in promoting economic growth in low income countries. He also adds that additional research is needed to disentangle the channels through which fiscal policy affects growth. Another empirical research on expenditure composition is done by Gupta et.al.(2002). His study is on 39 ESAF and PRGF supported countries during the period 1990-2000. His data analysis proves that, in low income countries fiscal consolidations are not harmful for both short and long-term growth during that period. A reduction of one percentage point in the ratio of fiscal deficit to GDP leads to an average increase in per capita growth of 1/4 to 1/2 of a percentage point both in the long and in the short term. Perotti (1999) shows that consolidation tend to be expansionary when debt is high or growing rapidly, while Alesina and Perotti (1996) and Alesina and Ardanga, (1998) find that private sector responses to fiscal policy depends not only on the size or continuity of fiscal stance but also on the budget composition. Fiscal adjustments that rely primarily on cuts in transfers and wage bill tend to last longer and can be expansionary, while those that rely primarily on tax increases and cuts in public investment tend to be contractionary and unsustainable. Some empirical research has been done only on industrial countries to find out the conditions of small or negative fiscal multiplier. It happens that for some low income countries fiscal contraction might be expansionary by changing the ratio of expenditure composition. This means that there are unproductive or unnecessary expenditure which should be cut down. This expenditure reduction actually increases the growth. It is seen from different studies that in industrialized countries, growth is more sustainable in case of reducing transfers and wage bill than tax increase and capital spending cut. Ardagna (2001) shows that fiscal stabilization that rationalize public employment can stimulate the economy , provided that public employment does not have a positive effect on the productivity of capital and labour.(Gupta et.all 2002). Some economists also explain the impacts of fiscal policy assuming a production function approach. One of them is Phillip Gerson (1998) who assumes a production function with minor modification of the standard neo-classical form. Fiscal policy can affect the aggregate output through various ways/channels. Instead of total factor productivity he added two more variables in the production function. These are quality of the stock of labour and similar measure for physical capital. Increasing the amount of government expenditure for increasing the productivity of labour and capital could increase output growth. However, there

are two types of expenditure composition. One could be functional and the other could be sectoral. Functions are like pay and allowances, supplies and services, new purchase etc. Sector-wise components are like education, health, energy, local government etc.

Explanation with respect to a developing country perspective

There are gulf of differences between developed and developing countries in various aspects like availability of labour, capital, resources, infrastructure, technology, law and order situation, anticorruption institution, laws related to development etc. However we are assuming a country with the following assumptions.

a) It is a developing country with plenty of labour, there is unemployment or disguised unemployment in the country. It happens if the country has market imperfection, sticky wage situation or for using capital intensive technology.

b) There is lack of law enforcement or not a better law which affects revenue earning of the government. Only law enforcement and strengthening of administration can increase the revenue earning i.e. without increasing the tax base and tax rate. Expenditure/ GDP ratio is low.

c) Government expenditure is not allocated among sectors/ministries according to priority. Rather budget is prepared on incremental basis. Ministries does not have long-term policy framework. So marginal social benefit among sectors are not considered. Ideal way is to calculate marginal social benefit of different sectors and additional amount is allocated chronologically from the highest one.

d) Many people live below poverty line income, so if real income increases then demand for essential goods increases at a higher rate than demand for luxury goods.

e) A vivid phenomena of most of the developing countries is that lot of people are working outside in different parts of the world. So although GDP is low, GNDI is very high. High GNDI keeps the external sector in a better position. Government buys food or import from outside by internal or external borrowing. The people who are earning from other countries, at first improve their daily consumption of food staffs, and then they invest on buying flats and plots. So investment is not happening on commerce and industry rather it is happening on long-term needs of the people. A few people are investing to set up new industries. It has hurdles and also various types of risks.

f) It is assumed that fiscal dominance is prevailing. So monetary authority is in associative role to ensure sustainability and growth.

In such a country, a pertinent and prudent fiscal policy would be discussed. Our aim is to find out comfortable amount of total government expenditure as percentage of GDP and suggest a prudent composition of government expenditure for enhancing growth. Expenditure composition could be sector-wise or function-wise. Function wise classification of total expenditure are: 1) Purchase of Services like payments to employees, 2) Purchase of final goods and utilities like purchasing pens and papers and also paying electricity bills etc., 3) Purchase of capital goods like materials for public hospitals and materials for road construction and expenditure against depreciation i.e. repair and maintenance, 4) Interest payments, 5) Subsidy, 6) Net transfer etc. The impacts of the change of the above components on GDP growth, inflation and external sector of the economy are not similar and very much complex in reality.

It is difficult to suggest the best amount of total government expenditure of a country. Firstly a country can't raise tax as much as it wants. It is important but unpopular sometimes called necessary evil. However raising tax today with better law enforcement could have inter-temporal benefit. It depends on the attitude of the political leaders how much they want to sacrifice for the future generation. But even if politicians are afraid to be unpopular, they should think of the future as being lavish today could do tremendous harm in future blocking the outlets for sustainable growth.

There is link between 'Government expenditure to GDP' ratio and the GDP growth rate. It could be an upward sloping curve with diminishing slope. If expenditure/GDP ratio is low then GDP growth rate is low. If expenditure GDP ratio increases gradually then GDP growth rate also increases gradually. But there is a limit to increase government expenditure because government should only provide goods and services of public nature. Government should not produce private goods. So it is assumed that after certain level the upward sloping curve

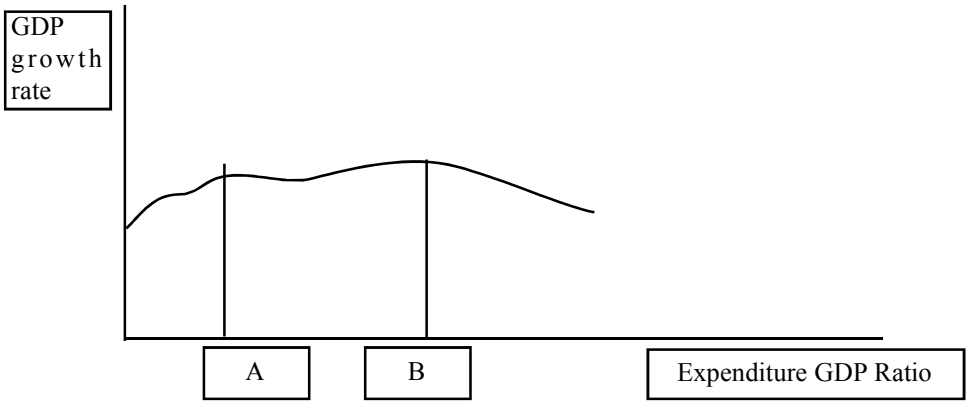

would be flat and later on if expenditure ratio increases then expenditure goes to unproductive areas of the economy. Part of government expenditure is financed from tax and non-tax revenue. The rest amount is financed from domestic and foreign loans. These loans have also different types of adverse impacts in both short-term and long-term which are not covered by this article. Let us start from a zero situation or balanced budget Eg-Rg=0, where Eg=Government expenditure and Rg= Government revenue. In the economy, there is no pressure or impact of deficit financing. Ratio of government expenditure to GDP is linked to GDP growth rate. This can be shown by the following figure,

The above figure is showing that as the expenditure/ GDP ratio increases from A to B, it increases the growth rate of the economy. But there is a limit to increase the amount of government expenditure. If government looks after everything, then there will be a downward pressure on growth as private sector activities would be constrained.

Economic category wise explanation

Let us start our discussion regarding purchase of services by the government. Expenditure on wages and salaries could change either for new employments and retirements or salary and wage increase (New pay commission). Public sector employment opportunity increases in every country. If population growth rate is positive, then more people enter into the labour force. A country with increasing population needs higher number of people from all professions i.e. more doctors and more civil servants. In the same way government also needs to employ more people than the number of people going for retirement. However, government expenditure increases over time for net new employments and for adjusting the salaries with the inflation rate. Government pays wages and salaries for buying 'service' from the people. On the other hand a government employee sells his service to the government. This expenditure is a part of the aggregate demand of the economy. There are empirical investigations on this area (Gupta et.al. 2002). Gupta and others find that spending increase in wages and salaries decreases the growth rate of the economy in long-run. Although this study says that pay and allowances has adverse impact on growth but in reality it may not be true in our model country. It depends on total population of the country and number of people in government services. Expenditure on wages and salaries could create inflation as it increases demand for consumer goods in short-term. In the long-run demand and price increase actually encourages the suppliers to produce more which will reduce the price and bring the economy in equilibrium only if other things remain same. Short-term impact also depends on the acts of the monetary authority. So we cannot make a conclusion about inflation as it is an outcome of aggregate impact- both fiscal and monetary. The impact on external sector depends on the

behaviour of the people which depends on the marginal propensity of imports. Also it depends on the degree of trade liberalization and other status with neighbouring countries. It increases demand for consumer goods, so it will also increase demand for imported goods which could create current account imbalance. Now if exchange rate is flexible and capital is not mobile then crowding out would increase the interest rate but there is no exchange rate appreciation. The exchange rate will only depend on the flow of goods and services i.e. on the current account components. So there could be exchange rate depreciation due to increased demand for imported goods. In short-term expenditure on purchasing services could create stabilization problem but in long-run it might be expansionary as more police, teachers, doctors or judges will make the society better off, if they have integrity and honesty in work and there will be trivial risk for investment. People will be encouraged to invest.

Expenditure on purchasing final goods and utilities includes payments for pens and papers, petrol and lubricant, office materials and miscellaneous expenditures and utilities like telephone, electricity etc. These are operational expenditures of the government. So it creates demand for consumer goods and services. But a portion of this expenditure goes to the autonomous bodies of the government although some are non-tax income of the government. If these bodies are financially solvent then government has to pay lesser amount of money to them as grants or loans-indicates lower degree of quasi-fiscal expenditure. These service providing agencies has to fix prices consulting with the government and in most of the cases these are administered prices not the competitive market prices. It ensures better service to the people by the government employees. Estimating the amount of expenditure is very important as there is immense scope of misuse. It is mentionable that utility price increase has both positive and negative effects. On the one hand due to administered prices fixed by the government, they get grants or loans from the government. So government has to allocate grants or loans to these autonomous bodies. On the other hand if they are independent and run the business like a private firm then government will not need to give resources to them from the revenue income of the government. It is not good to allow market prices for these semi-public goods. If utility prices are increased by the government then like other private businesses, it increases the cost for the government as well as for all the people of the country. This could create price level increase and thus inflation. Expenditure on utilities could be higher, if public sector gradually becomes bigger.

Expenditure on ‘resource acquisition, purchase, public works and repair & maintenance’ is investment expenditure. New things are bought here like furniture, computers, raw materials, machinery and parts and other capital equipments. This type of expenditure also includes new school buildings, repair

and maintenance of roads etc. In 1946, Domar argues that investment has a dual nature. That is, an increase in investment increases aggregate demand in the short run; and also increases productive capacity in the long run. Keynes did not mention that investment increases productive capacity. These investments have short-term and long-term impacts on the economy. In short-term it increases aggregate demand and income and foster growth. But if the demand is more than the capacity of the economy then inflation happens. Here we can mention that growth depends on the amount of crowding out and inflation. However in the long run it could create a downward pressure on price or at least not increase the price as this type of spending increases the productivity of capital and labour. Public sector capital expenditure acts as a catalyst to increase the productivity of both labour and capital. Suppose government is going to build a new road. The communication facility will reduce the transport cost and also the risk of damage that would have been due to time consuming old transportation system. This type of expenditure will have positive impact on the economy. Empirical evidence also shows that if the share of capital expenditure increases in total expenditure then it has positive impact on growth. A portion of this expenditure consists of imports. If capital goods are available in the domestic market, then there will be less pressure on external sector of the economy. If there are imported goods then it will have impact on balance of payments as well as on exchange rate. Impact on price level could be better as this type of expenditure reduces the cost of production. Although this may not be in the short run due to supply constraint but must be in the long run

Expenditure on transfer is very important as it increases the aggregate demand. In case of transfer income is shifted from rich individual to the poor. It helps to maintain social fabric (Gerson 1998). There are many literatures on the relationship between unemployment and crime. Gary S. Becker's (1968) seminal paper on "Crime and Punishment: An Economic Approach" was a breakthrough in Economics. He says that a person commits a crime when the expected utility by doing the crime is greater than the utility he could have gained by using his time and resource in other activities. His paper increases concern over the public cost of crime along with the relationship between economic variables and crime. So if the government gives unemployment benefits, then crime rate is reduced. Sala-i-Martin (1992) considers data of 75 countries and finds that public transfers have positive effect on per capita income growth. On the other hand some other economists (Von Hagen et.al. 2001) empirically proves that if government cuts transfer payments for ensuring fiscal adjustment, then it is expansionary. Presumably it does not increase saving as it is given to the poor people of the society. Reduced saving rate would reduce capital formation in the country. But in long-term, as this money is increasing the demand it will also increase the

supply if price increases. Transfers normally increase aggregate demand for essential goods. As here we assume a country with plenty of labour and there is massive unemployment, here government needs a lot of money to pay for unemployment benefit if it wants to. It has a bulk fiscal burden which most of the developing country's government cannot bear with poor government expenditure/GDP ratio. However it increases the welfare of the people of the country which could reduce social unrest and congenial atmosphere in the society. In the long run this type of social benefit could also create economic benefit. In these circumstances transfers should be given only to the most vulnerable groups of the society like old people, distressed woman, acid burnt woman etc. The area of transfer should only be increased for higher level of government expenditure GDP ratio. Transfers may have impact on inflation. If transfers are an important share of total government expenditure or GDP then this could create inflationary pressure on essentials. But if transfers are given in kind, government has to buy items of transfers from local or international market. If it is imported then it will also affect the external sector of the economy. There is possibility of exchange rate change.

Subsidy normally hampers the free market pricing system. But it helps the producer to produce higher amount of output which otherwise would have been imported. Subsidy on inputs helps to reduce price of the commodities or not increase the price. Subsidy is acceptable if it ensures a certain degree of fairness in income distribution. Suppose fertilizer subsidy helps to prevent price hike of food items and helps people from all walks of life. It is also true that subsidy should be given when government has minor deficits.

Interest payment also has impacts on the economy. Interest payments are determined by the agreement of the government with internal or external lenders. Sometimes borrowing becomes essential for running day to day activities of the government. In many cases this happens due to poor revenue performance. If government has to pay very bulk amount of interest due to high debt then it has negative effect on the economy. In short-term government cannot reduce the amount of interest payments. So this part of expenditure composition is beyond the authority of fiscal policy. Fiscal authority can only reduce the long-term burden.

Sector wise Priority Calculation

Now let us look into the sector wise allocation of government expenditure. Initiative should be taken to improve the sector wise optimum allocation. There are many sectors like human resource development (health, education etc.), energy, public administration, local government, agriculture & fisheries, industry

& commerce etc. We start from existing allocation and suppose total expenditure has increased due to higher level of revenue income. Now our concern is to find out the best way of additional resource utilization. Here marginal cost/benefit or marginal social cost/benefit of different sectors should be calculated. At first, resources should be allocated in the sector with the highest marginal social benefit. According to the ranking – resources could be allocated to different sectors of the economy. Here it should be mentioned that marginal amount is different for different sectors. We can build a school with smaller amount of money than building a power plant. So if a country has enough money to build a power plant and its marginal social cost/benefit is higher than building five or six schools (which is possible with same amount of money) then definitely allocation should go to the power plant.

The concept of marginal social cost/benefit is different from the concept of marginal cost/benefit. But calculating marginal social cost/benefit could be a hectic task and should be done with caution. In many countries budgeting is done as incremental basis. Marginal social cost/benefit concept is not considered in public sector which is a bottleneck for sustainable development of many developing countries. Sometimes it is also envisaged that marginal benefit is negative but allocation is increasing at a very high rate. This happens due to the pressure groups in the government. Many developing countries are unable to concise their unproductive expenditure although it's marginal benefit could hardly be positive.

Now let us look at the impacts on growth. If we could follow the marginal productivity principle then expansionary fiscal policy could ensure sustainability and growth. Sector wise expenditure also has short-term and long-term impacts. In short-term it increases aggregate demand thereby impacts on growth if there is little amount of crowding out. This demand increase also has impact on increasing productive capacity of the economy. But it takes time. In medium or long term, benefits come out from present day expenditure. A power plant takes time to be installed, in schools or training institutions people learn for many years then the society gets the benefit. So government expenditure continuously increases the productive capacity of the economy and this shifts the aggregate supply schedule rightward and we are always assuming a higher level of full-employment level of output. In the assumed country expenditure should be increased in both consumption and investment as the expenditure to GDP ratio is very low. The investment on education, health, nutrition, infrastructures have short-term and long-term effects. These investments are associative and help to facilitate the economy in a better way to ensure equal price almost all over the country. So although in such a country both government consumption and investment is necessary, growth rate of government investment should be higher.

Conclusion

In the assumed country firstly, internal resource mobilization is needed as the government expenditure to GDP ratio is low. The country can do it only by reducing tax evasion. No change in income tax rate or tax base is required. Secondly, special thrust should be given to governance, act or rule formulation and property ownership laws. Governance can be ensured only by framing self-explanatory and transparent acts, rules and regulations with a view to strengthen civil services. Governance also includes good property rights situation. These actions need higher level of government expenditure on public administration. Thirdly, Government should look at the prioritization issue. If energy sector has the highest marginal social benefit then resource should go in that sector. Thus government expenditure composition should change in line with marginal social benefit/cost. Also fiscal authority should be in the leading role. Lastly a question could arise that during resource allocation- whether we should consider the economic classification first or sector wise classification. In this respect we should start from sector wise classification. Then in each sector we should think of the amount of government expenditure in each economic category. It is true that education and health are priority sectors, but if there is lack of rules and regulations then economy cannot run in a better way. Civil service should be strengthened, unproductive expenditure should be curtailed. If the size of government expenditure is not high, then for ensuring governance and better internal resource mobilization more employment might be expansionary in the long-run. Transfer payment should be linked to internal resource mobilization. Capital expenditure should be given the highest priority.

References

Barro,R.,J.,1990, "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth",

Journal of Political Economy , Vol.98,pp s103-s125.

Becker,G.,S.,1968, "Crime and Punishment: An Economic Approach", Journal of Political Economy,Vol.76,pp.169-217.

Devarajan, S., Swaroop, V. and Zou, H.1996, "The composition of Public Expenditure and Economic Growth", *Journal of Monetary Economics*

Fischer,S. and Easterly,W.,1990, "The Economics of the Government Budget Constraint", *The World Bank Research Observer*.

Gerson,Philip,1998, "The Impact of Fiscal Policy Variables on Output Growth," IMF Working paper 98/1 (Washington: International Monetary Fund).

Green, Joshua,2006, "Overview of Macroeconomic Adjustment and Structural Reform" Course material for the course of 'Financial Programming and Policies' in IMF-Singapore Regional Training Institute.

Gupta,S., Clements, B., Baldacci,E. and Mulas-Granados,C., 2002, "Expenditure Composition, Fiscal Adjustment and Growth in Low-Income Countries," IMF Working paper 02/77 (Washington: International Monetary Fund)

Hemming, R., Kell, M., Mahfouz,S., 2002, The Effectiveness of Fiscal Policy in Stimulating Economic Activity- A Review of Literature, IMF Working Paper 02/208 (Washington: International Monetary Fund)

Sargent, T., and Wallace, N., 1981, "Some Unpleasant Monetarist Arithmetic", *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review.*

Von Hagen, Jurgen, AndrewHughes-Hallett, and Rolf Strauch, 2001, "Budgetary Consolidation in EMU" CEPR Discussion Paper No. 148 (London: Centre for Economic Policy Research).

বাংলাদেশের শিপ ব্রেকিং: সম্ভাবনা আছে, নেই সম্প্রসারণের সদিচ্ছা

মামুন আবদুল্লাহ*

বাংলাদেশ ও ভারতের জাহাজ ভাঙার (শিপ ব্রেকিং) বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় আসে ফ্রান্সের দুটি ঐতিহাসিক জাহাজকে কেন্দ্র করে। যার একটি বিশ্বের একসময়ের সর্ববৃহৎ ও বিলাসবহুল প্রমাদতরী এস এস নরওয়ে (প্রথমে যার নাম ছিল এস এস ফ্রান্স) এবং অপরটি ফরাসি যুদ্ধবিমান বহনকারী রণতরী 'ক্লিম্যানেস্কো'। প্রায় ৯০ কোটি টাকায় (১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে) 'এসএস নরওয়ে' কেনার কথাবার্তা পাকাপোক্ত করে ফেলেছিলেন চট্টগ্রামের এক স্ক্র্যাপ জাহাজ ব্যবসায়ী, যার নিজস্ব একটি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডও আছে সীতাকুণ্ডের শীতলপুর। ওই ব্যবসায়ী মালেয়েশিয়ার কেলাং বন্দরে অবস্থানরত জাহাজটিতে দুরাত কাটিয়ে আসার পর এতটাই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে যেকোনোভাবে জাহাজটিকে ইয়ার্ডে এনে কাটার জন্য একপায়ে খাড়া ছিলেন। আমদানি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার একপর্যায়ে তিনি জাহাজটির নাম পরিবর্তন করে (এমভি ব্লু লেডি) এদেশের আনার চেষ্টাও চালান।

একই ভাবে 'ক্লিম্যানেস্কো' কেটে স্ক্র্যাপ লোহা হিসেবে বিক্রির জন্য ৪০ কোটি রুপিতে কিনেছিল ভারতীয় জাহাজ ভাঙা প্রতিষ্ঠান 'শ্রীরাম ভেসেল স্ক্র্যাপ প্রাইভেট লিমিটেড'। গুজরাটের এলাং এলাকার যেকোনো শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে ভিড়িয়ে জাহাজটি কাটার ব্যবস্থাও করে রেখেছিল ওই প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো অভিযোগ তোলে, এই দুটি জাহাজেই বিপুল পরিমাণ অ্যাজস্টেরজসহ মারাত্মক বিষাক্ত কিছু বর্জ্য আছে, যা জাহাজ কাটার সময় আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে জনজীবনে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করবে। তারা আরও অভিযোগ করেন, জাহাজ কাটার সময় অ্যাজবেস্টজের ছোট ছোট আঁশ বাতাসের সঙ্গে মিশে মানুষের শ্বাসনালীতে চলে যাওয়ার সম্ভবনা আছে, যা মানবদেহে প্রাণঘাতী ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এই দুই জাহাজের সম্ভাব্য আমদানিকারক এসব জানার পরও জাহাজ দুটিকে স্ব স্ব দেশে আনার তৎপরতা অব্যাহত রাখলে সোচ্চার হয়ে উঠে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠন। জাহাজ দুটির আমদানি ঠেকাতে প্রায় একই সময়ে দুই দেশে সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ এমনকি মানববন্ধনও রচিত হয়ে। একপর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করে যেকোনো নামে এসএস নরওয়ে বাংলাদেশে আমদানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতের সুপ্রিম কোর্টও ক্লিম্যানেস্কোর ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়।

সংরক্ষিত খাত

শুধু এ দুটি জাহাজ নয়, এ খাতের ব্যবসায়ীরা যেকোনো ধরনের স্ক্র্যাপ বাংলাদেশে জাহাজ এনে কেটে

* চিফ রিপোর্টার, প্রথম আলো, চট্টগ্রাম অফিস।

বিক্রি করে দেওয়ার সুযোগ সবসময় খুঁজতে থাকেন। তাদের বিবেচনায় মুনাফাই মুখ্য। এ মুনাফা সর্বোচ্চ করতে এখাতের ব্যবসায়ীরা সংঘবদ্ধ হয়ে 'বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশন' নামের সমিতি করেছেন। এ সমিতির সদস্য না হলে জাহাজ আমদানি করা যাবে না। সমিতির বাইরে কেউ আমদানি করলে জাহাজটি ইয়ার্ডে নিয়ে যাতে কাটা সম্ভব না হয় সে জন্য সরকারি গ্যাজেটও করে নেওয়া হয়েছে। ওই গ্যাজেটে আমদানি করা জাহাজ শুল্কায়ন ও ইয়ার্ডে নেওয়ার আগে যথাক্রমে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস ও নৌবাহিনী থেকে যে অনুমোদন নেওয়ার বিধান রয়েছে তাতে ওই সমিতির ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর সমিতি নিয়ন্ত্রণকারী পাঁচ-ছয়জন ব্যবসায়ীর নিজস্ব ঘরনার না হলে যেকাউকে সমিতির সদস্যপদও দেওয়া হচ্ছে না। ফলে দেশের শিপ ব্রেকিং খাতটি দীর্ঘ তিন দশকেও মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন ব্যবসায়ীর জন্য সংরক্ষিত থেকেই গেল।

ডাম্পিং গ্রাউন্ড-বাংলাদেশ

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বিভিন্ন ধরনের ময়লা আবর্জনা ও বর্জ্যবাহী স্ক্র্যাপ জাহাজ (ডার্টি শিপ) আমদানির জন্য বাংলাদেশি আমদানিকারকরা বেপরোয়া। কোনো না কোনোভাবে দু-একটি ডার্টি শিপ এনে কাটার ব্যবস্থা করতে পারলেই প্রত্যেক আমদানিকারকের লাভ হয় ৫-১০ কোটি টাকা। ওইসব ডার্টি শিপ বাইরের কোনো বন্দরে সম্পূর্ণ পরিষ্কার (ক্লিন অথবা বর্জ্যমুক্ত) করে আমদানি করতে গেলে তখন লাভ বলতে কিছুই থাকবে না। আবার অ্যাজবেস্টরজ জাতীয় বিষাক্ত বর্জ্যসহ জাহাজ চীন,পাকিস্তানসহ আরও কয়েকটি দেশে তাদের কঠোর নীতিমালার কারণে বিক্রি করা সম্ভব হয় না। ফলে রপ্তানিকারক কম দামে হলেও জাহাজগুলো বাংলাদেশ কিংবা ভারতকে গছিয়ে দিতে পারলেই বাঁচেন। বিশেষ করে ইদানীংকালে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে অ্যাজবেস্টজসহ নানা বর্জ্যবাহী জাহাজ বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বর্জ্য অপসারণ কিংবা পরিশোধন ব্যয় অনেক বেশিতে দাঁড়ানোয় এখন বাংলাদেশই এগুলোর ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

স্ক্র্যাপ জাহাজের নামে কী আসছে?

আমাদের দেশে স্ক্র্যাপ জাহাজের ঢালাও আমদানির কারণে এসব জাহাজে কোন ধরনের ধাতব পদার্থ রয়েছে সেটা ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার সুযোগ এবং সুবিধা কোনোটাই নেই। জাহাজের নাম নিয়ে কখনো ফেরি, সাগরের ভাসমান কারখানা, আবার কখনো রিফাইনারি, হিমায়িত মাছ কারখানা কিংবা লোহার কাঠামো আমদানি হচ্ছে। আমাদের দেশের সুচতুর ব্যবসায়ীরা এসব লোহার কাঠামো আমদানির আগে কৌশলে সিংগাপুর থেকেই কাঠামোটি জাহাজ বলে নতুন নামকরণ করে নিচ্ছে, যাতে এটি জাহাজ নয় সেটা কেউ চ্যালেঞ্জ করতে না পারেন। চট্টগ্রামের যেসব শিপ ব্রেকিং ব্যবসায়ীর নিজস্ব ইয়ার্ড আছে তাদের প্রত্যেকেরই আবার সিংগাপুরে কিংবা লন্ডনে নামে বেনামে অন্ত ত একটি কার্যালয় আছে। প্রথমে ওই বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নামে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে জাহাজ কিংবা লোহার কাঠামো কিনে নেন তারা। পরে আবার সেই বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে দেশের প্রতিষ্ঠান সেটি কিনে নিয়েছে দেখায়। এ কারণেই মাঝেমধ্যে একবার নাম পরিবর্তন করে নিলেও হাতে হাতে ধরার মতো কোনো সুযোগ থাকে না।

দায়িত্ব কার?

আমাদের দেশের প্রচলিত আইনে এমন কোনো নির্দিষ্ট সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি যেটি স্ক্র্যাপ

জাহাজ আমদানি এবং আমদানি পরবর্তী কাটার বিষয়টি সরাসরি তদারকি করবে। আর দশটি বাণিজ্যিক পণ্য আমদানির জন্য যেভাবে শুল্ক বিভাগের ছাড়পত্র এবং শুল্ক-করাদি পরিশোধ করতে হয় স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানিও তার ব্যতিক্রম নয়। ঘোষণামতো পণ্যসামগ্রীর আমদানি সঠিক আছে কি না সেটা সরেজমিন দেখার জন্য একজন শুল্ক কর্মকর্তা যেমন বর্হিনোঙরে যাওয়ার বিধান আছে তেমন স্ক্র্যাপ জাহাজের ক্ষেত্রেও একদল শুল্ক কর্মকর্তা গিয়ে দেখে আসেন স্ক্র্যাপ জাহাজে শুল্ক আরোপযোগ্য কোনো পণ্য আছে কি না । আমদানিযোগ্য পণ্যসামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত শেষে শুল্ক আদায়ের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে আসাই এসব কর্মকর্তার দায়িত্ব। এর বাইরে সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিস্ফোরক অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা আমদানি করা জাহাজটি কাটার উপযোগী কি না অথবা জাহাজে কোনো ধরনের বিস্ফোরফ দ্রব্য আছে কি না সেটাই নিশ্চিত করে ইয়ার্ডে আনার ছাড়পত্র দেয়। বর্জ্য আছে কি নেই সেটা দেখার দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তরের হলেও সেটা দেখার মতো যন্ত্রপাতি কিংবা সুযোগ সুবিধা নেই বলে কোনো স্ক্র্যাপ জাহাজে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা গিয়ে আপত্তি অথবা অনাপত্তি দিয়ে এসেছেন এমন নজির বাংলাদেশে শিপ ব্রেকিংএর ইতিহাসে একটিও নেই। আর স্ক্র্যাপ জাহাজটি ইয়ার্ডে বিচিং হওয়ার আগে নৌবাহিনীও এক দফায় ওই জাহাজে গিয়ে যেসব নৌপ্রতিরক্ষামূলক যন্ত্রপাতি জাহাজটিতে আছে সেটা চিহ্নিত করে আসে। পরে এসব চিহ্নিত যন্ত্রপাতি খুলে নেয় নৌবাহিনী।

এর আগে স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানিতে ব্যাণিজ্যিক ব্যাংকে প্রথাসিদ্ধ এলসি খুলতে হয়। তারও আগে এলসি খোলার জন্য অনুমোদন নিতে হয় সমুদ্র বাণিজ্য অধিদপ্তর থেকে। স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানিতে যেখানে এতসব প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা রয়েছে সেখানে সামগ্রিক দায় দায়িত্ব কোনো একক প্রতিষ্ঠান নেবে না সেটাই স্বাভাবিক। এ কারণে এদেশে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানির দায়দায়িত্ব এক সরকারি সংস্থা অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে ভারমুক্ত হতে চায়। ফলে পরিবেশসম্মত স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানি ও কাটার বিষয়টি কোনোভাবেই নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

সম্ভাবনা যেখানে

বাংলাদেশে পুরোনো জাহাজ ভাঙার (শিপ ব্রেকিং) কাজটি একমাত্র চট্টগ্রামে হয়-এটা সবার জানা থাকলেও ক্ষুদ্র এ খাতটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে কত বড় অবদান রাখছে সেটা অনেকেরই অজানা। সবাই জানে এ খাত দেশের লোহার চাহিদার বড় একটি অংশের যোগান দিয়ে থাকে। বছরে ৭০০-৮০০ কোটি টাকার নিশ্চিত রাজস্ব আসে এ খাত থেকে। ৩০ হাজারের মতো লোক এ শিল্পে কর্মরত। কিন্তু এ শিপ ব্রেকিং থেকে বিপুল পরিমাণ নৌ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, উচ্চক্ষমতার জেনারেটর, ইলেক্টনিক্স পণ্য, বৈদ্যুতিক তার-বাল্ব, বাসনকোসন, চেয়ার টেবিল খাটসহ দামি দামি আসবাবপত্র থেকে শুরু করে হাজারো পণ্যসামগ্রী যে পাওয়া যায় সেটা একমাত্র এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত লোকজন ছাড়া অন্যদের জানা কিংবা বোঝার উপায় নেই। এসব পণ্যসামগ্রীর বেচাকেনা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বলে বিবেচিত হওয়ায় ফৌজদারহাট থেকে শুরু করে বারআউলিয়া পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১০ কিলোমিটার এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশঘেঁষে গড়ে উঠেছে শত শত দোকান, যেখানে বিক্রি হচ্ছে ভাঙা জাহাজ থেকে প্রাপ্ত নানা পণ্যসামগ্রী। এর সঙ্গে বছরে এক শ থেকে দেড় শ কোটি টাকার বাড়তি আয়ও আসে ভাঙা জাহাজের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি রপ্তানি করে। এর মধ্যে আছে ব্রোঞ্জ অথবা ব্রাশের তৈরি প্রফেলার, ব্রাশ স্ক্র্যাপ, কপার স্ক্র্যাপ,স্টিলনেস স্টিল

স্ক্র্যাপ, সেফটি আইটেম, জাহাজের গোটা ইঞ্জিন ও ইঞ্জিনের স্প্যায়ার পার্টস ইত্যাদি ।

অবহেলিত খাত, নীতিমালা নেই

আমাদের দেশে নির্মাণ ও গৃহস্থালি কাজে যে লোহার চাহিদা আছে তার ৭৫-৮০ শতাংশ যোগান দেয় শিপ ব্রেকিং খাত । জাহাজ ভাঙা এ লোহা কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ করা হয় দেশের বিভিন্ন রিরোলিং মিলে । সেখান থেকে রড, বিলেট, এঙ্গেল, প্লেট ইত্যাদি তৈরি হয় । ফলে শিপ ব্রেকিং ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের অর্থনীতি বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়বে এটা অনেকখানি নিশ্চিত । কারণ ভারতসহ বিভিন্ন দেশে লোহার খনি থাকলেও বাংলাদেশ বার্ষিক লোহার চাহিদার পুরোটাই আমদানির মাধ্যমে পূরণ করে, যার একটি বড় অংশ পাওয়া যায় শিপ ব্রেকিং খাত থেকে । কিন্তু তিন দশক ধরে আমাদের দেশে শিপ ব্রেকিং কর্মকাণ্ড চললেও এ খাতের উন্নয়ন কিংবা অফুরন্ত সম্ভবনা কাজে লাগানোর উদ্যোগ সরকারি কিংবা বেসরকারি কোনো পক্ষ থেকেই নেওয়া হয়নি ।

এ খাতকে এখনো শিল্প বলেও ঘোষণা করা হয়নি । ফলে এখানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য তৈরি হয়নি কোনো বেতন কাঠামো কিংবা নীতিমালা । যার কারণে রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, জামালপুর, কিশোরগঞ্জসহ উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলো থেকে দরিদ্র পরিবারের অপ্রাপ্ত বয়সী শিশু-কিশোররা দলে দলে এসে যোগ দিচ্ছে জাহাজ ভাঙার কাজে । ভালো মজুরিতে কাজের লোভ দেখিয়ে একশ্রেণীর মধ্যসত্বভোগী দালালচক্র এদের নিয়ে আসলেও বাস্তবতা হচ্ছে, ন্যূনতম মজুরিতে এসব শ্রমিকদের দিতে হয় প্রচণ্ড শারীরিক শ্রম । আর পদে পদে মৃত্যু কিংবা পঙ্গু হওয়ার ঝুঁকি তো লেগেই আছে । কিন্তু এজন্য কোনো ঝুঁকি ভাতা কিংবা আপাদকালীন আর্থিক নিরাপত্তাব্যবস্থা চালু নেই জাহাজ ভাঙার শ্রমিকদের জন্য ।

ভিন জেলা থেকে আসা এসব শ্রমিক শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের আশপাশে যেসব ভাড়াঘরে বাস করেন সেখানকার পরিবেশও মানবেতর । কারণ প্রতিদিন যে মজুরি মেলে সেটা দিয়ে ভালো ঘরে থাকা আর পেট পুরে খাওয়া অসম্ভব । কিছু ঠিকাদার জাহাজ আমদানিকারকের কাছ থেকে ঠিকার ভিত্তিতে জাহাজটি সম্পূর্ণ কেটে দেওয়ার চুক্তি করে আর কম বেতনের শ্রমিক দিয়ে জাহাজ কাটার ব্যবস্থা করে । ফলে শ্রমিকরা আসলে কত মজুরি পেল সেটা দেখা অনেক সময় জাহাজের আমদানিকারকের পক্ষে সম্ভব হয় না । একজন ইয়ার্ড মালিকের চিন্তা থাকে তার জাহাজটি কত দ্রুত ইয়ার্ডে ভিড়িয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে বিক্রি করা যায় সেটা নিয়ে । কারণ যত তাড়াতাড়ি তিনি লোহা বিক্রি করতে পারেন তত দ্রুতই ব্যাংকের দায়মুক্ত হয়ে যান । এ কারণে জাহাজ ইয়ার্ডে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে (অনেক সময় আগেই) তিনি বিভিন্ন ঠিকাদার (লোহা, ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম, আসবাবপত্র হার্ডওয়্যার ইত্যাদি) থেকে কিছু অগ্রিম টাকাও নিয়ে নেন । কাজেই যেনতেনভাবে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য থাকায় দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ খাতটি শিল্পের স্বীকৃতি পেল কি পেল না, নীতমালা আছে কি নেই– সেটা নিয়েও খুব একটা গা করে না স্ক্র্যাপ জাহাজের আমদানিকারকরা । সরকারও এ ব্যাপারে পুরোপুরি নির্বিকার বলে মনে হচ্ছে ।

সরকারি কিংবা বেসরকারিভাবে উদ্যোগ নিয়ে সুষ্ঠুনীতিমালার ভিত্তিতে আমাদের দেশে জাহাজ কাটার ব্যবস্থা নিলে এ খাত থেকে সরকারি আয় যেমন বাড়ত তেমনি এটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আরও বেশি অবদান রাখতে পারত- এটা অনেকেই মনে করেন । কিন্তু বছরের পর বছর স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানি ও কাটার বিষয়টি অব্যাহত গতিতে চললেও এনিয়ে যেন সরকারের পরিকল্পিত কোনো

উদ্যোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ কোনো একটি জাহাজ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি আর পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো সোচ্চার হলে সরকার একটু নড়েচড়ে বসেন, নতুন নতুন কিছু বিধি জারি করেই স্ব স্ব সংস্থাগুলো দায়িত্বপালন শেষ করেন মাত্র। একটি শিল্পবান্ধব ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নের কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

বিপন্ন পরিবেশ-যখন তখন দুর্ঘটনা

একটি স্ক্র্যাপ জাহাজকে পরিবেশসম্মতভাবে কাটার জন্য যেসব আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও সুযোগ-সুবিধা ইয়ার্ডগুলোতে থাকার কথা তার সামান্যতমও নেই চট্টগ্রামের উপকূলীয় শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোতে। এ জন্য বাড়তি বিনিয়োগে ইয়ার্ড মালিকদেরও আগ্রহ কম। বরং কোনোমতে ন্যূনতম বিনিয়োগে কীভাবে বড় অঙ্কের লাভ পকেটে ভরে নেওয়া যায় সে চেষ্টায় তৎপর থাকেন আমদানিকারকরা। অবশ্য একজন শিপ ইয়ার্ড মালিক আমাকে বলছেন, কর্মরত শ্রমিকদের মাথায় হেমলেট, পায়ে গামবুটসহ কিছু সতর্কতামূলক পদ্ধতি অবলম্বন শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু কায়িক পরিশ্রমের সময় এসব পরিধান করে কাজ করতে সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধা (বেশি গরম লাগার অজুহাত) বেশি দেখিয়ে সেটা তারা করছে না। ফলে মারাত্মক প্রাণঘাতি দুর্ঘটনা ইয়ার্ডগুলোতে প্রত্যহিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্য একজন ইয়ার্ড মালিক বলেন, আমরা চাই স্থায়ীভাবে পরিবেশসম্মত ইয়ার্ড গড়ে তুলতে। কিন্তু যে ইয়ার্ডে আমি জাহাজ ভিড়াচ্ছি তার নদীমুখটা আমাদের লিজ দেওয়া হয় মাত্র এক বছরের জন্য। পরের বছর সরকার যদি লিজ দেওয়া বন্ধ রাখে তখন আমাদেরও ইয়ার্ড বন্ধ করে দিতে হবে। মূলত এ কারণে ইর্য়াডগুলোতে পরিবেশসম্মত জাহাজ কাটার স্থায়ী কাঠামো গড়ে উঠছে না বলে তিনি মনে করেন।

শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের অন্য একটি বড় সংকট পরিবেশ দূষণ। বিশালাকৃতির একটি জাহাজের বিভিন্নস্থানে থাকা তেলের তলানিসহ বিভিন্ন পদার্থ সংগ্রহ করে বিক্রির চেষ্টা করা হয় প্রথমে। কিন্তু যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না তা জাহাজ কাটার সময় সরাসরি গিয়ে মিশে বঙ্গোপসাগরের সন্দ্বীপ চ্যানেলে। এ পরিবেশ দূষণের অনেকগুলো অদৃশ্যমান প্রতিক্রিয়া হলেও সংলগ্ন সন্দ্বীপ চ্যানেল যে ইতিমধ্যে মাছ শূন্য হয়ে পড়েছে সেটা বিশেষজ্ঞদের গবেষণায়ও প্রমাণিত হয়েছে।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেশের জাহাজ ভাঙা খাতের সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখতে পারি:

এক. এ খাতের জন্য একটি পরিপূর্ণ নীতিমালা তৈরি করে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া।

দুই. এ খাতকে শিল্পখাত হিসেবে স্বীকৃতি দিযে সরকারি নির্দিষ্ট একটি মাত্র সংস্থার নজরদারিতে রাখার ব্যবস্থা করা।

তিন. পরিবেশসম্মত ও উপযুক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে জাহাজ কাটার বিষয়টি নিশ্চিত করতে ইয়ার্ডগুলোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ।

চার. শ্রমিকদের জন্য ঝুঁকিভাতাসহ একটি আলাদা মজুরি কাঠামো তৈরি করা।

পাঁচ. জাহাজ কাটার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ।

ছয়. জাহাজ আমদানি থেকে শুরু করে কেটে লোহা হিসেবে বিক্রি করা পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড তদারকির জন্য সরকারি যেকোনো একটি সংস্থাকে (পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, কিংবা শুল্ক বিভাগ) দায়িত্ব দেওয়া। যে সংস্থা এ শিল্পের বিকাশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবে।

তথ্য সূত্র

End of life ships: The human cost of breaking ships, (greenpeace survey), Deadly Vessels (Indian Magazine, FRONTLINE, February 10, 2006), পর্যালোচনা-বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙ্গা কার্যক্রম-ইপসা এবং পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাপ্ত তথ্য ও অর্জিত সরেজমিন অভিজ্ঞতা।

Integration of Potato Markets in Bangladesh : A Cointegration Analysis[1]

A S M Anwarul Huq*
Shamsul Alam**

1. Introduction

Marketing of any products is the most important activity to harvest big economic fortunes and to bring prosperity, especially in agricultural sector. In a competitive market the price differences between any two regions or market will be equal to less than transport cost between the two markets and these markets are integrated which means marketing is efficient. The objectives of price stability, rapid economic growth and equitable distribution of goods and services cannot be achieved without the support of an efficient marketing system. Markets that are not integrated may convey inaccurate price information that might distort marketing decisions and contribute to inefficient product movements. In order to determine whether potato prices in a market are in parity with prices in a reference market. So it is necessary to compare market prices of potato in one market with potato prices among other markets in that region.

Price correlation measures the co-movements that underlie the intuitive idea of market integration. The problems are that these co-movements sometimes could not be separated from long-run time trends and seasonality effects. Despite its limitations, price series correlation is the commonly used to measure market integration. However, Ardeni (1989) argued that these approaches ignore the time series properties of price data and the result obtained may be biased and inconsistent. More importantly, the results tend more often to reject the null hypothesis of market integration, indicating that the markets are not efficient although these markets in reality appear to operate competitively.

---

[1] The paper was derived from the first author's Ph.D thesis entitled " An Analysis of Marketing System of Potato in Bangladesh" .

* Senior Scientific Officer, Agricultural Economics Division, Regional Agricultural Research Station, Bangladesh Agricultural Research Institute, Jamalpur.

** Professor, Department of Co-operation and Marketing; Bangladesh Agricultural University, Mymensingh

Cointegration procedure developed by Granger (1986), and Engle and Granger (1987) is a powerful tool to give a clear answer about the existence or absence of a relation between two economic time series. Although the technique is widely used, its application is extremely limited for the market study in Bangladesh. Goleti *et. al.* (1995) used this technique along with correlation coefficients, long-term multipliers and speed of adjustment in the case of rice markets in Bangladesh. Cointegration test has been used in the present study to show whether potato markets are cointegrated or not. This technique is utilised owing to its superiority over the other.

2. Objective

The objective of the present study is to examine the nature of market integration for potato in Bangladesh.

3. Methodology

3.1 Sources of Data

Present study used potato price data which were collected by the Department of Agricultural Marketing by excluding those areas where non availability of potato price data for many months. Nominal monthly average wholesale potato price for 17 districts namely Dhaka, Chittagong, Rajshahi, Khulna, Comilla, Munshigonj, Jamalpur, Mymensingh, Kishoregonj, Pabna, Bogra, Dinajpur, Jessore, Barishal, Patuakhali, Sylhet and Lakhipur were examined. Sample covers the period from January 1989 to December 1998 generating 120 observations for each of the series.

3.2 Market Integration

Market integration may be defined as a situation which arbitrage cause prices in different markets to move together. More specifically, two markets may be said spatially integrated whenever trade takes place between them and if the price differential for a particular commodity equals the transfer costs involved in moving that commodity between them. However, imperfections in the market particularly, those arising from activities of traders are generally taken as important causes for the existence of differential price movements in different markets (Behura and Pradhan, 1998 pp.344-346). In a competitive market with free flow information, the price differences between any two regions or markets will be equal to or less than transport cost between the two markets. The market will perform efficiently and there will be no scope for traders to make excessive profits.

3.3 Stationarity

Empirical work based on time series data assumes that the underlying time series is stationary. In regressing a time series variable on another time series variable, one often obtains a very high R^2 although there is no meaningful relationship between the two. This situation exemplifies the problem of spurious regression. This problem arises if both the time series involved exhibit strong trends, the high R^2 observed is due to the presence of the trend, not to a true relationship between the two.

Broadly speaking, a stochastic process is said to be stationary if its mean and variance are constant over time and the value of covariance between two time periods depends only on the distance or lag between the two time periods and not on the actual time at which the covariance is computed. To explain this statement, let P_t be a stochastic time series with these properties:

Mean : $E(P_t) = \mu$

Variance : $var(P_t) = E(Pt - \mu)^2 = ^2$

Covariance : $\gamma_k = E[(P_t - \mu)(P_{t+k} - \mu)]$

where γ_k, the covariance (or autocovariance) at lag k, is the covariance between the values of P_t and P_{t+k}, that is, between two P values k periods apart. If k =0, we obtain γ_0, which is simply the variance of P($\sigma=^2$); if k =1, γ_1 is the covariance between two adjacent value of P.

In short, if a time series is stationary its mean, variance and autocovariance (at various lags) remain the same, no matter at what time we measure them. If a time series is not stationary in the sense just defined, it is called a nonstationary time series (Gujarati, 1994 pp.709-714).

3.4 Unit root and Cointegration Test

Test of stationarity that has recently become popular is known as the unit root test. The easiest way to introduce this test is to consider the following model:

$P_t = P_{t-1} + u_t$ .....(1)

where u_t is the stochastic error term that follows the classical assumptions, namely, it has zero mean, constant variance σ^2, and is nonautocorrelated. Such an error term is also known as a white noise error term. Equation (1) is a first-order, or AR(1), regression in that regress the value of P at time t on its value at time (t

– 1). If the coefficient of P_{t-1} is in fact equal to 1, what is known as the unit root problem, i.e., a nonstationarity situation. Therefore, if run the regression

$$P_t = \rho P_{t-1} + u_t \quad \text{.....(2)}$$

and actually find that =1, then the stochastic variable P_t has a unit root. In (time series) econometrics, a time series that has a unit root is known as a random walk (time series). And a random walk is an example of a nonstationary time series.

Equation (2) is often expressed in an alternative form as

$$\Delta P_t = (\rho - 1) P_{t-1} + u_t$$

$$= \delta P_{t-1} + u_t \quad \text{.....(3)}$$

where $\delta = (\rho - 1)$ and where Δ is the first-difference operator. Note that $\Delta P_t = (P_t - P_{t-1})$. Making use of this definition equation (2) and (3) are the same. However, now the null hypothesis is that $\delta = 0$.

If is in fact 0, equation (3) can be written as

$$\Delta P_t = (P_t - P_{t-1}) = u_t \quad \text{.....(4)}$$

What (4) says is that the first differences of a random walk time series (= u_t) are a stationary time series because by assumption u_t is purely random.

Now if a time series is differenced once and the differenced series is stationary, the original (random walk) series is integrated of order 1, denoted by I(1). Similarly, if the original series has to be differenced twice (i.e., take first difference of the first difference) before it becomes stationary, the original series is integrated of order 2, or I(2). In general, if a time series has to be differenced d times, it is integrated of order d or I(d). Thus, any time series have an integrated time series of order 1 or greater, that have a nonstationary time series. The terms a stationary process and an I(0) process will use as synonymous.

Under the null hypothesis that $\rho = 1$, the conventionally computed t statistics is known as the τ (tau) statistic, whose critical values have been tabulated by Dickey and Fuller on the basis of Monte Carlo simulations. In the literature the tau test is known as the Dickey-Fuller (DF) test, in honour of its discoverers. Note that, if the null hypothesis that $\rho=1$ is rejected (i.e., the time series is stationary), the usual (Student's) t test can be use. RATS, ET, MICRO, TSP, and SHAZAM, among other statistical packages, give the Dickey-Fuller and MacKinnon critical value of the DF statistic.

For theoretical and practical reasons, the Dickey- Fuller test is applied to regressions run in the following forms:

$\Delta P_t = \delta P_{t-1} + u_t$ .....(5)

$\Delta P_t = \beta_0 + P_{t-1} + u_t$ .....(6)

$\Delta P_t = \beta_0 + \beta_1 t + \delta P_{t-1} + u_t$ .....(7)

where t is the time or trend variable. In each case the null hypothesis is that $\delta = 0$, that is, there is a unit root.

$$\Delta P_t = \beta_0 + \beta_1 t + \delta P_{t-1} + \alpha_i \sum_{k=1}^{N} \Delta P_{t-k} + \varepsilon_t \quad \ldots\ldots(8)$$

where, for example, $\Delta P_{t-1} = (P_{t-1} - P_{t-2})$, $\Delta P_{t-2} = (P_{t-2} - P_{t-3})$, etc., that is, one uses lagged difference terms. The number of lagged difference terms to include is often determined empirically, the idea being to include enough terms so that the error term in (8) is serially independent. The null hypothesis is still that $\delta = 0$ or $= 1$, that is, a unit root exists in P (i.e., P is nonstationary). When the DF test is applied to models like (8), it is called augmented Dickey-fuller (ADF) test. The ADF test statistic has the same asymptotic distribution as the DF statistic, so the same critical values can be used, (Gujarati, 1994 pp.718-720).

$$P_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 P_{jt} + \varepsilon_t \quad \ldots\ldots(9)$$

To examine the price relation between two markets, the following regression model has been used :

where, P_i and P_j are price series of a specific commodity in two markets i and j, and ε_t is the residual term assumed to be distributed identically and independently. The constant term $_0$ is left to account for transport and other transfer costs which are assumed to be constant or proportional to price (when the logarithms of the price variables are used, which is the case here) during the sample period. The existence of transport and other transfer costs which vary over time may seriously affect the market integration tests. Ideally, these costs should be subtracted from the prices before applying the testing procedure. However, this is not usually done because the relevant cost data are not available (Zanias, 1999 p.254), which is the case here also.

The test of market integration is straightforward if P_i and P_j are stationary variables. Often, however, economic variables are non-stationary in which case the conventional tests are biased towards rejecting the null hypothesis. Thus

before proceeding with further analysis, the stationarity of the variables needs to be checked (Granger and Newbold, 1977).

Once the nonstationarity status of the variables is determined, the next step is to test for the presence of cointegrating (long-run equilibrium) relationship between

$$\Delta P_t = \beta_0 + \beta_1 P_{t-1} + \sum_{k=1}^{N} \delta_k \Delta P_{t-k} + \eta_t \quad \ldots\ldots(10)$$

To test the univariate price series for stationarity, the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test has been applied, which tests the null hypothesis of non-stationarity

$$\Delta^2 P_t = \theta_0 + \theta_1 \Delta P_{t-1} + \sum_{k=1}^{N} \phi_k \Delta^2 P_{t-k} + \mu_t \quad \ldots\ldots(11)$$

where $P_t = P_t - P_{t-1}$ and $_t$ is the residual term. The test statistic is simply the t-statistic, however, under the null hypothesis it is not distributed as student-t, but the ratio can be compared with critical values tabulated in Fuller (1976). In estimating equation (10) the null hypothesis is $H_0 : P_t$ is I(1), which is rejected in favour of I(0) if β_1 is found to be negative and statistically significant. The above test can also be carried out for the first difference of the variables. That is, we estimate the following regression equation:

where the null hypothesis is H_0:P_t is I(2), which is rejected in favour of I(1) if θ_1 is found to be negative and statistically significant. In general, a series P_t is said to be integrated of order d, if the series achieves stationarity after differencing d times, denoted P_t I(d). Consequently, if P_t is stationary after differencing once then we may denote P_t I(1) and P_t I(0). However, in most applied work the procedure is terminated after the first or second differences.

$$\varepsilon_t = P_{it} - \alpha P_{jt} \quad \ldots\ldots(12)$$

Having established that the variables are non-stationary in level, we may then test for cointegration. Only variables that are of the same order of integration may constitute a potential cointegrating relationship. The definition of cointegration used here is that of Engle and Granger (1987) and is defined as follows, consider a pair of variables P_i and P_j, each of which is integrated of order d. Their linear combination, that is, will generally be I(d). However, if there is a constant , α such that ε is I(d-b), where b>0, then P_j and P_i are said to be cointegrated of order d,b and the vector $(1,-\alpha)$ is called the cointegration regression. The relation $P_i = \alpha P_j$ may be considered as long run or equilibrium relation (Engle and Granger,1987),

and ε is the deviation from the long-run equilibrium. When P_i and P_j are cointegrated, the long-run relationship $P_j - \alpha P_i = 0$ will tend to be re-established after a stochastic shock. Thus while the individual price series may be characterised by dominant long swings of wander aimlessly, their difference rarely drift from some 'equilibrium' level, that is, they move together in the long-run. However, deviation from the long-run relationship may occur because of delivery lags and other impediments to regional trade.

Comparing equation (9) and (12), equation (12) represents a 'strong-form' test of market integration, where under the null, parameter α_0 should be equal to zero, while α_1 should be equal to one. On the other hand, if α_0 0 and $\alpha_1 = 1$, than the 'weak-form' test for market integration persists (Palakas and Harriss, 1993). However, in most applications, the 'weak-form' test for market integration is usually employed in empirical analysis. This is because information on domestic transportation costs, processing costs, sales taxes, etc., is not available. Therefore, the role of the constant term α_0, in equation (9) is to absorb the influence of these factors.

Nevertheless, before we proceed to test for market integration using the approach of cointegration analysis, we need to determine the nature of integration of the variables. According to Granger (1986), a model specified by equation (9) does not make sense unless P_i and P_j are of the same order of integration. Thus a necessary condition for P_i and P_j to be cointegrated is that they must be integrated of the same order. Testing whether the variables are cointegrated in merely another unit root test on the residual in equation (9). The test involved regression the first-difference of the residual lagged level and lagged dependent variables is

$$\Delta\varepsilon_t = \gamma_1\varepsilon_{t-1} + \sum_{k=1}^{N}\varphi_k\Delta\varepsilon_{t-k} + v_t \quad \text{.....(13)}$$

Again the test statistics is the t-statistics of γ_1. The critical values are tabulated in Fuller (1976). The null hypothesis is H_0: P_i and P_j are not cointegrated. The null hypothesis is rejected if estimated γ_1 is negative and found to be significantly different from zero. (Behura and Pradhan, 1998 pp.344-330, and Baharumshah and Habibullah, 1994, pp.205-215).

4. Results and Discussion

4.1 Market Integration

The study covers the important potato trading and consumption centres in Bangladesh, namely; Dhaka, Chittagong, Rajshahi, Khulna, Comilla, Munshigonj, Jamalpur, Mymensingh, Kishoregonj, Pabna, Bogra, Dinajpur, Jessore, Barishal, Patuakhali, Sylhet and Lakshipur. Of these seventeen locations capital city Dhaka serves as the central and biggest wholesale market for potato. Being the most populous area in the country and due to its strategic location and communication system with all other districts of the country, Dhaka is the centre of trade in Bangladesh.

For model (10) the values with lags is computed by using computer software RATS. If the computed value of the statistic (i.e., $|\tau|$) exceeds the DF or MacKinnon DF absolute critical values, then we do not reject the hypothesis that the given time series is stationary. If, on the other hand, it is less than the critical value, the time series is nonstationary (Gujarati, 1995 p.719).

Empirical results of the unit root test (ADF) for the hypothesis that potato prices for Dhaka, Chittagong, Rajshahi, Khulna, Comilla, Munshigonj, Jamalpur, Mymensingh, Kishoregonj, Bogra, Jessore, Barishal, Patuakhali, Sylhet and Lakshipur were each individually integrated of order one except Dinajpur and Pabna, against the alternative that they are integrated of order zero, are presented in Table 1. The results for the first-difference of the variables show that the prices are non-stationary in level for all markets. In all cases the null hypothesis $P_t I(2)$ is rejected implying that the series do not require second-differencing to achieve stationarity. We conclude that the potato prices are stationary after differencing once, that they are all I(1) processes.

Given that all potato prices are I(1), we then proceeded to test with the cointegration analysis. Cointegration requires the residuals in equation (3.4.1) to be stationary, that is integrated of zero, I(0). Equation (3.4.5) was estimated in level from using ordinary least squares techniques, Table 4.5.2 shows the results of the testing for cointegration of the markets in Bangladesh. In general, the results yield identical conclusion. Using the ADF-test, all price differences (residuals) are I(0) because the calculated values are less than the critical value. This fulfils the second condition of cointegration. Thus the hypothesis that prices are not cointegrated is rejected in all cases for the sample period of 1989 to 1999. Based on cointegration analysis, it appears that high levels of relationship prevail among the markets. The results in Table 2 implies that regional potato markets in

Bangladesh are spatially linked, that is, the markets are integrated. And integrated markets market means markets are efficient.

5. Conclusion

The empirical results suggest that regional potato markets in Bangladesh are highly cointegrated. This indicates that commodity arbitrage is working. The result also shows that the prices of potato tends to move uniformly across spatial markets and price changes are fully and immediately passed on to the other markets.

With the development of telecommunication facilities price information in one market flow to another distant market within a short time. Government can rely on market forces to supply food from surplus regions to deficit regions. Present study reveals that except Dinajpur and Pabna, potato markets are well integrated in Bangladesh. If effective government intervention is needed to achieve food sufficiency and to remove nutrition deficiency government can adopt centralised and efficient policy.

References

Ardeni, P.G. 1989. Does the Law of One Price Really Hold for Commodity Prices? American Journal of Agricultural Economics, 71(3), 661-669.

Baharumshah, A.Z. and Habibullah, M.S. 1994. Price Efficiency in Pepper Markets in Malaysia: A Cointegration Analysis. Indian Journal of Agricultural Economics, 49(2), 205-216.

Behura, D. and Pradhan, D.C. 1998. Cointegration and Market Integration: An Application to the Marine Fish Markets in Orissa. Indian Journal of Agricultural Economics, 53(3), 344-350.

Engle, R.F. and Granger, C.W.J. 1987. Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276.

Fuller, W.A. 1976. Introduction to Statistical Time Series, Academic Press, New York. In - Harris, R.I.D. 1995. Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling. Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf, London, Great Britain.

Goletti, F., Ahmed, R and Farid, N. 1995. Structural Determinants of Market Integration: The Case of Rice Markets in Bangladesh. The Developing Economics, 33(2), 185-202.

Granger, C.W.J. 1986. Developments in the Study of Cointegrated Economic Variables. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 48(3), 213-228.

Granger, C.W.J. and Newbold, P. 1977. Forecasting Economic Time Series, Academic Press, New York. In Baharumshah, A.Z. and Habibullah, M.S. 1994. Price Efficiency in Pepper Markets in Malaysia: A Cointegration Analysis. Indian Journal of Agricultural Economics, 49(2), 205-216.

Gujarati, D.N. 1995. Basic Econometrics. Third Edition. McGraw-Hill, Inc., New York, USA, 355-714.

Palakas, T.B. and Harriss, B. 1993. Testing Market Integration: New Approaches with Case Material from the West Bengal Food Economy. Journal of Development Studies, 30(1), 1-57. In Baharumshah, A.Z. and Habibullah, M.S. 1994. Price Efficiency in Pepper Markets in Malaysia: A Cointegration Analysis. Indian Journal of Agricultural Economics, 49(2), 205-216.

Zanias, G.P. 1999. Seasonality and Spatial Integration in Agricultural (Product) Markets. Agricultural Economics. 20, 354.

Table 1 : Unit Root Tests for Potato Price Series

Market	Level		First difference	
	Augmented Dickey-Fuller (ADF) test	Lag	Augmented Dickey-Fuller (ADF) test	Lag
Dhaka	-1.3001	11	-5.9637	10
Chittagong	-1.1688	10	-8.8942	9
Rajshahi	-2.1556	11	-9.8331	9
Khulna	-1.6658	12	-9.0511	9
Comilla	-1.2429	13	-3.4862	14
Munshigonj	-1.8521	12	-4.0271	11
Jamalpur	-1.8899	12	-4.3233	11
Mymensingh	-1.3019	11	-2.5745	22
Kishoregonj	-1.2451	10	-10.4562	9
Pabna	-2.6896	13	-3.0977	12
Bogra	-2.0613	12	-8.9012	0
Dinajpur	-5.4437	2	-6.1939	4
Jessore	-1.2938	10	-9.2448	9
Barishal	-1.6074	21	-2.9032	21
Patuakhali	-1.0725	10	-9.3950	9
Sylhet`	-1.2407	10	-8.9983	9
Lakshipur	-1.8676	12	-7.377	10

Note: Critical value of ADF test is available in computer software like – RATS, MICRO TSP, SHAZAM etc., and also in " W.A. Fuller. 1976. Introduction to Statistical Time Series, John Wiley & Sons, New York (Gujarati, 1995 p.719).

Critical value of ADF test:
1% level of significance = -3.46
5% level of significance = -2.88
10% level of significance = -2.57

Table 2 : Cointegration Test Results of Different Markets

Market	Level	
	Augmented Dickey-Fuller (ADF) test	Lag
Chittagong	-8.3901	0
Rajshahi	-6.0157	1
Khulna	-7.8835	0
Comilla	-8.2858	0
Munshigonj	-8.7004	0
Jamalpur	-7.7080	0
Mymensingh	-10.7649	0
Kishoregonj	-7.3469	0
Bogra	-7.0431	0
Jessore	-7.7005	0
Barishal	-9.0652	0
Patuakhali	-4.1829	5
Sylhet	-6.0401	0
Lakshipur	-7.7145	0

Critical value of ADF test:
1% level of significance = -3.46
5% level of significance = -2.88
10% level of significance = -2.57

Competition and its Diverse Meanings: A Search for a Synthesis

Dhiman K. Chowdhury*

Abstract

The subject competition is not confined to economics only but also has been approached from sociology as conflict, from philosophy as knowledge, and from management as strategy. There appears to be conflicts among the approaches. For example, economists take the view that competition reduces the abuse of market power while sociologists believe that competition encourages struggle for control of resources. Similarly, competition and trust may appear opposites but philosophers argue that they are logical opposites. This article cross-examines the apparently conflicting views of competition and attempts a synthesis. It applies the philosophic concept of knowledge in resolving the diverse beliefs, behaviors, and practices.

1. Introduction

Competition is a subject so diverse that affects all quarters of a society including individuals, societies, organizations, markets, and the government. It affects societies' material benefits, solidarity, and happiness. Therefore, competition has been a subject of economists, management scholars, sociologists, philosophers, and lawyers. Economists looked at competition from the viewpoint of performance and productivity, management scholars from strategies, sociologists from conflicts, philosophers from happiness, and lawyers from policies. The World Economic Forum (2000) has listed diverse variables that affect competitiveness of a country. These are as wide as macro economic conditions, government, judiciary, infrastructure, law and order, to narrower issues like tax rates, foreign exchange rates, tariff rates, union power, research and development, interest rates on bank deposits, and pay-performance linkage. In a competitive

* Professor of Accounting, University of Dhaka.

environment, it is expected that administrative regulations are not pervasive, government economic policies are independent of pressure groups, law and order is strictly enforced, quality of infrastructure is high, and the difference in quality of schools available to the rich and the poor is low. For competitiveness also required are low unemployment rate, transparent bureaucracy, property rights, low tax rates, low costs of litigation, performance related reward, and delegation of authority.

For a firm, competitiveness is the ability to produce the right goods and services of the right quality, at a right price, at the right time. It means meeting customers' needs more efficiently and effectively than other firms (DTI 1994: 9). Upgrading the productivity of industries, innovation, product diversity, cost reduction are the elements of competitiveness. Competitiveness is conductive to innovative and productive activity by firms (Porter 1990). Trade associations and supplier organizations, trade exhibitions and strong networks and clusters of personal and corporate interactions is also conductive to competition, innovation, cooperation and competitive advantage. Collaboration and partnership arrangements amongst small and medium sized firms, joint ventures, joint R&D activities with educational establishments are the examples of cooperation and competition and innovation (joint ventures can be predators and anticompetitive also). Innovation is typically complex and costlier and involves uncertainty, risk-taking, probing and reprobing, experimenting and testing (Dosi 1988).

This article will cross-examine and synthesize the various viewpoints on competition with a view to arriving at 'knowledge' for better understanding of the subject. This synthesis is important because there appears to be conflicts among the viewpoints. For example, some hold the view that competition reduces the abuse of market power while others believe that it is a struggle for control of resources. Again, there is a view that competition encourages individualism while others believe that with competition come trust and cooperation. Performance related remuneration and higher pay differentials among people are considered competitive in societies whereas, in some other societies, trust-based life-time employment relation and lower pay differentials also have been found functional. This article will cross-examine the apparently conflicting views of competition. It will apply the philosophic concept of knowledge in resolving the diverse beliefs, behaviors, and practices. Economists and management scholars consider competition as a knowledge creation process. This article will review some of the literature on how competition is related to knowledge and performance. Finally, the article takes the case of Japan and shows how it is a trust-based but still a competitive society.

2. Competition as Knowledge Discovery and Knowledge Spillovers

Hayek (1945) asserted that the major economic problem was a knowledge problem. "The peculiar character of the problem of a rational economic order is determined precisely by the fact that knowledge of the circumstances of which we must make use never exists in concentrated or integrated form but solely as the dispersed bits in incomplete and frequently contradictory knowledge which all the separate individuals possess". His theory indicates the necessity of a competitive and open market where various players in the market can freely interact with each other with a view to reducing their imperfect information and knowledge. Consider a publicly financed company where managers know more about the company than the shareholders know. This situation of information asymmetry between management and shareholders requires management for detailed disclosure and spillover of company information through the company annual reports. The disclosure and reporting of price sensitive information such as managers' insider dealings also help knowledge spillovers among various corporate players. Delegation of authorities, committee-type management, and corporate board with outside independent experts—all these competitive environments further facilitate the spillover of imperfect, dispersed and frequently contradictory information and knowledge which separate individuals possess. Concentration of power, market entry barriers, tariffs and quotas are largely noncompetitive which hamper the growth of knowledge. Wernerfelt (1984) considers a firm as unique bundles of resources and capabilities that are rare, valuable, imperfectly imitable and imperfectly mobile. The economic problem of a society is a problem of the utilization of knowledge, which is not given to anyone in its totality. Consumers' tastes and preferences are not given to firms; through competition, firms discover them. The costs of producing goods by various technologies are not provided to firms; such costs must be learned. This perception about competition and knowledge has implications for equilibrium in market and economies. The factor governing the speed and rate of knowledge development has to do with the competitive environment. Competition promotes innovation; the pace of innovation in most industries is closely linked to high levels of competition there. The simple argument is that innovation, the creation of new knowledge and new ideas are embodied in products, processes, and organizations. Competition not only creates incentives to produce new knowledge but it also forces the other agents to increase their own performance through imitation, adoption, absorption of the new knowledge created elsewhere, in order not be excluded from the market. Competition in the product market forces managers to innovate (Hart 1983). Competition in the capital market reduces cost

of capital and increases the value-increasing diversification, and thus disciplines managers (Harris and Raviv 1990, Jensen 1986). And competition in the labor market increases executive turnover in non-performing firms (Weisbach 1988).

There are various forms of knowledge discovery (R&D): a company's own R&D, cooperative or joint R&D, and government-sponsored R&D. Japan is regarded as a forerunner in the practice of cooperative R&D. The most celebrated example is the VLSI (Very Large Scale Integrated Circuit) project, conducted between 1975 and 1985, and designed to help Japan catch up in semiconductor technology (Sakakibara 1997). Firms whose activities are beginning to cross industry boundaries must acquire knowledge from other organizations in other industries. In this context, cooperative strategies can become indispensable mechanisms for learning. The objectives of cooperative R&D are cost-sharing and skill-sharing. Examples of skill-sharing include the combination of optics and electronics which led optoelectronics, the development of fiber-optics communication systems, and the fusing of mechanical and electronics technologies producing the mechatronics revolution, which has transformed the machine tool industry (Kodama 1992). An analysis of 398 questionnaire responses from participants in Japanese government-sponsored R&D consortia funds reveals that the relative importance of the cost-sharing motive in R&D consortia increases when participants' capabilities are homogeneous or projects are large, while the relative importance of the skill-sharing motive in R&D consortia increases with heterogeneous capabilities (Sakakibara 1997).

3. Competition as Strategy and Comparative Advantage

Competition is a dynamic and complex phenomenon. It means the range of actions aimed at ensuring the realization of the choices of a given firm while restraining at the same time the sphere of actions of its rivals. It means 'to compete', which involves a process of rivalry between firms for a market or for a productive resource (human, material or financial). This includes rivalry in prices, in improved techniques of production or products, in R&D or advertising expenses in the engagement of new productive or distributive activities or in the imitation of existing activities, in the implementation of new forms of organization in which customers, suppliers, partners or even competitors may be involved. A strategy is essentially a set of complex multivariate choices, including resources, activities and product market positioning. Consider Rumelt et al. (1994: 9), "Because of competition, firms have choices to make if they are to survive. Those that are strategic include: the selection of goals; the choice of

products and services to offer; the design and configuration of policies determining how the firm positions itself to compete in product markets; the choice of appropriate level of scope and diversity; and the design of organization structure, administrative systems, and policies used to define and coordinate work…. It is the integration (or reinforcing pattern) among these choices that makes a set of strategies."

Competition is the constant struggle among firms for comparative advantages in resources that will yield market place positions of competitive advantage for some market segment(s) and thereby superior financial performance. Dierickx and Cool (1989) point out that firm resources can be usefully categorized into those that are tradable (e.g., unskilled labor, raw materials, and standard pieces of machinery) and non-tradable (e.g., firm-specific skills, reputations for quality, dealer loyalty, R&D capability, brand loyalty, and customers' trust). Whereas tradable resources can be acquired quickly and easily in the factor markets (i.e., they are mobile), the stocks of non-tradable resources must be developed, accumulated, and maintained through time (i.e., they are immobile). The resources critical for competitive advantage are those that are non-tradable. Barney (1991: 101) called this resource-based competition. First, he defines firm resources to include all assets, capabilities, organizational processes, firm attributes, information, knowledge, etc., controlled by a firm that enable the firm to conceive of and implement strategies that improve its efficiency and effectiveness. He points out that only resources that are heterogeneous, imperfectly mobile, and asymmetrically distributed among rivals, that is, are rare, can generate competitive advantage and superior financial performance. He further views that heterogeneity and immobility alone do not guarantee a sustained competitive advantage. Sustainability occurs only when rivals find it difficult to both imitate the competitive advantage producing resource and develop or acquire strategic substitutes for it. Selznick (1957) refers to competence-based theory, which is interested in what an organization can do particularly well, relative to its competitors. Prahalad and Hamel (1990) argue that a competitive firm must invest in core competences because an organization's capacity to improve existing skills and learn new ones is the most defensible competitive advantage of all. He contends that core competences, unlike physical assets, do not deteriorate with use but are enhanced as they are applied and shared.

4. Competition, Knowledge, and Performance

Competition enhances performance. If there are many ways of doing things, competition allows many to be tried and then select the best, something a

monopoly finds hard to replicate. The main argument in favor of a positive relationship between competition and productivity performance rests on: the existence of monopoly rents gives the company stakeholders, in particular managers and workers, the potential to capture these rents in the form of slack or lack of effort. It may be argued that in oligopoly industries, resources may be spent on deterring rivals, and this can lead directly to production inefficiency. The use of excess capacity (too high capital intensity) to make entry deterrence credible is an example of this. Although there are theoretical reasons for believing that competition improves corporate performance, the empirical evidence on this question is weak (Nickell 1996). He analyzes 670 UK companies and shows some evidence that competition as measured by increased number of competitors or by lower levels of rents is associated with a significantly higher rate of total productivity growth. Porter (1990) argues that there exists a positive causal relation between competition and growth since competition forces firms to innovate and to be efficient. Nickel (1996) has found empirical evidence to this view. On the other hand, Grossman and Helpman (1991) show that competition hurts research and development and growth when it facilitates imitation. Successful innovations earn monopoly profits for a while. The streams of profits end when imitation takes place. Successful imitators earn rents or profits because their (South) manufacturing costs are lower than those of competitors in the North. IBM introduced its original PC based on the 8088 processor chip in the early 1980s. It aroused an enormous market share until firms in Taiwan and Korea were able to offer competitively priced clones.

In a free market environment, capital will move from the capital rich to the capital poor economies to reap profit. The migration of capital will equalize capital-labor ratio and factor price, and thereby equalize per capita income level across regions. Market orientation can also increase efficiency by reallocating resources from sectors with low productivity to sectors with high productivity. This theory was used in a number of empirical studies to explain convergence across a set of countries in which trade is more open and factors are more mobile. Tian (2000) showed that market orientation played a crucial role in the rapid growth of the initially backward provinces in post-1978 China, and was the most important source of convergence over the period. Naughton (1992) observes sharp reductions in both the level of state enterprise profits and the dispersion of profitability across branches of Chinese industry. He attributes the decline and convergence of profit rates to the continuing erosion of barriers that formerly protected state enterprises against competition from collective firms, from imported products, and from innovative rivals within the state sector. Firm

concentration ratios for Chinese industry tend to fall considerably below comparable figures for US and Japan. Stiglitz (1989) argues that when spillovers of knowledge within a country are less than perfect, then markets will never be perfectly competitive. He illustrated the thesis that market failures, particularly those related to imperfect and costly information, may provide insights into why the LDCs have a lower level of income.

Potential competition as a limiting force on the exploitation of market power has received recognition at least since Staten (1956). Intense price competition among equivalent products of different competitors has downward pressure on prices and firm profitability. Most studies show a positive relation between concentration and rate of return (Telser 1988: 378). Stigler (1963) uses an alternative measure of profitability, i.e., the ratio of market value of shareholders' equity to book value of their equity and he found significant positive rank correlation with concentration ratio. There is also evidence in Telser's work to show that in the highly concentrated industries a large number of companies seem to be attracted by the high rates of return. Hence, there should be a positive association between rate of return and concentration by industry over time. Eventually, this ought to lower both the concentration ratio and the rate of return. Competition ultimately prevails so that concentration and rates of return decline. Many later studies on US data found no statistically significant linear relation between domestic concentration and profitability. The results are also similar for UK, French, Belgian, and Italian data (Schmalensee 1989: 974-975).

Competitive environment reduces concentration of power, self-interest and ideology, and encourages distribution of resources according to skill, knowledge, and performance. Corporate remuneration system in recent decades is more competitive and performance based replacing fixed remuneration system. Employee profit sharing, share ownership, and share option benefits brought for employees not only their share on profit but also their participation on ownership and management of the firm. Corporate board nowadays is more competitive than before. A corporate board now uses the expertise, knowledge, and independence of people outside the company. The duty of these outside non-executive directors is, among others, to monitor the performance of the executive directors, and to report matters to the shareholders if they are not satisfied (ABI 1990). Cadbury report (1992) requires that outside non-executives should be appointed by the whole board not by the chairman. This corporate governance standard if applied properly is expected to curb on self-interest and ideology based knowledge of executive directors. Even in the public sector, agency system has been introduced

in UK government in the late 1980s through the 'Next Steps' (Kingdom 1999). The objective of the private sector, like agency, is the improvement of management in government. This system is popularly known as the alternative of privatization. Under this system, operating activities of a government department are put under the responsibilities and supervision of a chief executive. He prepares the business plans and strategies, budgets, and sets goals and targets, which have to be agreed by the minister and then resources are allocated to the agency.

5. Trust, Culture and Knowledge

Incentives, motivation and control are widely used economic and management mechanisms to influence people for harder work, efficiency and higher productivity. This Anglo-American model of human relations in work does not however seem to be predominant in some societies for example, Japan. Although this model is in use, Japan is mainly a trust-based society where work environment, life-time employment, remuneration system, enterprise union, and work hierarchy are based on trust and culture. Their ancestors taught them to work harder and honestly, to be loyal to seniors, to pursue collective team behavior as against self-assertion, and to maintain harmony. This trust based society and its philosophy and 'knowledge' has been received from their ancestors, culture and history. This knowledge lived from generation to generation over place and time. They nourished this culture and knowledge in their social relationship. Different countries have different history of civilization. According to anthropology and history, men moved from one place to another according to their comfort and security of life and encountered with different environment, climate, and resource-base. Accordingly men selected their profession, made work rules, and designed human relation and life-style. Beliefs and knowledge originated anthropologically and historically from their own environment, climate, resource-base, and consequent experiences. Climate, geographical structure, and resource-base—all molded their life, economic activities, and their beliefs and knowledge. Also society never remained the same, it changed and transformed from time to time and so did modify its knowledge, culture and behavior. In the history of civilization of any region society moved through different stages. Different countries have experienced these stages at different time and speed. Again in each stage, mode of production and the nature of human relation were different. In agriculture and small scale production, for example, human relation was simple but in factory system and large scale production, because of separation of ownership and management, human relationship did not remain that simple. Modern Anglo-American companies are mostly financed by equity capital, that is,

publicly financed, whereas Japanese companies are mostly financed by banks and retained earnings. Thus Japanese companies are more family-companies than public companies. In the recent past, however, Japan has increased its activities with the outside world; there has been growth in tourism, foreign trade, foreign employees, Western culture and so on. A society is under constant transformation. The traditional trust system also has to change with this transformation in society. Revision in trust, culture, belief, and knowledge is a logical consequence. Since Japan is interacting and socializing with different culture and knowledge, borrowing from them is an inevitable consequence. As a response to that, Japan already started in its trust based society some elements of competition such as performance related pay, contract job, and transparency in corporate governance (Aoki 1984, 1988; Suzuki 2005).

Trust (belief) and reason (competition) go hand in hand. In a new situation, we start with belief and gradually revise our beliefs. We rely on trust where cause and effect is indeterminate (at least remote indeterminacy). Take the case of employee remuneration in a large company. This is in fact based on both 'trust' and 'reason' or competition. It is reason because some part of an employee's performance can be measured 'objectively'. It is trust because some part of his performance cannot be measured objectively. Particularly in a team-based work environment, individual performance can hardly be singled out. In this situation, individual merit rating by immediate supervisor (based on trust as well as supervisor's knowledge) is in place particularly for promotion. And, bonus system based on organization performance rather than individual performance is in place where bonus is distributed among employees equally or according to basic salary. Regarding organization performance and bonus, both trust and knowledge are involved: trust, because it is believed that all employees work with reasonable effort and therefore contribute to organizational performance; and it is knowledge because some mechanisms (control system) are in place to check an employee's free riding behavior, for example, his presence or absence in work place is monitored. So in every sphere of human association and relation there are issues which are numerous and some of these can be identified and measured objectively and many others which are subjective and uncertain and cannot therefore, be measured objectively. Again, when we say we can measure objectively it really means we can measure 'relatively' objectively because our decisions and actions are based on evidences which are 'probabilistic'. And, importantly, as the mode of production and human relationship take more complex structure, this problem of measuring accurate knowledge becomes more acute. Here in these situations, trust (belief) and competition and reason (knowledge) go together. For the above

uncertainties and imperfections of human knowledge, Japan's pay structure typically has three elements: person related (age and merit), job related (equal pay for equal work) and need related (allowances) (Aoki 1988).

Trust is the expectation that arises within a community of regular, honest, and cooperative behavior based on commonly shared norms, on the part of other members of that community (Fukuyama 1995: 26). According to him, the most effective organizations are based on communities of shared ethical values. Although this belief requires detailed scrutiny, it seems partially true when we agree that self-interest, individualism and self-assertion are found at a lower level among people of higher-order thinking, high achievers and of higher social status. Kenneth Arrow (1974) argues that trust is an important lubricant of social system. It saves a lot of trouble to have a fair degree of reliance on other people's word. Trust and loyalty enable you to produce more high-esteem values. You pay your bus fare by yourself and the driver or conductor does not check. Though some people could cheat but as a whole the system is working and saves time and money in many countries including Japan and Malaysia. These communities do not require extensive contract and legal regulations in their relations because prior moral consensus gives members of the group a basis for mutual trust. By contrast, people who do not trust one another will end up cooperating only under a system of formal rules and regulations which have to be negotiated, agreed to, litigated and enforced, sometimes by coercive means with high transaction costs. Transaction costs include finding the appropriate buyer and seller, negotiating a contract, complying with government regulations, enforcing that contract in the event of dispute or fraud, monitoring and bonding costs, institutional activism costs, auditing, and insurance and security costs. A high trust society does not have to pay such high tax. Spontaneous sociability is critical to economic life because virtually all economic activity is carried out by groups rather than individuals.

Fukuyama (1995) has differentiated Japanese and Chinese kinship-based society. According to him, there are three broad paths to sociability: the first based on family and kinship, the second on voluntary associations outside kinship such as schools, clubs, and professional associations, and the third is the State. Familism—too strong an insistence by society on maintaining family ties at the expense of other kinds of social relationships can be detrimental to economic development. Max Weber (1951) in his book *The Religion of China* argued that the strong Chinese family created what he called, 'sib fetters' (overly restrictive family bonds) constraining the development of universal values and the impersonal social ties necessary for modern business organization. In the West,

many observers believed that family ties had to weaken if economic progress is to occur. The extended family provides shelter and food to all its members regardless of their individual contributions. The individual savings are discouraged. Family loyalty and obligations take precedence over other loyalties and obligations. Thus the extended family tends to dilute individual incentives to work, save and invest. In sharp contrast to Japan, Chinese society is not group oriented. The familism evident in Chinese business life has deep roots in Chinese culture. Competition between families makes Chinese societies seem individualistic but there is no competition between the individual and his family in the Western sense (Fukuyama 1995: 75). There is, however, opposite observation by Wilson and Pusey (1982) Chinese family system is strictly patrilineal; inheritance flows through males only (now changed) and is shared equally by all of a father's sons. There are however, similarities between Chinese and Japanese Society: filial piety, seniority, children's obligation to parents, more affection to parents than wife, ancestor worship, women subordination to men. There are differences too. There are non-kinship based associations in Japan unlike China. Family is non-biological unlike China. Adoption of outsiders is widespread. Adoption outside the kinship group is in place. The Chinese occasionally criticized Japan's 'promiscuous' adoption practices as 'barbarous' and 'lawless' because of their openness to strangers (Lebra 1989). The percentage of adoptions within Samurai families rose from 26.1% in the seventeenth century to 36.6% in the eighteenth, to 39.3% in the nineteenth century (Moore 1970). There is a very strong inclination on the part of the Chinese to trust only people related to them, and conversely to distrust people outside their family and kinship group (Whitley 1991).

The problem of free riding can be mitigated if the group possessed higher degree of social solidarity. People become free riders when they put their individual economic interests ahead of that of the group. But if they strongly identified their own wellbeing with that of the group or even put the group's interests ahead, then they would be much less likely to shirk work or responsibilities (Fukuyama 1995: 156). Therefore performance related pay around the world is predominantly based on group or organizational performance rather than individual performance (Chowdhury 2004). Even in US, the country of the highest individualism, performance pay for school teachers based on individual merit rating did not work. Life time employment is a result of the trust based society. The Japanese are more likely than Americans to say their work superior, "Looks after you personally in matters not connected with work" by eighty-seven to fifty persons (Lipset 1992: 57).

6. Competition, Trust and Cooperation

Trust reduces complexity and uncertainty in many social interactions. To cope with indeterminate and contingent outcomes due to uncertainties in every particular case, one requires a great deal of information that is very costly to obtain. Thus the need for stable and global mechanisms is rooted in the fundamental unpredictability of social interaction. As distinct from an external mechanism such as a legal or social sanction, trust is an internal mechanism for this purpose. It dispenses with the requirement for extensive research if one can place high confidence (trust) in others; it works as a substitute for full information. In this sense, trust is a rational, cost-saving device if it proves successful. But distrust is also a rational device that avoids a risky situation by abandoning the effort of trusting others. If we can rely or trust on the labels on food packets, medicines, reports in newspapers, academic journals, data collected by official bodies, etc., our scope of action is expanded. In a situation where we need to check everything ourselves we are constrained in our options indeed. Competition and cooperation go hand in hand (Hayek 1960: 37). This is obviously the case in activities like games. Cooperative behavior is essential in a society for human flourishing and so should be encouraged wherever feasible and not obviously harmful. Equally, competition in some contexts is also essential to realizing human welfare. For example, an absence of competition may well lead to a constraint on our fulfilling of our physical and mental capacities, on our discovering technologies that can relieve human suffering and facilitate human well being, and whether competition does that will depend upon the context of their operation. Although trust and cooperation seem to be general conditions of human flourishing, the question of the desirability of competition is likely to be far more sensitive to the prevailing conditions.

Muller, in his 1809 work *The Elements of State Art (Die Elements der Staatskunst)* holds the view that the main problem with the modern way of production is a sort of 'calculator' aiming only to maximize his material interests and ignoring various other elements of culture, moral and welfare which stem from social traditions. "In the traditional organizations, i.e., those originating in the middle ages, craftsmen and apprentices are trained not only in handicraft skills but also taught to be simultaneously "poets, scholars and artists of all kinds", so in the guild as an educational organization a 'heartfelt relationship' is formed between master and others, but in the manufacturing system the entrepreneur dominates "mechanical wage laborers" coldheartedly, calculatively and seeking after pure income" (pp. 311-13). Characteristic of Muller's thought is the way he gives

priority to the maintenance and the recovery of the balance among economic, social and cooperative functions in institutions. He vigorously argued that material development should be restricted to a certain degree for the realization of these ideals. Even though he does not reject an increase in material wealth, this is not the main purpose for him.

7. Individualism and Collectivism: The Logical Opposites

Individualism pertains to societies in which the ties between individuals are loose: everyone is expected to look after himself or herself and his immediate family. Collectivism as its opposite pertains to societies in which people from birth onwards are integrated strong, cohesive in-groups, which throughout people's lifetime continue to protect them in exchange for unquestioning loyalty (Hofstede 1991: 51). This individualism and collectivism or independence and dependence are logical opposites. Men are dependent on each other because of division of labor and agency relationship in modern society which has been explained in detail in Chapter 2. Independence is also very dear to man and he cannot be forced and coerced, against his freedom and independent thinking. Koestler (1960) remarks about Indians' basic predisposition of indifference to contradictions and the peaceful coexistence to logical opposites. Philosophy of ethics, *dharma* (duty) and *moksha* (salvation) coexist with pursuit of *artha* (wealth) and *kama* (sexual satisfaction). Indian psyche, values and reactions are contextual rather than textual. Indians switch gears constantly according to the situation, thereby displaying many frequently contradictory facades. One should speak the truth; one should speak what is pleasant; and one should not speak the truth if it happens to be unpleasant. Rightness and wrongness appear to be determined by the context in which the behavior takes place. Roland (1984: 123-130) takes the view that correct behavior is much more oriented towards what is expected in specific contexts of a variety of roles and relationships, rather than any unchanging norm for all situations. Warships are to be done in a corner, in one's mind, and in forest (*kone, mone,* and *vane)*. Collectivist forms such as *kirtan* and mass prayers are also there. Management philosophy—management is situational—is consistent with Koestler and Roland's finding about the Indians. However, the management philosophy is universal. Tripathi (1988) observes that the human form of collectivism found in Indian society is a mix of individualism and collectivism that is conditioned by many values and contingencies. Devos (1973) shows that the Japanese places emphasis not on attaining individual glory, but rather on continuing family tradition. Wilson and Pusey (1982) find that Chinese parents encourage their children to seek individual and collective achievement

simultaneously. Whereas in US the market values tend to crowd out purposes of democratic community, such as promoting human growth and development (Soros 1997). Juviler and Stroschein (1999) expressed the need for a balance between lofty principles of human solidarity and the self-interest, which drives the indispensable market.

According to Russell (1960: 53, 91), "Success (in the sense of material benefits) can only be one ingredient in happiness, and is too dearly purchased if all the other ingredients have been sacrificed to obtain it. The emphasis upon competition in modern life is connected with a general decay of civilized standards such as must have occurred in Rome and Augustan age. Men and women appear to become incapable of enjoying the more intellectual pleasures. It is not only work that is poisoned by the philosophy of competition (main thing in life), leisure is poisoned just as much". He also views that the habit of thinking in terms of comparisons is a fatal one because it leads to envy. The opposite, however, is also true where comparison is good for 'knowledge' creation. Management literature also suggests that comparison and performance evaluation are necessary for motivating people and reducing free riding problems.

8. Competition and Conflicts: Sociologists' View

Sociologists view the terminology 'competition' as 'conflicts' to describe certain aspects of industrial relations. Competition is a word describing a conflict over the control of resources or advantages desired by others where actual physical violence is not employed. Conflicts of interests in employment arise because each party wants to maximize its own utility. Since wages are costs which affect profits, and profits can be raised at the costs of wages, those whose interests lie in maximizing wages are in competition with those concerned to raise profits. Both parties may be presumed to be acting in accordance with the dictates of rational economic action, but the rational appraisals of interests made by workers and managers pull in opposite directions. The divergence of interests occurs in any economic system where those who work do not also retain the profits of their activity. Thus competition derives from the separation of the ownership of a firm from those who work for it and the consequent appropriation of anything remaining out of revenues after costs have been covered as profits for the owners.

Distribution of power also causes conflicts. Whenever there are hierarchical structures of power and influence, there will be the potential of social conflicts. Opposing interests are created by the possession of and exclusion from power. Conflict lies in the particular arrangement of social roles of domination and

subordination. There are powerful alienating tendencies in modern factory technology and organizations (Robert 1964: 4). A person is powerless when he is an object controlled and manipulated by other persons. Industrial workers can experience powerlessness from their lack of control, which results from the separation of ownership of means of production and productive labor, failure to control managerial policy and decision-making, failure to control conditions of employment, and failure to control the immediate work process.

Weber (1964) visualized industrial relations as class relations. People have views about their own position, the class to which they belong, and the relationship amongst classes. Work 'humanization' techniques such as job enrichment, autonomy, company pension schemes, improved working conditions, incentive benefits, and job security, have therefore, gained considerable popularity with management theorists over the last decades. In Japanese competition, manual and non-manual employees are guaranteed career progression and wages that rise with age as well as merit rather than careers for a selected few and wages based mainly on performance criteria. Employees also receive substantial non-wage benefits, company housing, medical, educational, and leisure facilities. Managers promote a company philosophy or ideology of community identification with the collectivity and loyalty to the paternalistic cooperation. Collectivism and community are reinforced at all levels of the company by the creations of small teams as the basic units of organization. Management also decentralizes decision-making and encourages worker participation. Large private enterprises in Japan have remarkably peaceful industrial relations and a contributory factor is undoubtedly the form of moral cohesion instituted in corporate paternalism. This suggests that enlightened policies can contain social conflicts arising out of economic competition.

9. Japan: A Society of Logical Opposites

One of the characteristic features of Japanese society is the avoidance of confrontation. Most Japanese would rather walk away from a conflict than join in the fray, and there is a tendency to nod and agree with another's opinion even when it is not shared. This is done out of both an ingrained civility and a commitment to the harmony of the moment over the self-assertion of conviction. This is based on an ideal of amelioration: that people of differing beliefs can surely live together if they do not try to impose their faith on each other (The Japanese Times, April 11, 2005, p. 7).

Japan is probably the most successful capitalist country with collective interest being predominantly active in social relations, the lowest income inequality

(during 1987-95), the lowest number of days lost in industrial disputes among the developed countries during 1990-93 (Jacoby 1995), and one of the lowest crime rates (UN 2000). Salary is mainly based on seniority. A nurse's aide about to retire might earn twice the salary of either the head nurse (in her thirties) or a young physician on the regular staff (Campbell and Ikegami 1998: 77). Group consciousness and institutional affiliation appear to be more important than individual ego and superiority or individual orientation. For a company, it belongs not to 'shareholders' but to 'us'. Rather than saying 'I am a typesetter' he tends to use 'I am from a publishing group'. Everywhere, there are signs of service motive more prominent than personal profit motive. Another social culture is dependency in human relations. The word, *amae*, the noun form of *amaeru*, is an intransitive verb that means, 'to depend and presume upon another's benevolence'. Parental dependency is encouraged in Japanese society whereas the opposite tendency prevails in Western societies. Bow down head is very common as a sign of respect or as a greeting. Trying to get approved by excessive politeness and obedience is a culture. Parental dependency is institutionalized everywhere in Japanese societies. The American baby appears to be more physically active and happily vocal and more involved in the exploration of his body and his environment than is the Japanese baby who in contrast seems more subdued in all these respects (William Caudill quoted in Okimoto and Rohlen 1988: 21). Unanimous agreement has a very important social function for the Japanese. The Japanese avoid to contradict or to be contradicted, that is, to have to say, 'no' in a conversation. "*Hi*', an word for English 'yes' is airing so much that it can be said that most of their time in conversation is spent in saying '*hi*', '*hi'*, and '*hi*'. Sometimes, it appears that they are born for saying '*hi*'. And they say '*hi*' in such way with so much of importance and emphasis that it seems they quarrel with each other. They simply do not want to have divided opinions, and if such an outcome appears to be inevitable they will get so heated emotionally that it becomes almost impossible to continue any reasoned discussion. "I think this explains why disagreements become violent in the Diet (parliament) and other groups in Japan. The greater the power of cohesiveness, the more violent the effect of a break. It is like splitting the atom" (Okimoto and Rohlen 1988: 22). Contrary to this, in the West, with its emphasis on the freedom of the individual, people have always looked down on the type of emotional dependency that corresponds to '*amae*'.

Dispute is solved by mutual understanding and the principle of rule by consensus prevails. Contracts and agreements drawn up by large Japanese trading companies and other societies invariably contain a 'good-faith' or 'amicability' clause. The

clause states in case a dispute arises between the parties hereto with respect to their rights and obligations under this contract, the parties hereto shall discuss the matter among themselves with good faith. Europeans, on the other hand, think that they are entitled to take the other party to court if the latter fails to perform his contractual obligations. The number of civil suits per capita brought before the courts in Japan is roughly between one-twentieth and one-tenth of the figures for suits per capita in the common law countries of the US and UK. Even if the number of cases brought to conciliation proceedings is included, the difference remains the large, between one-sixteenth and one-eighth (Okimoto and Rohlen 1988: 194).

Although the Japanese have dependency value they are self-disciplined and hard working and they love their work. History of working hours around the world gives support for this (Jacoby 1995). In 1989, a Japanese worker worked 2159 hours in the manufacturing industry compared to 1956 in US, 1610 in France, 1603 in Germany, 1851 in UK, and 1895 in Canada. Similar performance is recorded in 1960, 1970 and 1980. Their remuneration structure with lower disparity among various layers in an organization is another evidence as respect for all types of work irrespective of status. Joint consultation committees between labor and management in Japanese companies are common. An individual is given due care and respect and participation in decision-making. Bow-down tradition is practiced not only from junior to senior rather it is visible everywhere at every level irrespective of status. Bowing down by the prime minister, ministers and lawmakers is a common tradition in Japanese governance. It means that every individual is given due care and importance. Though the society is hierarchical, the decision is consensual.

The above Japanese social values are not alien but supported in philosophical writings, particularly in the theory of knowledge. This theory says, human knowledge is imperfect, rationality bounded, and man works mainly on belief or at best justified belief. Coupled with this philosophical discipline, anthropology and sociology add another dimension of knowledge, which suggests that men are dependent on each other. Thus, collective attitude seems better and philosophical than self-assertion and ego. Philosophy of knowledge suggests that as you study more and more you see the ‘plural’ of factors rather than ‘single’ or individual factor that triggered any change in a society. An individual human being is only an element, though very important, among many elements behind any change. History, geographical location, government, traditions, values, technology, religion, resource base, many factors are behind the happening or non-happening

of an event. Moreover, we are in fact dependent on each other. We are involved in interactions with others and this interaction is a two-way process. In management, the art of getting things done must know how to manage people, and there you need support. Human beings do mistakes or dysfunctional behavior out of self-interest or out of imperfections in knowledge or both. Intellectuals tend to say, 'it appears', 'it seems' rather than 'it is' because they see that knowledge has a time and place context and therefore always there are rooms for improvement and development.

10. Conclusion

Competition is an interactive process where market players interact with each other according to socially accepted rules and regulations. Competition is an environment where none can make an abnormal profit. It means that competition forces cost and price down for firms to survive in the market with minimum rates of return. This is made possible by the presence of a large number of players in the market. Thus, competition leads to pluralism. But there are parallel views that competition encourages individualism and comparison. Individualism and pluralism like other logical opposites can co-exist. What is right and what is wrong depends upon circumstances, i.e., behavior is contingent. For example, comparison and performance evaluation provide incentives for better performance and controls poor performance and thus mitigates free riding problem. But this competitive practice is good subject to conditions, for example, the difference in individual performance benefits should not be so great that it creates large inequalities in income and social position. Sociologists consider competition as a struggle for controlling resources and power. They consider it as a class struggle and kinship. However, to counter these monopolistic and oligopolistic behaviors, new management and governance techniques have been developed around the world. These include humanistic management techniques such as participative management, decentralization of authority, quality circles, responsibility accounting, employee profit sharing and share ownership, trade union, accounting reporting and disclosure, committee type of management, democratic labor laws, and corporate governance.

Competition and trust and cooperation are logical opposites. Trust is good in certain circumstances for example, where risk is less particularly in standard object or event, and in non-monetary, cultural and social values. If we show serious competitive behavior in everything, it may be costly and time consuming. If we check every details: laws, formalities, full information, evidential documents even for standard object or event then this might constrain our

potential options. In corporate governance, shareholders keep trust on the board of directors in addition to monitoring, proxy voting and other competitive behavior. Even in various market collusion behavior such as tacit agreements, cartels, joint ventures, and mergers, both trusts and competition go hand in hand. Both the trust and competition have their limitations. Although in cartels, firms have trust on each other, they have incentives to cheat on the collusive agreement. So they apply various competitive methods to detect and prevent cheating. Some trusts are legal for example, information exchange, trade associations, and collaborative research but anti-competitive trusts are illegal. This article shows that knowledge allows logical opposites. Japan, the second largest economy in the world is predominantly based on trust, collectivism, life-time employment, seniority, and benevolence whereas its competitors such as US and UK are predominantly based on competition, individualism, incentive and control, and private profit motive. Like competition, trust is also a justified belief. If you have service motive instead of private profit, and collective interest instead of self-glory and self-assertion, trust can work as knowledge.

References

ABI (1990) *The Role and Duties of Directors: A Discussion Paper*, Association of British Insurers: London.

Aoki M. (1988) *Information, incentives and Bargaining in the Japanese Economy*, Cambridge University Press: Cambridge, NY.

Aoki M. (1984) *Gendai no kigyo* (contemporary corporations), Iwanami, Sloten.

Arrow K.J. (1974) *The Limits of Organization*, Norton: New York.

Barney J. (1991) Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, *Journal of Management*, 17, 99-120.

Cadbury A. (1992) *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*, Gee and Co Ltd.

Campbell J.C. and Ikegami N. (1998) *The Balance in Health Policy: Maintaining Japan's Low-Cost Egalitarian System,* Cambridge University Press.

Chowdhury D. (2004) *Incentives, Control and Development: Governance in Private and Public Sector with Special Reference to Bangladesh*, Dhaka University: Dhaka.

Department of Trade and Industry (DTI) (1994) *Competitiveness: Helping Business to Win*, HMSO: London.

Devos G.A. (1973) *Socialization for Achievement: Essays on the Cultural Psychology of the Japanese*, University of California Press: Berkley.

Dierickx I. and Cool K. (1989) Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage, *Management Science*, 35, 1504-11.

Dosi G. (1988) Sources, Procedures and Microeconomic Effects of Innovation, *Journal of Economic Literature*, 26, 1120-71.

Fukuyama F. (1995) *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, the Free Press: New York.

Grossman G.M. and Helpman E. (1991) Quality Ladders and Product Cycles, *Quarterly Journal of Economics*, 106, 557-586.

Harris M. and Raviv A. (1990) Capital Structure and the Informational Role of Debt, *Journal of Finance*, 45, 321-349.

Hart O. D. (1983) The Market Mechanism as an Incentive Scheme, *Bell Journal of Economics*, 14, 366-382.

Hayek F.A. (1945), The Use of Knowledge *American Economic Review*, 35, 519-30

Hayek F.A. (1960) *The Constitution of Liberty*, Chicago: Chicago University Press.

Hofstede G. (1991) *Cultures and Organizations: Software of the Mind*, McGraw-Hill: London.

Jacoby S.M. (1995) *The Workers of Nations: Industrial Relations in a Global Economy*, Oxford University Press: New York.

Jensen M.C. (1986) Agency Costs and Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, *American Economic Review* (papers & Proc), 76, 323-329.

Kingdom J. (1999) *Government and Politics in Britain*, Polity Press: Cambridge, UK.

Lebra T.S. (1989) Adoption among the Hereditary Elite of Japan: Status Preservation through Mobility, *Ethnology*, 28.

Lipset S.M. (1992) Pacific Divide: American Exceptionalism-Japanese Uniqueness in Power Shift and Value Changes in the Post Cold War World, Proceedings of the Joint Symposium of the International Sociological Association's Research Committee: *Comparative Sociology and Sociology of Organizations*, Kibi International University, Sophia University and International Christian University, Japan.

Moore R.A. (1970) Adoption and Samurai Mobility in Tokugawa Japan, *Journal of Asian Studies*, 29, 617-632.

Muller A. (1809) *Die Elemente der Staatskunst*, Fischer: Jena.

Naughton B. (1992) Implications of the State Monopoly over Industry and its Relaxation, *Modern China*, 18 (1), 14-41.

Nickel S.J. (1996) Competition and Performance, *Journal of Political Economy*, 104, 724-766.

Okimoto D.I. and Rohlen T.P. eds. (1988) *Inside the Japanese System: Readings on Contemporary Society and Political Economy*, Stanford University Press: Stanford, California.

Porter M. E. (1990) *The Competitive Advantage of Nations*, New York: The Free Press.

Robert B. (1964) *Alienation and Freedom: The Factory Worker and his Industry*, Chicago University Press: Chicago.

Roland A. (1984) The Self in India and America: Toward a Psychoanalysis of Social and Cultural Contexts, in Kovolis V. edt. *Designs of Selfhood*, Associated University Press: Cranbury, NJ.

Russell B. (1961) *The Conquest of Happiness*, George Allen & Unwin: London (originally published 1930).

Sakakibara M. (1997) Heterogeneity of Firm Capabilities and Cooperative Research and Development: An Empirical Examination of Motives, *Strategic Management Journal*, 18 (summer special issue), 143-164.

Schmalensee R. (1989) Inter-Industry Studies of Structure and Performance, in Schmalensee R. and Willig R. edts., *Handbook of Industrial Organization* (volume ii), North-Holland: New York.

Selznick P. (1957) *Leadership in Administration: A Sociological Interpretation*, Harper and Row: New York.

Soros G. (1997) Why the Market is not Enough: Every Society Needs some Shared values, *Giving*, October 30.

Stigler G. (1963) *Capital and Rates of Return in Manufacturing Industries*, Princeton: Princeton University Press.

Stiglitz Joseph (1989) Markets, Market Failures and Developments, *American Economic Review*, 79(2), 197-203.

Suzuki F. (2005) Corporate Governance Reform and Industrial Democracy in Japan, *Japan Labor Review*, 2 (1), 81-104.

Telser L.G. (1988) *Theories of Competition*, New York: North-Holland.

Tian X. (2000) Market Orientation Reform and Convergence in China, *The Singapore Economic Review*, 45 (1), 99-115.

Tripathi R.C. (1988) Aligning Development to Values in India, in Sinha D. and Kao H.S.R. eds. *Social Values and Development: Asian Perspectives*, Sage: New Delhi.

United Nations (2000, 1994, 1992) *Human Development Report*.

United Nations (2000) *Statistical Year Book*.

Weber M. (1964) *The Theory of Social and Economic Organization*, Free Press: New York (translated and edited by A. M. Handerson and Talcott Parsons), originally published in German, 1922.

Weber M. (1951) *The Religion of China: Confucianism and Taoism*, Free Press: New York.

Weisbach M. (1988) Outside Directors and CEO Turnover, *Journal of Financial Economics*, 20, 431-460.

Wernerfelt B. (1984) A Resource Based View of the Firm, *Strategic Management Journal*, 5 (2), 171-180.

Whitley R. (1991) The Social Construction of Business Systems in East Asia, *Organization Studies*, 12, 1-28.

Wilson R.W. and Pusey A.W. (1982) Achievement Motivation and Small Business Relationship Patterns in Chinese Society, in Greenblatt S.L., Wilson R.W. and Wilson A.A. eds. *Social Interaction in Chinese Society*, Praeger: New York.

World Economic Forum (2000) *The Global Competitiveness Report*. Oxford University Press: New York.

Footnoting and writing style of the Bangladesh Journal of Political Economy

1. The Bangladesh Journal of Political Economy will be published in June and December each year.
2. Manuscripts of research articles, research notes and reviews written in English or Bangla should be sent in triplicate to the Editor, The Bangladesh Journal of Political Economy, Bangladesh Economic Association, 4/c Eskaton Garden Road, Dhaka-1000, Bangladesh.
3. An article should have an abstract within 150 words.
4. Manuscript typed in double space on one side of each page (preferably with softcopy) should be submitted to the Editor.
5. All articles should be organized generally into the following sections: a) Introduction: stating the background and problem; b) Objectives and hypotheses; c) Methodological issues involved; d) Findings; e) Policy implications; f) Limitations, if any; and g) Conclusion (s).
6. The author should not mention his/her name and address on the manuscript. A separate page bearing his/her full name, mailing address and telephone number, if any, and mentioning the title of the paper should be sent to the Editor.
7. If the article is accepted for publication elsewhere, it must be communicated immediately. Otherwise, the onus for any problem that may are will lie on the author.
8. The title of the article should be short. Brief subheadings may be used at suitable points throughout the text. The Editorial Board reserves the right to alter the title of the article.
9. Tables, graphs and maps may be used in the article. Title and source(s) of such tables should be mentioned.
10. If the Editorial Board is of the opinion that an article provisionally accepted for publication needs to be shortened or particular expressions deleted or rephrased, such proposed changes will be sent to the author of the article for clearance prior to its publication. The author may be requested to recast any article in response to the review thereof by any reviewer.
11. The numbering of notes should be consecutive and placed at the end of the artile.
12. Reference in the text should be by author's last name and year of publication (e.g. Siddique, 1992, P. 9. In the list of references, the corresponding entry in the case of article should be in the following manner:

Siddique. H.G.A., "Export Potentials of Ready-Made Garments Industry-A Case Study of Bangladesh". The Dhaka University Studies. III, 1982, Pp. 66-67.

In the case of books, the following order should be observed: Author, title, place of publication, publisher, date of publication, page number. As for example: *Hye, Hasnat Abdul, Integrated Approach to Rural Development,* Dhaka: University Press Limited, 1984, Pp.3-4.

13. Reference mentioned in the text should be arranged in alphabetical order and provided at the end of the article.
14. The Bangladesh Economic Association shall not be responsible for the views expressed in the article, notes, etc. The responsiblity of statements, whether of fact or opinion, shall lie entirely with the author. The author shall also be fully responsible for the accuracy of the data used in his/her manuscript.
15. Articles, not accepted for publication, are not returned to the authors.
16. Each author will receive two complimentary copies of The Bangladesh Journal of political Economy and 25 off-prints.

Bangladesh Economic Association
4/C Eskaton Garden Road
Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : 9345996; Fax : 880-2-9345996
e-mail: becoa@bdlink.com